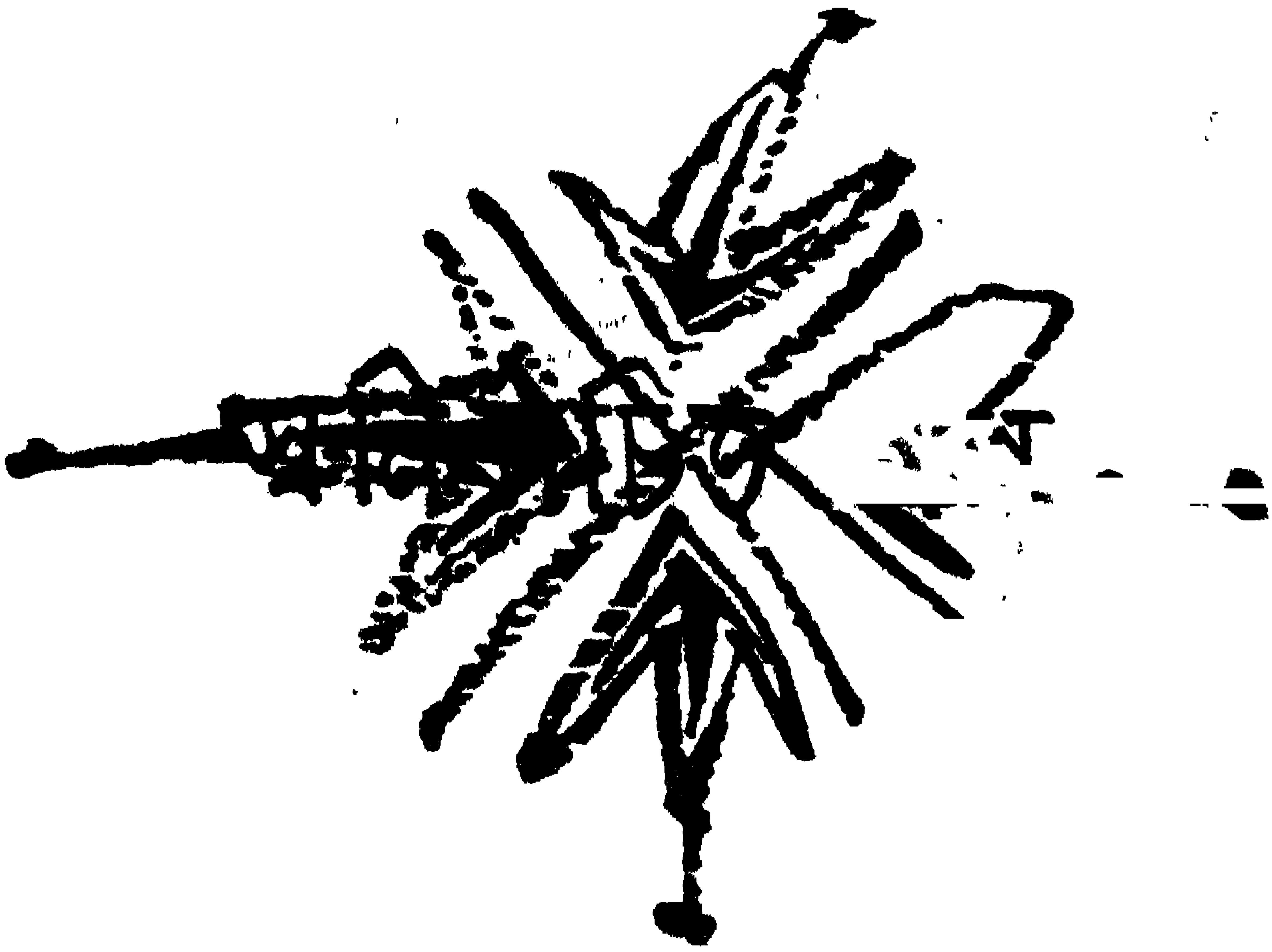

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের

স্ব-নির্বাচিত গল্প

ডিয়ান অ্যাসোসিয়েটেড্ পাবলিশিং কোং প্রাইভেট লিঃ
৯৩, হ্যারিসন রোড, কলিকাতা ৭

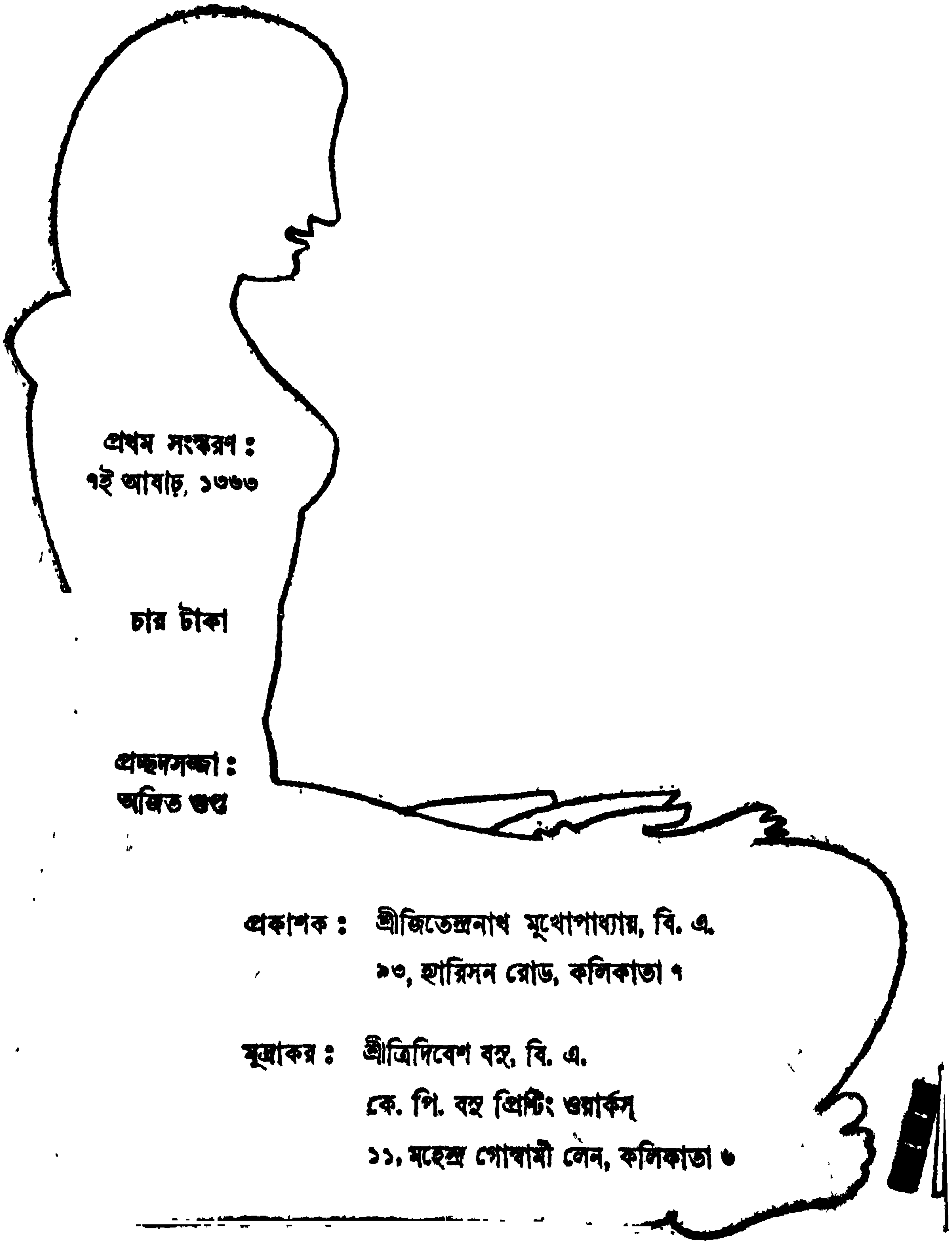

প্রথম সংস্করণ :
৭ই আষাঢ়, ১৩৬৩

চার টাকা

প্রচ্ছদসজ্জা :
অজিত গুপ্ত

প্রকাশক : শ্রীজিতেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, বি. এ.
৯৩, হ্যারিসন রোড, কলিকাতা ৭

মুদ্রাকর : শ্রীত্রিদিবেশ বসু, বি. এ.
কে. পি. বসু প্রিন্টিং ওয়ার্কস্
১১, মহেন্দ্র গোস্বামী লেন, কলিকাতা ৬

লেখকের কথা

নিজের গল্প বানাই কথা এটাই অনুমানের প্রথায়। ঠিক যেন নিজের সব ছেলেমেয়েদের সঙ্গে থেকে দেখার জোর যে জীবন সমাজ সাহিত্য ইত্যাদি অনেক পরীক্ষায় কে শক্ত থেকে ভালভাবে পাশ করেছে তাও টিকে গেছে।

অনেক দূর দিয়ে অনেক সময় ছেলেমেয়েকে দম্ভঃ দেওয়া হবে আবার বানাই কথার অনুমান বা সুনিশ্চয়তার সত্যিই বিস্ময় হয়ে দাঁড়ায়।

কোন দিয়ে বানাই হেতু?

খুঁজে নাকি আছড়ে গান কাটলো কোন কোনও মেয়েটাই হয় তোর বাবার সব চেয়ে আদুরে — গল্প-সংসারে উপরন্তু সত্যের নিতি-বা নিরাপত্তা নিকট খাঁটি সময় প্রতীক হিসাবে হয় তোর ও আর দেখা খুঁজে পাওয়াই সুখ না। বাবার প্রেরণা তুমি এবং চিন্তা।

এটাই কি শেষ কথা?

সত্য?

কী হাস্যকর ভাবেই মানুষকে অস্বীকার
করেন সাম্যবাদী দার্শনিকেরা!
জীবনকে দেখা আর জীবনকে সত্য করা
'আত্মানুভূতিতে' ঘটিয়ে আছে। একটাকে
বড় করে অন্যটাকে তুচ্ছ করা জীবনদর্শনের
পক্ষে নিতান্ত অপরাধ।
অবাস্তব অবাস্তব কথা থেকে অনেকের
কি — যে কোনও উদাহরণের মূল তত্ত্ব?
তা নয়। বড় প্রশ্নের সম্পর্কে হলেও কথাটির
আপত্তির সহজ এবং সরল। প্রথমে আর
মানুষকে দেখা আর ভালোবাসা যে একটাই
প্রক্রিয়া, একটির হাত অন্যটির যে যুক্তি-
সম্পূর্ণ নয়, অর্থহীনও বটে — এটুকু
বোঝার আগ্রহের দিকের মানুষেরও পক্ষে
যেমনই কঠিন হওয়া উচিত নয়।
সমস্ত বিজ্ঞানের কোনটির আগে দেখা
কোনটির পরে দেখে যে হিসাব করা হয়।
গল্পের বিষয়ে বৈজ্ঞানিকতার হিসাবটাই
নিরর্থক।
দার্শনের আমার যে প্রশ্নটি ছিল
সমাজে কাদের বেশিরভাগ লোকই আছি

এই সংস্করণের জন্য আমি নির্বাচনের
দায়ভারটি নিয়ে নিয়েছি।
আমার রুচির ২৫ জন লেখকের মনঃপূত
হবে না। এ সম্বন্ধে কোন বিতর্কে যাবো না
এবং ও সম্বন্ধে কোন কথা দিলাম তাই নিয়ে
অনেক প্রশ্ন উঠবে।
সেইও আমি কামনা করি — প্রশ্ন উঠুক,
সমালোচনা হোক, দশজনে আমার রুচির
বিবেচনার ভুল-ত্রুটি সংশোধন করে দিন।
সাহিত্যের পক্ষে সেটা অত্যন্ত স্বাস্থ্যপ্রদ
কথা।

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়
২৪শে বৈশাখ, ১৩৬২

বৃহত্তর—মহত্তর ১
নেকী ১৬
চোর ৪৩
ফাঁসি ৫৮
ভূমিকম্প ৭৫
টিকটিকি ৮৬
বিপত্নীক ৯৫
সিঁড়ি ১০১
মহাকালের জটার জট ১১১
হলুদপোড়া ১২৮
চুরি চুরি খেলা ১৩৮
ফাঁদ ১৪৭
রাঘব মালাকর ১৬১
প্রাক্-শারদীয় কাহিনী ১৬৯
রক্ত নোনতা ১৭৪
হারাণের নাতজামাই ১৭৭
১৮৯
ধান ১৯৯
বিবেক ২০৯
শিল্পী ২২১

বৃহত্তর—মহত্তর

আমাদের পাড়া থেকে উঠে যাওয়ার তিন বছর পরে একদিন নগেনের সঙ্গে পথে দেখা হল। লোকটার চেহারার না হোক, পোশাকের খুব উন্নতি হয়েছে দেখলাম। মাথায় চকচকে টেরি, গায়ে সিল্কের পাঞ্জাবি, পরনে কোঁচানো শান্তিপুরে ধুতি, পায়ে চকচকে ডার্বি। হাতে আবার একটা রিস্টওয়াচ বাঁধা!

একগাল হেসে পরমাত্মীয়ের মত বলল, রেস্টুর‍্যাণ্টে ঢুকতে যাচ্ছিলাম, পকেটে হাত দিয়ে দেখি মানিব্যাগটা ভুলে এসেছি। এমন খিদে পেয়েছে ভায়া!

আশেপাশে শুধু দেশী খাবারের দোকান ছিল; বললাম, খাবার খাবেন?

অগত্যা! ব'লে সে একটা বিড়ি ধরাল। সঙ্গে করে তাকে খাবারের দোকানে নিয়ে গিয়ে বসালাম। সে নিজেই এটা-ওটা ফরমাশ করল, আমি তাড়াতাড়ি পকেটে হাত দিয়ে টাকা তিনটে আর একবার গুণে নিলাম। জিজ্ঞাসা করলাম, দিদি কেমন আছে?

জানি না, বলে সে একটা রসগোল্লা গিলে ফেলল।

জানেন না, মানে?

মানে, আমায় কলা দেখিয়ে শালী ভেগেছে চার মাস!

আমি নীরবে উঠে দাঁড়ালাম। যাবার জন্য পা বাড়াতেই সে ব্যাকুল হয়ে বললে, চললেন যে?

সে কৈফিয়তে আপনার প্রয়োজন?

এহেঃ, চটেন কেন! খাবারের দামটা দিয়ে যান। আমার কাছে একটাও পয়সা নেই। মাইরি বলছি। কালীর দিব্যি।

দাম? দাম আমি জানি না, বলে পা বাড়ালাম।

সে উঠে এসে কাঁদকাঁদ হয়ে বলল, এ কোন দেশী ঠাট্টা ভাই? বিপদে ফেলে পালাতে চান কি রকম? প্রতিজ্ঞা করছি আর খারাপ কথা বলব না। খুব সম্মান করে কথা কইব। কি জ্বালা, আপনার পায়ে পড়চি দাদা, হল?

আমি ফিরলাম। সে আবার খেতে আরম্ভ করে অনুযোগের সুরে বললে,

রাগের মাথায় একটা বেফাঁস কথা বার হয়ে গেছে বলে কি এমন করতে হয় রে দাদা! মাইরি আমার বুক কাঁপছে এখনো।

কাঁপুক। চট্ ক'রে বলুন দিদির কি হয়েছে।

সে অনেকক্ষণ ধরে যা বললে তার সংক্ষিপ্ত মর্ম এই। মাস চারেক আগে একদিন সকালে উঠেই মমতাদি বললে, আমি বিদায় হলাম। এ জীবনের ক্ষুদ্রতা আমার সইচে না। আমি মহত্তর বৃহত্তর জীবনে সার্থকতা খুঁজতে চললাম। ব'লে নগেনকে কথাটি কইবার (অর্থাৎ চুলের মুঠি ধরে আটকাবার) সুযোগ না দিয়েই ফস্ করে চলে গেল। নগেন প্রথমটা ভেবেছিল সে বুঝি আমায় ভর করেই অকূলে ভাসল। (এইখানে সে হাত জোড় করলে, পাছে আমি রাগ করি) শেষে শুনল, তা নয়, কি একটা নারী-সমিতিতে যোগ দিয়ে সে দেশের কাজে লেগেছে। চরকা ঘোরায়, ছোট ছেলেমেয়েদের পড়ায়, বাড়ি বাড়ি মেয়েদের কাছে স্বদেশী প্রচার করে। একথা জেনে আমাকে মিথ্যা সন্দেহ করার জন্য দুঃখে লজ্জায় অনুতাপে—

আমি চুপ করে বসে রইলাম, সে আমার কানের কাছে দুঃখ লজ্জা অনুতাপের জ্বলন্ত বর্ণনা করে চলল। আমি খানিক শুনলাম, খানিক শুনলাম না। শেষটা কিছুই শুনলাম না।

উদ্গারের শব্দে সচেতন হয়ে দেখলাম, তার খাওয়া ও বক্তৃতা শেষ হয়েছে। পুনরায় উদ্গার তুলে বললে, আর খাব না, দামটা দিয়ে দিন।

দিচ্ছি। এত ঘটা ক'রে সাজ করেছেন কেন বলুন ত? দিদির শোকে নাকি?

কালো দাঁত বার করে সে হাসল, আরে রামো, সে বৃহত্তর মহত্তর জীবনে সার্থক হতে গেছে, তার জন্যে শোক কি! আবার বিয়ে করে ফেলেছি কিনা—বুঝলেন না? দুটো পয়সা দিন ত, পান কিনব।

আমার হঠাৎ ইচ্ছা হল খাবারের দাম না দিয়ে চলে যাই; দোকানীর হাতের অনেক মিষ্টি খেয়েছে, একটু প্রহারও খাক্। কষ্টে সে সঙ্গত ইচ্ছা সংযত করে দাম মিটিয়ে দিলাম। পান খাবার পয়সা দিয়ে নারী-সমিতির নাম টুকে নিয়ে পথে নেমে গেলাম। পথে মানুষের ভিড়। আমার মনে হল, একই পথ বেয়ে আমিও চলেছি এত লোকও চলেছে, কিন্তু প্রত্যেকের মনোবেদনার উৎস কত বিভিন্ন! এতগুলি চিন্তা-জগতের একটিতেও কি মমতাদির মত কেউ নীরব দুঃখের পদচিহ্ন এঁকে চলেছে?

নারী-সমিতিটির খোঁজ করে সম্পাদিকার সঙ্গে দেখা করলাম। তিনি জানালেন মমতাদি মাঝে একমাস জেল খেটেছে এবং আবার জেলে যাবার জন্য বাড়াবাড়ি আরম্ভ করায় তাকে মফস্বলে কাজ করতে পাঠান হয়েছে। এই সমিতির কাজ গঠনমূলক, ধ্বংস এর কর্মীদের ব্রত নয়, মমতাদিকে নিয়ে সম্পাদিকার বড় মুশকিল।

পরদিন আমি মমতাদি যে গ্রামে ছিল সেখানে গেলাম। কলকাতা থেকে চার পাঁচ ঘণ্টার পথ।

বেশ বড় গ্রাম। গ্রামের পাশে একটা নদী। খোঁজ করে, শোভার প্রাচুর্যে নদীতীর যেখানে আপনাতে আপনি মুগ্ধ হয়ে আছে, সেইখানে একটি ছোট টিনের বাড়িতে মমতাদির দেখা পেলাম। মমতাদি এবং তার সঙ্গিনীদের জন্য গ্রামের কে এক সদাশয় ব্যক্তি এই বাড়িখানা ছেড়ে দিয়েছিলেন।

তখন দুপুর। শরতের প্রথম হলেও রোদের তেজ ছিল। সদরের বারান্দায় উঠে দাঁড়াতে চার পাঁচটি চরকার শব্দ শুনতে পেলাম। মমতাদিকে ডাকতে চরকা থেমে গেল, সে বেরিয়ে এল।

হেসে বলল, এসেচ? আমি জানতাম খোঁজ পেলে তুমি আসবেই, দু'এক ঘণ্টা তর্ক করবেই। তোমার প্রতীক্ষা করছিলাম আমি।

তর্ক করব নিশ্চিত জান?

জানি। যে কাণ্ড করেচি, তর্ক না করে তুমি ছাড়বে?

যদি না করি তর্ক?

বিস্মিত হব। ভেবে পাব না বাঙ্গালী হয়েও তর্কের এমন সুযোগ কি করে ত্যাগ করলে। কিন্তু তুমি করবে। তোমার চোখে-মুখে তর্ক উঁকি মারচে। অন্ততঃ আলোচনা।

নদীতে নেমে মুখ হাত ধুয়ে আমি বারান্দায় মাদুরে বসলাম। সেও বসল —অর্ধেক মাদুরে অর্ধেক মাটিতে। মেয়েরা অমনি ভাবে বসে, বিনয়ের লক্ষণ ওটা। কথা আরম্ভ হওয়ার আগে আমি একবার ভাল করে তার মুখ দেখে বুঝবার চেষ্টা করলাম, এজীবনে সে সুখী হয়েছে কিনা। কিছুই স্পষ্ট বোঝা গেল না। আগের জীবনে সে অসুখী ছিল, কিন্তু মুখের একটু ম্লানিমা দেখে তার অসুখের পরিমাণ স্থির করা যেমন সম্ভব ছিল না, আজ সেই ম্লানিমার অন্তর্ধান এবং দেহে স্বাস্থ্য ও চোখে-মুখে একটা শান্ত-জ্যোতির আবির্ভাব দেখে

বোঝা গেল না সে কতখানি সুখী হয়েছে। বিশেষ, মাঝে মাঝে তার দৃষ্টিতে ব্যথার বিকাশ দেখা যেতে লাগল।

সে প্রশ্ন করল, তুমি কি আমাকে সমর্থন কর না?

আমি বললাম, ঠিক জানি না। ইচ্ছা হয় সমর্থন করি, কিন্তু বাধা পাই। তোমার সিদ্ধান্তে অনেক জটিলতা, সহজে মেনে নেওয়া কঠিন। তোমায় আমি চোখ বুজে সমর্থন করতাম যদি—

যদি?

যদি তোমার দেশ-প্রেম নিজের তেজে স্বামিপুত্রের প্রেমকে ছাপিয়ে যেত, যদি রাগ আর অভিমানের ভেজাল না থাকত।

সে হাসল! বলল, তাপসী নই, মন নির্বিকার নয়। ভেজাল হয়ত আছে। কিন্তু তুমি যে রাগ আর অভিমানের কথা ভাবচ তার ভেজাল নেই। তুমি ভাবচ আমি ঝগড়া করে ঝোঁকের মাথায় চ'লে এসেচি। তা সত্যি নয়। সে ভয় আমারও ছিল। কতদিন ধরে চেষ্টা করে আমি বাড়ি ছাড়তে পেরেছি জান? ছ'সাত মাসের বেশী। রাগের মাথায় চলে এসেচি ভেবে পরে পাছে আমার অনুতাপ হয় এই ভয়ে যখনি সে বেশী রকম খারাপ ব্যবহার করত আমি গৃহত্যাগের সময় পনরো দিন পিছিয়ে দিতাম। প্রতিজ্ঞা করেছিলাম যে অন্ততঃ পনরোটা দিন যখন রাগের কোন কারণ উপস্থিত হবে না তখন বাড়ি ছাড়ব, তার আগে নয়। এই প্রতিজ্ঞা বজায় রাখতে গিয়ে, আসবার জন্য পা বাড়িয়ে থেকেও ছ'সাত মাস আসতে পারি নি। শেষের দিকে ত হতাশ হয়েই পড়েছিলাম যে একবারও খিটিমিটি বাধবে না এমন পনরোটা দিন এ জীবনে আসবে না। কিন্তু হঠাৎ তার কঠিন অসুখ হল—

সেই সুযোগে চলে এলে!

সে হাসল।—শোনই আগে, পরে মন্তব্য প্রকাশ করবে। তার ত অসুখ হল, আমি নাওয়া খাওয়া ঘুম সব ছেড়ে দিয়ে এমন সেবাটাই করলাম যে অসুখ ভাল হওয়ার সঙ্গে সেও কিছুকালের জন্য ভাল হয়ে গেল। ঠিক বিয়ের দিনগুলি যেন ফিরে এল—এত আদর, এত সোহাগ, এত ভালবাসা! পনরো দিন হঠাৎ সদয় অদৃষ্টের দান ভোগ করে নিজেকে ছিনিয়ে নিয়ে আমি চলে এলাম। রাগ করে এসেচি আমি? ঝগড়া করে এসেচি? তা আর বলতে হয় না।

তবে এলে কেন ?

না এসে চলল না তাই।

তার মানেই তুমি হার মেনেচ। নগেনবাবুর সঙ্গে যে বাজি রেখেছিলে তাতে তোমার হার হয়েচে।

কিসের বাজি ?

মনে নেই ? একদিন বলেছিলে সে নিছক স্বামী; বিধাতা নয়। চোখ বোজার আগে তোমায় বাড়িছাড়া করার সাধ্য তার নেই, নেই, নেই।

নেই ত ! আমায় কেউ বাড়িছাড়া করে নি, আমি নিজে এসেচি। শুধু স্বামীকে সইতে না পেরে চ'লে আসব আমি কি তেমন মেয়ে ? নই, নই, নই। এগার বছর ধরে তার অবিচার অত্যাচার অভ্যাস হয়ে গিয়েছিল—সে জন্য নালিশ করতেও আমি ভুলে গিয়েছিলাম। তা ছাড়া স্বামী কি সারাদিন অত্যাচার করে ? চব্বিশ ঘণ্টায় দিন, ক'ঘণ্টা মানুষের নিষ্ঠুরতায় ধৈর্য থাকে ? যদি কোন বই-এ প'ড়ে থাক অত্যাচারী স্বামীর কথা, জানবে লেখক শুধু চব্বিশ ঘণ্টার গোটা একটা দিনের আধ ঘণ্টার হিসাব দিয়েচে, বাকী সময়টা চালাকি করে রেখে দিয়েচে নেপথ্যে ! অবশ্য ঐ বাকী সময়টা স্নেহ-ভালবাসায় বোঝাই না হয়ে একদম ফাঁকা হতে পারে—কিন্তু ওসব ফাঁক সংসারী মেয়েমানুষের সয়। শুধু স্বামী যার অবলম্বন, সপ্তাহে একটিও মিষ্টি কথা না শুনলে তার অসহ্য ঠেকতে পারে, আমার ত একমাত্র স্বামীই ছিল না জীবনে অবলম্বন ! শুধু স্বামীর হিসাবে অভাগিনী হলে অভাগিনী হয়েই আমি থাকতাম ভাই। তার হীনতা যদি শুধু আমার প্রতি অন্যায় করে নিরস্ত থাকত, যদি আমার বর্তমান জীবন এবং ভবিষ্যতে যে-জীবন পৃথিবীতে রেখে যাব সমস্ত গ্রাস না করত, আমি মুখ বুজে তার সংসার ঘাড়ে করে মরতাম। সুখশান্তির অভাব আমায় কাতর করত না, অনাহার, অনিদ্রা, প্রহার, নির্যাতন, উপেক্ষা কিছুই মুছে নিতে পারত না মুখের হাসি ! জীবনের আংশিক সফলতা পেলেই আমি তুষ্ট থাকতাম। কিন্তু তা হল না। কতক স্বামীর জন্যে কতক পারিপার্শ্বিক অবস্থার অভিশাপে সমগ্রভাবে আমি ব্যর্থ হয়ে গেলাম—সম্পূর্ণভাবে আমার জীবন হল অকারণ অর্থহীন। স্বামী নয়, দুঃখ দুর্দশা নয়—ব্যর্থ বেঁচে থাকাটা আমার সইল না। আমার আত্মা আর্তনাদ আরম্ভ করে দিল।

সতীনের ভয়ে ?—ব'লে আমি খোঁচা দিলাম।

সে চমকে উঠল।—সতীনের ভয়ে আত্মার আর্তনাদ? সতীন? সতীন হয়েচে নাকি এর মধ্যে? স্ত্রী ছাড়া তার চলবে না জানতাম, কিন্তু এত শীগ্‌গির! আমার পায়ের আলতার দাগ এখনো বোধ হয় ঘরের মেঝে থেকে মুছে যায় নি। আমি কি তার ঘরের এতখানি স্থান জুড়ে ছিলাম যে বিশাল ফাঁকটা সইল না, তাড়াতাড়ি পূর্ণ করতে হল?

নালিশ! ক্ষুণ্ণ ক্ষুব্ধ অভিযোগ! মনে হল, অভিমানও জেগেছে—ঈর্ষার বসন-পরা অবুঝ অভিমান। মুখে একটা কালো ছায়া ভেসে এসেছে, দুচোখে ঘনিয়েছে ব্যথা। দেখে আমার বিশেষ ভাল লাগল না। মুখে সমর্থন করি আর না করি মনে মনে তার মানবীত্ব ঘুচিয়ে তাকে দেবীর মত জ্যোতির্ময়ী করে তুলেছিলাম—দধীচি থেকে আরম্ভ করে আজ পর্যন্ত সংখ্যাহীন জ্যোতিষ্ক যে-জ্যোতির সঙ্গে পরিচয় করিয়েছে মানুষের। মানবতার ছায়াপাতে মমতাদির সে ভাস্বর মূর্তি কল্পনার নেপথ্যে হঠাৎ যেন ম্লান হয়ে গেল।

বললাম, এবার আমার পুরো অসমর্থন মমতাদি! ছলনা করেচ নিজেকে। ভেবেচ কর্তব্য ত্যাগ বুঝি সত্যি ত্যাগ। দুঃখের কাছে হার মেনে তুমি পালিয়েচ কর্তব্য পিছনে ফেলে!

সে বললে, কর্তব্য মানে? স্বামিসেবা? তনুমন দিয়ে তনু পরিচর্যা? শিক্ষা তোমায় উদার করেনি দেখচি! এই নারীবিদ্রোহের যুগে ওকি কথা বলচ তরুণ? কোন যুগের মানুষ তুমি?

—এ যুগের। আমায় টেনো না। আমার শিক্ষা অতি অনুদার। উদার শিক্ষা কোথায় পাব? নচিকেতার মত যমের বাড়ি না গেলে আর সে শিক্ষা জুটচে না। দুঃখ এই যে যম আমায় বাড়ি ফেরার জন্য ছেড়ে দেবে না। কিন্তু তনু-পরিচর্যার নালিশ পুরোনো, পচা। নিজেই বলেচ ও জন্য বাড়ি ছাড়নি। একটা অমানুষের মঙ্গল যে করতে পারল না, নিজের লোকের অত্যাচার সইতে পারল না, লক্ষ মানুষের মঙ্গল করার শক্তি সে কোথায় পাবে, পরের অত্যাচার সয়ে কি করে ব্রতরক্ষা করবে?

—লাখ মানুষের আশীর্বাদের জোরে। কিন্তু তোমার যুক্তিটা বেশ! লজিকের সেই ফ্যালাসির মত—মানুষ অমর নয়, বানর অমর নয়, অতএব মানুষ বানর। একের সঙ্গে লাখের তুলনা চলে? যে বক আঁকতে পারল না, সাহিত্যিক হয়ে সে মানুষের সৃষ্টি করতে পারবে না এ কথা বলা যায়? একটি

মাত্র রত্নাকরের মঙ্গল করে গেলে সে একদিন বাল্মীকি হয়ে উঠবে এমন আশা করা বোকামি। কিন্তু এ আশা অনায়াসেই করা যায় লাখের মধ্যে হাজার বাল্মীকি ঘুমিয়ে আছে! গণ্ডী ছোট হলেই যে ভাল কাজ করা যাবে তার মানে নেই। বাড়ির বৌ সমস্ত বাড়ি পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখতে পারে—কিন্তু বাড়ির সব চেয়ে ছোট ঘরটি পরিষ্কার করার জন্য ডাকতে হয় মেথরকে। আমি চেষ্টা করি নি ভেবেছ? এগার বছর চেষ্টা করেচি। কিন্তু ঘরের পাকা মেঝেতে আমার চেষ্টার লাঙ্গল আঁচড় কাটতে পারে নি—ফসল ফলার কি! তাই এসে দাঁড়িয়েচি এই বিস্তীর্ণ মাঠে। যত আগাছা থাক, মাটি যত শক্ত হোক, অল্প একটু স্থান পরিষ্কার ক'রে আবাদ করতে পারব না? বাকী জীবনের চেষ্টায় একটু সোনা ফলবে না? পারব—ফলবে। সে থামল। একটু ভেবে বলল, এই কথাটা আমি ভাবতাম। রাত্রিদিন ভাবতাম। স্বামী আমার কাছে ছোট নয়—তুচ্ছ নয়—কিন্তু পর। সব স্বামীই পর—নিজের চেয়ে মানুষের আপনার কেউ নয়—প্রেমে নয়, স্নেহে নয়। প্রেম দুটি আত্মাকে কাছে আনে, কিন্তু আত্মগত আত্মার চেয়ে কাছে-আসা আত্মার দূরত্ব বেশী। তাই আমি ভাবতাম যে, শুধু পরের কল্যাণেই বেঁচে থাকব, আমার আত্মার কল্যাণ নেই? আমার জীবন তাদেরি কল্যাণে ব্যর্থ হবে যাদের কল্যাণ হয় না? সবাই পরের জন্যেই অবশ্য বেঁচে থাকে, কিন্তু নিজের জন্য আহরণ করে ওই বেঁচে থাকার সার্থকতাটুকু। ওরি নাম নিজের আত্মার কল্যাণ। নিজেকে দিলাম, কিন্তু দেওয়াটা মিথ্যা হল না, এই টুকু। অন্যায়ের বিনাশের জন্য দধীচির আত্মদান—ইন্দ্র বজ্র নিয়ে খেলা করবে বলে নয়। আমি দধীচির মেয়ে নই। যদি হইও দধীচির মেয়ে, আমার অস্থির বজ্র নিবে গেচে। একটু তাপ শুধু আছে নেবা বজ্রের ভস্মে। সেইটুকু যদি বরফের ঘর গরম রাখতে ব্যয় করে যেতাম, মরবার সময় অপচয়ের স্মৃতিতে আমার আত্মা দগ্ধ হত। আজীবন স্বামিসেবার পুণ্যও পুড়ে হত ভস্ম! কারণ, সারাজীবন চোখ বুজে কাটিয়ে মরবার সময় আমি চোখ মেলে দেখতাম দুর্লভ জীবন কার পূজায় কাটল। তখন জীবনব্যাপী দানব-পূজার আপসোস নিয়ে আমায় পরলোকে যেতে হত। আপসোস নিয়ে মানুষ কোন্ পরলোকে যায় জান? নরকে।

আমি বললাম, এটুকু বুঝলাম। কিন্তু আসল কথা এখনো বলি নি। তোমার ত শুধু স্বামী নয়, দুটি ছেলে।

সে সংশোধন করে বলল, দুটি না ছটি। চারটি স্বর্গে গেছে। দুটি গর্ভের অন্ধকার থেকে, পৃথিবীর আলো দেখে। না, দুটিই আলো দেখে নয়, একটি অন্ধ হয়ে জন্মেছিল।

এ বারতায় ব্যথা ছিল, আঘাত ছিল। আমাদের শিশু-জগতে স্থায়ী মড়ক আছে সে কথা শুনেছিলাম। শুনেছিলাম মানে, দৈনিক অথবা মাসিকে পড়েছিলাম। শুধু পড়েছিলাম। কখনো ভেবে দেখিনি শিশুর মরণের শেষ শিশুর মরণে নয়, মমতাদির মত অসংখ্য মাতার মর্ম-বেদনায়। জগতে যার বাড়া মর্মবেদনা নেই।

সে বললে, তুমি ভাবচ এতক্ষণ ব্রহ্মাস্ত্র তুলে রেখেছিলে, ছেলে দুটির কথা তুলে আমাকে কাবু করবে। ছেলেই বটে! বড় ছেলের বয়স বার—মনের বিকৃতিতে বার শ। সে চোর, তাড়িখোর, কুটিল, রাগী, বোকা, অলস। ছোটটিও ওমনি ভাবে গড়ে উঠচে—দুজনেই একদিন বাপের মত হবে।

অত খারাপ? বলে আমি জিভ কাটলাম।

সে বললে, জিভ কেটোনা। সারা জীবন কথা কইতে হবে, এখন জিভ কাটা গেলে মুশকিল। নিজেই স্বামিনিন্দে জুড়েচি, তোমার কথায় আর কত ব্যথা পাব? আমার ছেলে দুটি বাপের মত অত খারাপ যদি নাও হয়, যেটুকু হবে তাতেই প্রকাণ্ড অমানুষ হবে। সদ্‌গুণে বোঝাই হয়ে করবে ত্রিশ টাকার কেরানীগিরি—তাতেই অধিকারী হবে স্ত্রী-পুত্র সংসারের। দশ বছরে দশটা কুকুরছানার বাপ হবে—অকালমৃত্যু এড়াতে পারলে যারা বড় হয়ে দশ দশে একশটা শূকরছানা পৃথিবীকে উপহার দেবে। অবিশ্বাস করচ? পৃথিবী এমনি ক'রে ভারাক্রান্ত হয় ভাই—একটা গলিত আত্মায় হাজার হাজার গলিত আত্মার বীজ কিলবিল করে। এই জন্তে যীশু বলেছিলেন, একটি পাপী স্বর্গের দিকে মুখ ফেরালে স্বর্গরাজ্যে আনন্দের সাড়া পড়ে যায়। একটি মানুষ থেকে মানব জাতি হয়েচে—কে বলতে পারে একটি পাপী থেকে একদিন একটা বিরাট পাপীর জাতি পৃথিবীতে দেখা দেবে না? একটি অমানুষের মধ্যে সমগ্র মানব জাতির ভবিষ্যৎ ধ্বংসের সম্ভাবনা নিহিত আছে। ওমনি অমানুষ হয়ে উঠচে আমার ছেলেরা! দশ মাস দেহের মধ্যে ব'য়ে বেড়িয়েচি, নিজের রক্তে পুষ্ট করেচি, দিনের পর দিন বুকে নিয়ে পালন করেচি, স্নেহ করেচি, ভালবেসেচি জগতের দুটি অভিশাপকে। জ্ঞানের আলোয় নিজের এই মহৎ দুষ্কর্ম চিনে আমি পালিয়ে এসেচি। পাপে

আমার বিরাগ, ব্যর্থতায় অরুচি। প্রাণপাত সেবায় দেশের বুকের পাথরকে পাহাড় করে তোলা পাপ।...তোমার দুচোখে প্রতিবাদ কেন? সংস্কার কি তোমায় পাপ আর ব্যর্থতার স্বরূপ ভুলিয়ে দিচ্চে?

আমি বললাম, না। তোমার কথাগুলি এত ছোট-বড় কথার চুম্বক যে হঠাৎ শুনে ঠিক মত ধারণা ক'রে উঠতে পারচি না।

সে বললে, সেটা আশ্চর্য নয়। বিয়ের পর থেকে এগার বছর শুধু ত জ্বলিনি—তিল তিল করে চিন্তার হিমালয় সৃষ্টি করেচি। আমার কথা তোমার চিন্তাশক্তিকে পীড়ন ত করবেই। এগার বছরের ভাবনা কি দুমিনিটে ভাবা যায়? আমি বললাম, বুদ্ধি থাকলে যায়, বোকা হলে যায় না। আমি সময়মত ভাবব। তুমি বলে যাও, আমি আরও কিছু ভাবনার খোরাক সংগ্রহ করি।

সে বললে, ভেবো। ভেবে দেখো আমি বাড়িয়ে বলিনি, অবস্থা বিশেষে মা হওয়া সত্যই মহাপাপ, মহৎ ব্যর্থতা। তুচ্ছ পয়সা দিয়ে কেনা দুধ কলা দিয়ে সাপ পোষা অন্যায়, দুর্ভাগ্য;—শরীরের রক্ত খাইয়ে সাপ পোষা কতবড় অন্যায়, কতবড় দুর্ভাগ্য? আবার, এই শোচনীয় কৌতুক একমাত্র মায়ের অদৃষ্টে! স্বামীর কাছে জীবনের একটি স্ফুলিঙ্গ ভিক্ষা পেয়ে তিল তিল ক'রে বাড়িয়ে জননীকেই জ্বেলে দিতে হবে একটি সম্পূর্ণ জীবনের চুল্লী—যদি সে চুল্লীতে জগতের কল্যাণে যজ্ঞ করা যায় গৌরব জননীর, যদি তার আগুনে গৃহদাহ হয় কলঙ্কও জননীর। মায়ের দায়িত্ব এতবড় ভাই! তাই পৃথিবীর দুটি গলগ্রহ সৃষ্টি করে আজ আমার অসীম অনুতাপ। আমার মাঝে মাঝে ভয় হয় দেশ আমার সেবা নেবে না। অসুস্থ দেশের মুখে যে দুফোঁটা বিষ ঢেলে দিয়েচি সে অপরাধ ভুলবে না। এ চিন্তার দাহে আমার শুধু ক্ষেপে যাওয়া বাকী আছে। ভগবান আজ যদি ওদের কাছে টেনে নেন, তবে বোধ হয়—তবে বোধ হয়—

ভগবানের নাম নিয়ে মার মুখে সন্তানের মৃত্যু কামনা! এই অস্বাভাবিক ভীষণ মহত্ত্বে আমি চমকে গেলাম। নিজের অসমাপ্ত উক্তির প্রহারে সেও কেঁদে ফেলল। আমি বুঝলাম এ কান্নার অর্থ কী। অভিশাপের প্রত্যাহার। মুখের কথা নয়, ভগবান যেন মনের কথাটাই কানে তোলেন এই নিবেদন।

সূর্যালোকে নদীতে ঢেউগুলি চমকাচ্ছিল, তীর ঘেঁষে চলেছিল একটি পানসি। বুড়ো মাঝি লগি ঠেলছে, ছেলে কোলে একটি মেয়ে তীরের শোভায় মুগ্ধ হয়ে বসে আছে, একটি দুরন্ত ছেলের হাত শক্ত করে ধরে। কিছু দূরে নদীর

বাঁক, সে পর্যন্ত আমি নৌকার জননীটিকে অনুসরণ করলাম। ততক্ষণ কাছের জননী শান্ত হয়েছে।

বললাম, এভাবে চরমে উঠলে আমাদের আলোচনা আপনা থেকে বন্ধ হয়ে যাবে।

সে ম্লান হেসে বলল, চরম কীর্তির আলোচনায় চরমে না উঠে উপায়?

বললাম, তুমি শুধু ইঙ্গিত কর, বাকীটা আমি অনুমান করব। নরকের অন্ধকার আর স্বর্গের জ্যোতি টেনে আনলে দুটোই চোখকে খোঁচা দেবে, অসুস্থ করবে। আমরা পৃথিবীর মানুষ, আমাদের মাঝামাঝি রফা হওয়াই ভাল।

ভীরু! ব'লে সে হাসবার চেষ্টা করলে।

আমি বললাম, নিঃসন্দেহ। কিন্তু আর সমালোচনা নয়। যত রেখে-ঢেকেই বল অপমানিত হব। তোমার কথাই হোক্। তুমি যা বললে তাতে একটা প্রকাণ্ড মুশকিল আছে। বোধ হয় সে মুশকিলের অবসানও নেই।

কি মুশকিল?

আমার মত ভীরু অকর্মণ্য থেকে আরম্ভ করে তোমার ছেলেদের মত চোর ছ্যাচোড়কে জন্ম দিতে সবাই যদি তোমার মত অস্বীকার করে, দেশের সূতিকাঘরের সাড়ে তিন দিকের দেয়াল ভেঙে পড়বে। দেশটা তখন জন্মাবে কোথায়?

জন্মাবে না!

শুনে আমি থ বনে গেলাম। সে বলল, ভড়কে গেলে দেখছি। দুর্ভাবনার কারণ নেই। দেশের সূতিকাঘরের সাড়ে তিন দিকের দেয়াল কি আমার মত মায়েরা? দেশ কি জন্মায় কেরানী আর অপদার্থ ধনীর ঘরে? শহরের বিষ-পান ক'রে যে কটি মানুষ জ্ঞান হারিয়েচে তাদের বাড়িতে? কলকাতাতেই অগুনতি ডালিম বেদানা,—আইন করে তাদের সকলকে হত্যা করলে কলকাতার নারী-সমাজের কি আসবে-যাবে? বরং লাভ হবে—ক্ষতি নয়। আমার মত মায়েরা মা হতে অস্বীকার করলে সূতিকাঘরের অনাবশ্যক ভিড় কমবে, দেশের উপকার হবে। গান্ধারীর সংযমে কুরুক্ষেত্রের কলঙ্ক রদ হবে। ঘরের মানুষের সঙ্গে লড়াই করে ধর্মকর্মের শক্তিক্ষয় হবে না;—জগতের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ধর্ম জগতে ছড়িয়ে পড়ার সময় পাবে, জগতের মধ্যে শ্রেষ্ঠ কর্মী জগতের স্বাধীনতা মুহূর্তে অর্জন করবে। দুর্যোধনকে মজুত রাখতেই যুধিষ্ঠির আর অর্জুনের সময় ও শক্তি ব্যয়িত হলে গান্ধারীর কি লজ্জা ভাই? সহজ লজ্জায় কি মা হয়ে ছেলেকে বলেছিল, তোমার নয়, ধর্মের জয় হোক।

আমি বললাম, তবে বললে কেন—দেশ জন্মাবে না? কথার সুরে মনে হল দেশ না জন্মালে ক্ষতি নেই।

সে বললে, ও যদির কথা। আমরা মা না হলে যদি দেশের সূতিকাঘরের সাড়ে তিন দিকের দেয়াল সত্যি ভেঙ্গে পড়ে। জন্মানোটাই কি দেশের চরম সৌভাগ্য? না জন্মানোটা দুর্ভাগ্য? কত দেশ গেছে সমুদ্রের তলে, কত জাতির চিহ্ন লুপ্ত হয়েচে। সে জন্য কে তাদের দোষ দেয়? অবসানের দুঃখ কি? মৃত্যু যদি মানুষের লজ্জা না হয়, মানুষে-গড়া জাতির মৃত্যুতেও লজ্জা নেই। ক্রমাগত রোগে ভোগার চেয়ে বরং মরণ ভাল।

আমি বললাম, এ সব হতাশার বাণী, ভুল কথা। মৃত্যুতে মানুষের লজ্জা নেই, কারণ মৃত্যু যবনিকা নয়, পটপরিবর্তন। নিজের জীবন মানুষ পৃথিবীর মানুষের মধ্যে জমা করে রেখে যায়, স্বর্গে নিয়ে যায় না।

জমা করা জীবন যখন পচে যায়? একমাত্র Noahকে বাঁচিয়ে প্রলয়ের মধ্য দিয়ে যখন ভগবান ভ্রমসংশোধন করতে বাধ্য হন?

তখন ভগবান অত্যাচারী খেয়ালী। প্রলয় যে এনে দিতে পারে সে সংস্কারে অক্ষম হবে কেন? জীবনের রোগ আছে, ফাঁসি ছাড়া আরোগ্য নেই? ক্রমাগত রোগে ভোগার চেয়ে মরণ ভাল, কিন্তু রোগ সারিয়ে বেঁচে থাকা আরও ভাল।

সে মৃদু হাসল, তোমার হল কি? আমি পূবে পা বাড়াচ্চি, তুমি হাঁকচ পশ্চিমে যাত্রা নাস্তি। সুস্থ সবল হয়ে বাঁচা মন্দ আমি তা বলিনি। বলেচি, লয় অপরাধ নয়, লয়ে লজ্জা নেই। এটা আমাদের আলোচনা-গণ্ডীর বাইরের অতিরিক্ত সত্য। আমার সমস্যার সঙ্গে খাপ খাওয়াতে গিয়ে ব্যাকুল হয়ো না। পাগল! হাজার হাজার মানুষের দেহের রক্ত আর জীবনের দিন দিয়ে অসুস্থ দেশের জন্যে ওষুধ তৈরী হচ্চে, আমি করব তার প্রতিবাদ? অতিরিক্ত দার্শনিক তত্ত্বকথা থাক, আমার কথাটা নিয়ে আলোচনা চলুক। আমি বলেচি, অসুস্থ দেশের ওষুধের উপযুক্ত জীবন সৃষ্টি হোক, কিন্তু কুপথ্য আর বিষের সৃষ্টি যেন না হয়। তুমি প্রতিবাদ কর?

আমি বললাম, ঠিক প্রতিবাদ নয়। বলতে চাই, সে ত তোমাদের হাতে!

মানে?

মানে, সব শিশুই আরম্ভ—পরিণতি নয়। জীবনের ভিত্তির মিস্ত্রীও তোমরা। তুমি ছেলে দুটিকে মানুষ করে গড়ে তুললে না কেন? স্বামীর মঙ্গল করতে পারলে

না, তার কারণ বুঝতে পারি, তার শিক্ষা-দীক্ষা সমাপ্ত হয়ে গিয়েছিল তোমার সঙ্গে পরিচয়ের আগে। কিন্তু তোমার ছেলেরা ভালমন্দ কোন শিক্ষা নিয়েই জন্মায়নি। তাদের তুমি মানুষ করে গড়ে তুললে না কেন? নিজেই বললে তোমার শক্তি সামান্য। সামান্য শক্তি এত বড় দেশে ছড়িয়ে দিয়ে কি লাভ হবে? দুটি ঘুমন্ত দেশ-সেবককে জাগাতে পারলে সব চেয়ে বড় দেশসেবা হত না? কেন তা করলে না?

কেন করলাম না? পারলাম কই? খাঁচার শিকে শিকে বাধা পেলাম। কোলের ছেলে যখন এক বছরেরও নয়, গর্ভে ছেলে এলো। সকাল-সন্ধ্যা রান্না-ঘরে কাটল, বাকী সময় নানা কাজে। অভাবের খোঁচায় মাথায় ঘা হয়ে গেল, চিন্তার বিষে অবসন্নতা ও অবহেলা এল। যেটুকু সময় ও সাধ্য হাতে রইল, স্বার্থপর স্বামী ছিনিয়ে নিল। তবু আমি পারতাম। অতিমানুষ না করতে পারি অমানুষ হতে দিতাম না, যদি ওদের জীবন বিষাক্ত আবহাওয়ায় বিষিয়ে না যেত। চব্বিশ ঘণ্টা পলে পলে যাদের জীবন বিকৃত হয়, পাঁচ মিনিটের চেষ্টায় আমি তাদের কি করতে পারি? জন্ম থেকেই ওরা অভিশপ্ত। বাপের অসংযমে জন্মাল রুগ্ন হয়ে, খাদ্যের অপ্রাচুর্যে দেহ মন কুঁকড়ে গেল, বিকাশ হল না, জীবনী-শক্তির অভাবে ক্রমাগত রোগে ভুগল, দোষে বিনাদোষে বাপের ছ্যাচা খেয়ে কুটিলতা শিখল, শিশুমনের তুচ্ছতম আকাঙ্ক্ষাটি অতৃপ্ত থাকায় চুরি শিখল, বাড়ির ভয় ও নিরানন্দ আবহাওয়ায় মন না টেঁকায় বেশী সময় বাইরে কাটাতে ভালবাসল, যার তার সঙ্গে মিশে অসৎসঙ্গের অশেষ দোষ সঞ্চয় করল, পয়সা আর খাবারের লোভে বজ্জাত লোকের কাছে কামুকতার দীক্ষা পেল। এ ত সংক্ষিপ্ত হিসাব, আরও কত আছে! এবার বুঝলে কেন পারলাম না?

আমি কতক্ষণ কথা বলতে পারলাম না। এ কি বর্ণনা, এ কি নালিশ! মনের জ্বালা কি শব্দের রূপ নিতে পারে? অত্যুক্তি মনে করার চেষ্টায় আমি ব্যর্থ হলাম, আমার কোন সান্ত্বনা রইল না। শুধু মুখের কথা ত নয় যে, শোনার সঙ্গে হৃদয়ের যোগাযোগ কমবেশী করে যতটুকু মানলে মনের স্বস্তি ততটুকু মানবো। সন্তানহারা মা আমার সামনেই বসেছিল। অত্যুক্তি যদি, ও কেন ছেলে ফেলে এল! সন্তান হারানোর চরম প্রমাণেই যে ও প্রমাণ করেছে অভিযোগ বাড়িয়ে বলা নয়!

সে বললে, অনেক দুঃখেই বাড়ি ছেড়েছি ভাই! আমি অভিশপ্তা স্ত্রী ও জননী,

আমার সন্তান দেশের অভিশাপ, জীবনের এমন অসামঞ্জস্য বরদাস্ত হল না। আমি মুক্তি নিলাম। এ মুক্তি সময় সময় পীড়া দেয়, এগার বছরের চেনা খাঁচার ডাক আমি শুনতে পাই। আমার বুক ফেটে যায়। আমি যাতনায় ছটফট করি। কতক্ষণের জন্য দেশের সেবায় দারুণ বিরাগ জন্মে। মনে হয়, ন্যুব্জ হয়ে পথের ধুলোয় চোখ বুলিয়ে চলতে দেশের মানুষ যদি ভালবাসে, ভালবাসুক ; সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে মুক্ত নীলাকাশের দিকে না তাকাতে চায় না চাক্ ;—আমার কি ? আমি কেন মাতৃত্বের আত্মহত্যা দিয়ে এমন নিষ্ঠুর পূজা করে চলি ? কিন্তু এ দুর্বলতা কেটে যায়, মুক্তির পীড়ন গর্ব ও আনন্দ হয়ে ওঠে।

আমি বললাম, দেশে অসংখ্য পুরুষ দিদি! তরুণ-তরুণীতে দেশ ভরা। তোমার মত তারা মাটিতে শিকড়-বসা তরু নয়। নিজেকে উপড়ে তুলে এই অস্বাভাবিক ত্যাগ তোমার করতে হবে কেন ? তুমি ফিরে যাও।

সে হাসল, সংখ্যার গর্বে দেখি ফেটে পড়ছ! প্রমাণ কই ? তুমি আমায় বুঝিয়ে দিতে পারবে যে আমি অনাবশ্যক অতিরিক্ত বাহুল্য ? যদি পার, এখুনি ফিরে যাব। সতীনকে পর্যন্ত ভয় করব না! একটু থেমে বললে, তুমিও ত পুরুষ, না ভাই ? শিকড়হীন পুরুষ! কেবল কলেজ ডিঙিয়ে শিকড়-গাড়বার জন্য ব্যাকুল হয়ে আছ, এই যা আপসোস। একটি বাড়ি, টুকটুকে একটি বৌ, চাঁদের টুকরো একটি ছেলে। খাসা শিকড়। না ? লোভী!

আমি ক্ষুন্ন হয়ে বললাম, অনেক আগে ঘাট মেনেচি, খোঁচাচ্ছ কেন ?

খোঁচাচ্ছি ? মাইরি না। কালীর দিব্যি। স্বামীর ভাষাতে প্রতিবাদ করলাম, আর রাগ কোরো না। বলে সে হাসল। আমি গম্ভীর হয়ে ভাবতে লাগলাম।

সেও গম্ভীর হয়ে বললে, সত্যি খোঁচাইনি ভাই। খোঁচাবার অধিকার কোথা পাব ? যার যে অধিকার নেই সে তা করলে ভেবে নিতে হয় ঠাট্টা করেচে।

খোঁচাবার অধিকার তোমার আছে।

না, নেই! আমার দেশসেবা যে বাধ্যতামূলক।

সে সবারি। অধীনতা বাধ্য করে।

করে কি ? অধীনতার দুঃখ না স্বাধীনতার লোভ করে কি করে জানলে ? না ভাই, জবাব চাই নি। একথার জবাব মানে আধ ঘণ্টা ধরে তোমার বক্তৃতা। আমি জানি জবাব। দুই কারণেই। কিন্তু ওরকম দেশসেবা বাধ্যতামূলক নয়

ভাই। তা হলে মাতৃস্নেহকেও বাধ্যতামূলক বলতে হয়। আমার এই সেবা কিন্তু সত্যি বাধ্যতামূলক। সে জীবন সইল না বলে আমি এ জীবনে আশ্রয় নিয়েচি—ঝড়ে ভাঙা তরী এনেচি বন্দরে। বেশী নয়, একটা ছেলেকেও যদি মানুষ করতে পারতাম আমি সেখানকার মাটি কামড়ে থাকতাম। আকণ্ঠ নয়, ব্যর্থতায় একেবারে তলিয়ে গিয়ে দম আটকাল বলেই না এখানে নিঃশ্বাস ফেলতে এসেছি! আমি আজ সুখী দুঃখী দুই, কিন্তু এগার বছর যে দেয়ালের অন্তরালে ছিলাম, সেখানে থেকে সন্তানের মধ্যে দিয়ে দেশের সেবা করতে পারলে আরও সুখী হতাম। কিন্তু এ কথাটাও বলি, আমার এ জীবন আমার ব্যক্তিগত সুখ দুঃখের বহু উর্ধ্বে —আমার এ জীবন তুলনাহীন। ছিলাম যন্ত্র—আজ আমি মানবী, যার আত্মা আছে, যার জীবনের অনেক মূল্য, অনেক প্রয়োজন, অনেক মানে। বেশী কি, আমি আজ তোমার প্রণম্য!

আমি নীরবে তাকে প্রণাম করলাম, পেলাম আশীর্বাদ। তারপর চুপ করে বসে রইলাম। সূর্য তখন নদীর অপর তীরে, তরুশ্রেণীর খানিক উর্ধ্বে। নদী দিয়ে একটা স্টীমার চলে গেল, তীরে আছড়ানো ঢেউ-এর শব্দ মৃদুভাবে কানে এল। কয়েকটা বক নদীতীরে বসেছিল, হঠাৎ উড়ে গেল।

মমতাদি বোধ হয় ভাবে নি এত শীগ্‌গির আমি তাকে রেহাই দেব। স্পষ্ট অনুভব করলাম সে আমার কথা বলার প্রতীক্ষা করছে। কিন্তু আমি আর মুখ খুললাম না। কত কথা ত বললাম, কিন্তু কথা বলে লাভ কি? সংসারের জ্বালায় কত মানুষ গেরুয়া পরে পালিয়েছে, কত মানুষ ক্ষেপে গেছে, কত মানুষ আত্মহত্যা করেছে,—মমতাদি যদি জগতের মধ্যে মহত্তম কর্মবৈরাগ্য আধ-পোড়া মনের আগুন নেবাতে চায়, কথার বিনিময়ে কোন কিছুর এদিক-ওদিক হবে না। পরিণয়ের যজ্ঞভস্মে ঘি ঢেলে চলা যত বড় কর্তব্য হোক, সেটা ঘিয়ের অপচয় নিশ্চয়ই; সে অপচয় বন্ধ করা যত বড় অকর্তব্য হোক, স্বাধীনতার হোমানলে ঘি ঢেলে চলা যে ঘিয়ের সবচেয়ে সদ্‌ব্যবহার তাও নিশ্চয়ই। সুতরাং নানাবিধ ধারণা ও সংস্কারে বোঝাই মন নিয়ে তর্ক করা কথারই অপচয়।

অতএব কথা বন্ধ করে আমি ভাবতে লাগলাম অধুনা-পরিত্যক্ত স্বামিপুত্রের কল্যাণে এই নারীটি একদিন আমাদের বাড়ি রাঁধুনী হয়েছিল,—গভীর রাত্রে ঘুমের কবল থেকে ছিনিয়ে-নেওয়া কয়েক ঘণ্টা সময় ছাড়া এগারটি বছর একটানা বেঁচেছিল শুধু স্বামিপুত্রের জন্য।

স্নেহ, প্রেম, মমতা, মানুষের নাগপাশ। নাগপাশে মূর্ছার তন্দ্রা। সে নাগপাশে আবদ্ধা থেকেও যে মোহনিদ্রা টুটিয়ে দিলে, বাঁধনসুদ্ধ যে বেরিয়ে পড়ল পথে, পাশবদ্ধ কর্মশক্তি নিয়ে যে সকলের জন্য যে-বিপুল কাজ পড়ে আছে তার নিজের ভাগটুকু শেষ করতে প্রবৃত্ত হল তাকে বোঝা যায় না। সে দুর্বোধ্য ; তাকে ঘিরে রহস্য। মমতাদির শান্ত ও গম্ভীর মুখ দেখে আমার মনে হল, রাঁধুনীর কাজ নিতে এসে যে আমার শেষ শৈশবে স্নেহ-করার শক্তিতে রহস্যময়ী হয়ে উঠেছিল, আজ আমার প্রথম যৌবনে সে আবার স্নেহ অস্বীকার করার শক্তিতে রহস্যময়ী হয়ে উঠেছে।

সন্ধ্যার সময় বিদায় নিলাম—প্রদীপ জ্বালার আগে। সে বললে, তোমায় একটা কাজ দেব।

কি কাজ ?

সপ্তাহে একখানা কার্ড লিখে ওদের খবর দেবে।

কি খবর ? কুশল ?

হুঁ, বলে সে চোখ মুছতে মুছতে হাসল।

বলচ ওদের। ওদের মানে কি তোমার স্বামীরও ?

নিশ্চয়। আধখানা কুশল সংবাদ নিয়ে করব কি ?

স্বামী-ভাগ একেবারে আধখানা ! একটা স্পষ্ট কথা জিজ্ঞেস করচি। স্বামীকে তুমি ভালবাসতে ?—ব্যস্ !

সে একটু ভাবল, ভালবাসা ? প্রেম ? কি জানি ভাই, ওসব বুঝি না। এইটুকু বুঝি যে না দেখলে মন কেমন করে, খবর জানতে ইচ্ছা হয়। এগার বছর যার ঘর করা যায় তার হীনতা বোধ হয় স্নেহ মমতাকে ঠেকিয়ে রাখতে পারে না।

আজ ঠিক করতে পারি না তার স্বামিপ্রেম ছিল কি ছিল না।

নেকী

পূর্ববঙ্গের মহকুমা শহর।

শহর সন্দেহ নেই, তবে বিশুদ্ধ নয়। গ্রামের খাদ আছে। চারিদিক ঘুরে এলে মনে হয় এ যেন শহর আর গ্রামের আলিঙ্গনবদ্ধ মূর্তি।

বাজার আর আপিস অঞ্চলটুকু দিব্যি শহর। আপটুডেট বাজার,—কলকাতায় কোন নতুন ফ্যান্সি জিনিস উঠলে এক মাসের ভেতরে স্থানীয় মনিহারী দোকানগুলিতে আত্মপ্রকাশ করে। একটিমাত্র বাঁধানো রাস্তা, মাইলখানেক লম্বা, —বাজারের বুক ভেদ করে, আদালতের গা ঘেঁষে গিয়ে মাটির রাস্তায় আত্মগোপন করেছে। বাজারের কাছে ছোট ছোট কয়েকটা শাখাও আছে।

বাজারের কিছু দূরে পাকা রাস্তার ধারে একটি হাইস্কুল। কাছাকাছি পাবলিক লাইব্রেরী, টাউন হল, অফিসারদের ক্লাব, ক্লাব-সংলগ্ন টেনিস-কোর্ট ইত্যাদি। অভাব নেই কিছুরই। শহর যেমন হয় আর কি!

বাকীটুকু কিন্তু গ্রামছাড়া কিছু নয়। বাড়ি ঘর সবই প্রায় চাঁচের বেড়া এবং টিনের ছাদ দেওয়া। কোন কোনটার ভিটেটুকু মাত্র পাকা বাঁধানো। শুধু তাই নয়, গ্রামের যা প্রধান প্রধান লক্ষণ, প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড আম কাঁটালের বাগান, পুকুর, ডোবা, ঝোপ ঝাড় জঙ্গল, বেতবন থেকে আরম্ভ করে সাপ, ব্যাঙ, শিয়াল, বেজী এবং টিকটিকির রাজসংস্করণ গোসাপ পর্যন্ত সমস্তই আছে।

শহরের পশ্চিম প্রান্তে আগাগোড়া চুনকাম-করা একটি পাকা বাড়ি। বাড়িটা বরাবর স্থানীয় প্রথম মুন্সেফ দখল করে থাকেন। এখন আছেন হেমন্ত মুখার্জি।

বাড়িটির পিছনে প্রকাণ্ড এক আমবাগান, তারই একদিকে ডোবা সংস্করণ একটি পুকুর। এ গল্পের আরম্ভ ওইখানে, একদিন বেলা প্রায় দশটার সময়।

যোল সতর বছরের একটি মেয়ে স্নান করছিল। পুকুরের চারিদিকে প্রকৃতির নিজের হাতে গড়া গাছপাতার প্রাচীর। এত ঘন যে আট দশ হাতের ভেতরে এলেও বুঝতে পারা যায় না এখানে পুকুর আছে। আশেপাশে বাড়িঘরও বেশী নেই,—একান্ত নির্জন। মেয়েটির শঙ্কা ছিল না, নিত্যকার মত সমস্ত পুকুরটা সাঁতরে এসে নিশ্চিন্তচিত্তে অঙ্গমার্জনা করছিল। হঠাৎ ওপারে নজর পড়তে দেখল,

বছর বাইশ তেইশের একটি ছেলে, চোখে সোনার চশমা, একটা আম গাছের গুঁড়ি ঘেঁষে দাঁড়িয়ে আছে।

ত্রস্তভাবে নিজেকে আকণ্ঠ নিমজ্জিত করে দিয়ে মেয়েটি সংযত হয়ে নিল। জড়সড় হয়ে তেমনিভাবে গলা পর্যন্ত জলে ডুবে দাঁড়িয়ে রইল। ভাবল, ভদ্রলোকের ছেলে, সরে যাবে।

ছেলেটির কিন্তু নড়বার লক্ষণ দেখা গেল না। তেমনি ভাবেই দাঁড়িয়ে রইল।

রাগে বিরক্তিতে মেয়েটি ঠোঁট কামড়ে ধরল। এক মুহূর্ত দ্বিধা করে জল থেকে উঠে এল। তারপর ধীরপদে ছেলেটির কাছে এগিয়ে গেল।

ছেলেটি নিবিষ্টচিত্তে গাছের উপর কি দেখছিল, যেন পৃথিবীর আর কোন দিকে তার লক্ষ্য নেই!

রাগে গা জলে গেল। তিক্তস্বরে মেয়েটি বললে, দেখুন—

ছেলেটি চমকে তার দিকে তাকাল।

মেয়েটি বললে, এত দূর থেকে দেখতে আপনার বোধ হয় অসুবিধা হচ্ছে, ঘাটের পাড়েই চলুন না? আমার স্নানের এখনো বাকী আছে।

আমায় বলছেন?

দ্বিতীয় ব্যক্তি ত কারুকে দেখছি না এখানে। আপনি ভদ্রলোকের ছেলে, আপনার যদি এরকম প্রবৃত্তি—রাগে দুঃখে মেয়েটির কণ্ঠরুদ্ধ হয়ে গেল।

ছেলেটি অকৃত্রিম বিস্ময়ে তার মুখের দিকে চেয়ে রইল।

মেয়েটি আবার বললে, আর একদিন আপনি উঁকি মারছিলেন, কিছু বলিনি। কিন্তু এ আপনার কোন দেশী ভদ্রতা? আপনার বাধে না, কিন্তু আমরা যে লজ্জায় মরে যাই। মানুষকে এত নীচ ভাবতেও যে কষ্ট হয়!

বিবর্ণ মুখে ছেলেটি বললে, এ সব আপনি কি বলছেন? আমি—

ন্যাকামি! ছেলেটির মুখ দেখে মন একটু নরম হয়েছিল, এই ন্যাকামিতে আবার কঠিন হয়ে গেল। কটু কণ্ঠে বললে, অন্যায় বলেছি। দুচোখ বড় বড় করে দেখুন, আপনাকে আমি লজ্জা করব না। স্নানের সময় গরু মহিষও ত মাঝে মাঝে জল খেতে আসে!

ঘুরে দাঁড়িয়ে পা বাড়াল। পেছনে ব্যাকুল কণ্ঠ শোনা গেল, দাঁড়ান।

মেয়েটি ফিরে দাঁড়াল।

আমায় বিশ্বাস করুন, আপনি স্নান করছিলেন আমি তা দেখিনি। আর

একদিনের কথা বললেন, কিন্তু আমি কাল মোটে কলকাতা থেকে এখানে এসেছি। আশেপাশে যদি দুএকটা পাখী মেলে এই আশায় সকালে বন্দুকটা নিয়ে বেরিয়েছিলাম। একটা ঘুঘু এই দিকে উড়ে এসেছিল, কোথায় বসল তাই দেখছিলাম, আপনাকে নয়।

হাতের বন্দুকটা দেখিয়ে বললে, এটা দেখে আপনার বিশ্বাস হওয়া উচিত।

পিছন ফিরে ঘাটের দিকে চলতে চলতে মেয়েটি বললে, ন্যাকামি করবেন না, আমি কচি খুকী নই।

ছেলেটির মুখ কালো হয়ে গেল। সকাল বেলার উজ্জ্বল আলো পর্যন্ত যেন এক সুন্দরী তরুণীর দেওয়া কুৎসিত অপবাদের ছাপে মলিন হয়ে উঠল।

ছেলেটি নিঃশ্বাস ফেলে সরে গেল। পলাতক ঘুঘুটা চোখের সামনে দিয়ে উড়ে গিয়ে কাছেই একটা ডালে বসল, বন্দুক তুলতে ইচ্ছা হল না। আঁকাবাঁকা সরু পথটি ধ'রে বাগান পার হয়ে খিড়কির দরজা দিয়ে সাদা বাড়িটায় ঢুকল। বন্দুকটা বড় ঘরের কোণে ঠেস দিয়ে রেখে বিরস মুখে খাটের একধারে বসে পড়ল।

মা বললেন, কি শিকার করলি রে অশোক ?

অপবাদ।

অপবাদ ?

হুঁ, বলে খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে বললে, গাঁয়ের মেয়েগুলি ভারী ঝগড়াটে হয়, না মা ?

কারু সঙ্গে ঝগড়া করে এলি নাকি ?

অশোক বললে, আমায় করতে হয়নি, একাই করেছে। বাবু স্নান করছিলেন, ঘুঘু খুঁজতে যেই পুকুর পাড়ে গেছি, জল থেকে উঠে এসে যা মুখে এল শুনিয়ে দিল। ওত পেতে ছিল বোধ হয়! বাপ্, থাক তোমরা এখানে, কাল আমি কলকাতা চম্পট দিচ্ছি।

মা বললেন, কোন পুকুর ? বাগানের ভেতরেরটা ?

অশোক ঘাড় নেড়ে সায় দিল।

তবে বোধ হয় হৃদয় মোক্তারের ভাগ্নী। খুব সুন্দর দেখলি ?

দেখলাম ? না দেখতেই যা শোনাল, দেখলে বোধ হয় খেয়েই ফেলত।

অশোকের ক্রুদ্ধ মুখের দিকে চেয়ে মা হেসে বললেন, না রে, ও খুব ভাল মেয়ে। দোষের ভেতর একটু তেজী আর ঠোঁটকাটা।

অশোক বললে, হুঁ!

মা বললেন, মেয়েদের একটু তেজ থাকা ভাল রে, কাজ দেয়। অন্যায় ও মোটে সহ্য করতে পারে না।

অশোক বললে, জানি। খুব ন্যায়বান ও! কাল এলাম আমি এই জঙ্গলে, আর বলে কিনা আরেকদিন উঁকি মারছিলেন!

চিনতে পারেনি। নেকী ত প্রায়ই আসে আমার কাছে, চিনলেই দেখিস ক্ষমা চেয়ে নেবে।

নেকী? ওর নাম নেকী নাকি?

হ্যাঁ, ছেলেবেলা নাকে কাঁদত বলে ওর পিসী ওই নাম রেখেছিল। মা হেসে ফেললেন।

অশোক বললে, নাকে কাঁদত? যে রকম বলছিল মা, আমি আর একটু হলে কেঁদে ফেলতাম।

আজও যে সন্ধ্যার পর কালবৈশাখী দেখা দেবেন দুপুর বেলার প্রচণ্ড গুমোট সে সত্যটা নিঃসংশয়েই জানিয়ে দিচ্ছিল। কাল বৃষ্টি হয়ে গেছে, আজ ভেপ্সা গরমে যেন সিদ্ধ ক'রে দিচ্ছে। শুকনো খটখটে গরম বরং সহ্য হয়, এই ভিজে গরম এমন উৎকট লাগে!

বিছানায় শীতলপাটি বিছিয়েও অত্যধিক উত্তপ্ত হয়ে অশোক ঘামছিল। মা বাড়ি নেই, কাছেই এক মুন্সেফের বাড়ি বেড়াতে গেছেন। রোদ বৃষ্টিতে আর যা কিছু আটকাক্ মেয়েদের বেড়ানটা আটকায় না। ছোট ভাই পুলকের সকালে স্কুল, আমবাগানে তার খোঁজ মিলতে পারে।

হাতের বইটা টেবিল লক্ষ্য ক'রে ছুঁড়ে দিয়ে অশোক উঠে বসল। ভিজে তোয়ালে দিয়ে সর্বাঙ্গের ঘাম মুছে অর্ধোন্মুক্ত বাতায়ন পথে বাইরের গুমোট-স্তব্ধ পৃথিবীর ওপর সূর্যালোকের নিষ্ঠুর অত্যাচারের দিকে চেয়ে রইল।

দুপুর বেলা,—কিন্তু চারিদিকে গভীর রজনীর স্তব্ধতা ব্যাপ্ত হয়ে আছে। প্রকৃতির অস্বাভাবিক গাম্ভীর্য যেন স্পর্শ করা যায়, অনুভূতির সীমার মাঝে যেন আপনি হাত বাড়িয়ে ধরা দিতে চায়। রাত দুপুরের যা নিজস্ব, আজ দিনদুপুরে চমৎকার মানিয়ে গেছে।

হঠাৎ চাপা দীর্ঘশ্বাসের মত সামান্য একটু বাতাস ব'য়ে যেতেই ভেজানো

দরজাটা মৃদু শব্দ করে খুলে গেল। মুখ ফিরিয়ে চাইতেই অশোক অবাক হয়ে দেখল খান দুই বই হাতে করে নেকী উঠান দিয়ে আসছে। ভিজে চুল পিঠের ওপর ছড়িয়ে রয়েছে, রোদের হাত থেকে বাঁচবার জন্য শাড়ীর আঁচলটুকু মাথায় তুলে দিয়েছে।

বড়ঘরে উঁকি মেরে অশোকের মাকে না দেখে মাসীমা বলে ডাক দিয়ে নেকী অশোকের ঘরের সামনে এসে দাঁড়াল। বিছানার উপরের লোকটির দিকে নজর পড়তেই সে রীতিমত চমকে উঠল।

আপনি! ও হ্যাঁ। ঠিক্।

অশোক গম্ভীর ভাবে বললে, মা বাড়ি নেই।

বাড়ি নেই? বই দুখানা ফেরত দিতে এসেছিলাম।

জানালা দিয়ে বাইরের দিকে দৃষ্টি রেখে অশোক বললে, ওঘরের টেবিলের ওপর রেখে যান।

নেকীর যাবার লক্ষণ দেখা গেল না। সেইখানে দাঁড়িয়ে সপ্রতিভভাবে প্রশ্ন করলে, আপনি অশোকবাবু,—না?

হুঁ।

তা হলে কালকের ঘুঘুর কথাটা বিশ্বাস করতে হল।

নেকীর মুখের দিকে চেয়ে অশোক বললে, আমার সৌভাগ্য। বিশ্বাসটা হল কিসে? আমি অশোকবাবু বলে?

মৃদু হেসে নেকী বললে, হ্যাঁ। মাসীমার কাছে আপনার কথা এত শুনেছি যে, বিশ্বাস না করে উপায় নেই। আপনার আসবার কথা জানতাম, রাগের মাথায় খেয়াল ছিল না। এখানকার কোন ফাজিল ছোঁড়া মনে করেছিলাম আপনাকে।

বেশ করেছিলেন।

আপনি ভীষণ চটেছেন দেখছি।

অশোক কথা বললে না।

নেকী বললে, চটার কথাই। মিথ্যে অপবাদ কে আর সইতে পারে? আচ্ছা আমি হাত জোড় করে ক্ষমা চাচ্ছি, তাতে হবে ত?

হবে। কেউ বাড়ি নেই, বিকেলে এলে ভাল করতেন।

অর্থাৎ, আপনি এখন যান, এই ত?

অশোক নির্বিকার উদাসীনের কণ্ঠে বললে, সেই রকম মানেই ত দাঁড়ায়।

নেকীর মুখ ম্লান হয়ে গেল, কথা খুঁজে না পেয়ে বললে, তাড়িয়ে দিচ্ছেন ?

না, না, তাড়াব কেন ? অতখানি অভদ্রতা করতে পারি আপনার সঙ্গে ? আমার বলবার উদ্দেশ্য—অশোক থেমে গেল।

উদ্দেশ্য ?

উদ্দেশ্য মরুক। আসল কথা কি জানেন, আপনাকে আমি ভয় করি। হয়ত বলে বসবেন, একলা পেয়ে আপনাকে আমি অপমান করেছি।

বাকীও ত রাখলেন না কিছু।

এ অপমান নয়, অন্য রকম।

অভদ্র উক্তি, কুৎসিত ইঙ্গিত! চারিদিকের নির্জনতা অন্য রকম অপমানের অর্থটাকে এমনি স্ফুটতর করে তুলল যে, অপমানে নেকীর মুখ লাল হয়ে উঠল। বই দুটি মেঝের ওপর ছুঁড়ে দিয়ে বললে, আপনি চাষা। নিজের মনে ময়লা থাকলে সমস্ত পৃথিবীটাকে কালো দেখায়। স্নানের ঘাটেই পরিচয় পেয়েছি। বলে ঝড়ের মত চলে গেল।

মিথ্যা অপবাদের জ্বালা আছে, তাতে রাগ হওয়াটাও আশ্চর্য নয়। কিন্তু এইবার অশোক স্পষ্ট উপলব্ধি করল, সে ভুল করেছে। শ্রদ্ধা যার প্রাপ্য তাকে দিয়েছে অপমান। সে না হয় নজর দিতে যায়নি, কিন্তু অমন কি কেউ যায় না ? বাঙালীর মেয়ে, লজ্জায় মাটির সঙ্গে মিশিয়ে গিয়ে কোন রকমে ক্ষুধিত দৃষ্টির সম্মুখ থেকে নিজের দেহটা সরিয়ে নিয়ে যায়। অমন মুখোমুখি অন্যায়ের বিরুদ্ধে দাঁড়াতে পারে কটি মেয়ে? ঘৃণায় নাসিকা কুঞ্চিত করে কটি মেয়ে একান্ত নির্জনে একজন অপরিচিত যুবকের মুখের ওপর বলতে পারে, আপনি গরু, মহিষ, আপনাকে আমি লজ্জা করব না? আজ তুচ্ছ আত্মাভিমানের বশে সেই মেয়েটিকেই সে অপমান করেছে। তাও সে যখন ক্ষমা চেয়েছে তখন।

বিকালে দুভাইকে খাবার দিয়ে মা বললেন, তোর নেকীদি দুদিন এল না কেন রে পুলক ?

পুলক আমে কামড় দিয়েছিল, আমটা সরিয়ে সংক্ষেপে জবাব দিল, দাদা বকেছে। বলে আবার আমটা মুখে তুলল।

দাদা বকেছে! সত্যি নাকি রে অশোক ?

হুঁ।

আবার ঝগড়া হয়েছে তোদের ? কি হয়েছিল ?

অশোক বললে, পরশু তুমি বাড়ি ছিলে না, দুপুর বেলা বই হাতে করে এসে হাজির। যেমনি বলেছি মা বাড়ি নেই, বিকেলে আসবেন, যা মুখে এল বলে চলে গেল।

সবটুকু দোষ অশোক নির্বিকারে নেকীর ঘাড়েই চাপিয়ে দিল। এমনি মানুষ নিজের অন্যায় করার জ্বালার সান্ত্বনা খোঁজে! বেদনা দেওয়া সহজ, আঘাত করা ততোধিক! কিন্তু অমন একটা সহজ কাজ করেও সুখ মেলে না। সুন্দরী এবং তরুণী, তার হাসিভরা মুখখানি যে কথার আঘাতে ম্লান করে দিয়েছিল, এই স্মৃতিটা কাঁটার মত ক্রমাগত বিঁধে চলে!

মা বললেন, কি ছেলেমানুষি যে তোরা করছিস অশোক। নেকী ত গায়ে পড়ে ঝগড়া করার মেয়ে নয়!

না। খুব ভাল মেয়ে!

রোদ পড়ে এলে পুলককে নিয়ে অশোক বেড়াতে বার হল। আমবাগানের পরেই বিস্তৃত মাঠ, আলে আলে পায়ে পায়ে গড়ে ওঠা সরু পথটি দিয়ে চলতে তার এমনি ভাল লাগে! মাঝে মাঝে লাঙল দেওয়া ক্ষেতে নেমে পড়ে, মাটির ঢেলা-গুলি পায়ের নীচে গুঁড়িয়ে যায়। ক্ষেতগুলি সমস্তদিন বৈশাখের বেহিসাবী সূর্যের তাপ চুরি করে সঞ্চিত করে রাখে, সূর্য বিদায় নিলে মৃদুভাবে সেই তাপ বিকীর্ণ করে। অশোক সর্বাঙ্গ দিয়ে সেটুকু অনুভব করে। চষা মাটির অস্পষ্ট সুবাস তার মনকে উদাস করে দেয়। পুলকের হাত ধরে চলতে চলতে অশোক ভাবে, এমনি ভাবেই মাটি যেন নিজেকে চিনিয়ে দিতে চায়। নিশ্চল জড় যেন বলতে চায়, সারা জগতের জীবনের রস যোগাই আমি, আমায় চিনে রাখো!

মাঠের পরে বাড়ি থেকে মাইল খানেক তফাতে ছোট একটা নদী, এখন স্রোত নেই। স্থানে স্থানে জল জমে আছে, বাকীটুকু বালিতে বোঝাই। সাদা ধবধবে বালি। এককালে স্রোতের নীচে ছিল, জলের গতি নিপুণ শিল্পীর মত অপূর্ব নক্সা এঁকে দিয়েছে। কোথায়ও বালির বুকে ঢেউয়ের ছবির হুবহু ছাপ পড়েছে, কোথায়ও বিচিত্র রেখার সমাবেশে সূক্ষ্ম আলপনা গড়ে উঠেছে। এমনি সূক্ষ্ম এমনি কোমল যে, দেখলে মনে হয় আঁকলো কে? অশোক নিত্য এইখানে এসে বসে। পায়ের দাগে বালির কারুকার্য নষ্ট হয়ে যায়, অশোক ব্যথিত হয়ে ওঠে। অথচ ওই কারুকার্য শতকরা নিরানব্বই জনের চোখেই হয়ত পড়ে না! তুচ্ছ বলে নয়, সূক্ষ্ম সৌন্দর্য আবিষ্কার করবার মানুষের একটা বিপুল অক্ষমতা আছে বলে।

অশোক আজ সেইখানেই যাচ্ছিল। আমবাগানের ভেতরে একটা মোটা গাছের গুঁড়ি পাক দিতেই অশোক আর নেকী একেবারে মুখোমুখি পড়ে গেল। কাপড় গামছা নিয়ে নেকী স্নান করতে যাচ্ছিল, চোখাচোখি হতেই তার মুখের ভাব কঠিন হয়ে উঠল। নিঃশব্দে একপাশে সরে গিয়ে সে অশোককে পথ দিল।

অশোক এগিয়ে গেল, কিন্তু পুলক নেকীর সামনে দাঁড়িয়ে বললে, আর যে আমাদের বাড়ি যাও না নেকীদি? দাদা আর কিছু বলবে না, মা বকে দিয়েছে।

অশোক এগিয়ে গিয়েছিল, দাঁড়িয়ে ডাকল, পুলক আয়, দেরি হয়ে গেছে।

নেকী পুলককে কাছে টেনে নিয়ে কি বলতেই সে আনন্দে হাততালি দিয়ে উঠল। নেকীর হাত থেকে গামছাটা টেনে নিয়ে বললে, তুমি যাও দাদা, আমি যাব না। নেকীদির সঙ্গে সাঁতার কাটব।

বেড়াতে যাবি না?

পুলক ঘাড় নেড়ে বললে, রোজ ত বেড়াই, আজ সাঁতার দেব। তুমিও এস না দাদা, তিনজনে সুইমিং রেস দেব, নেকীদির সঙ্গে পারবে না তুমি।

অশোক ধমক দিয়ে বললে, এই অবেলায় পচা ডোবায় স্নান করলে অসুখ হবে পুলক। এখন বেড়িয়ে আসি, কাল সকালে বড় পুকুরে সাঁতার কাটব।

পুকুরের ছোট-বড়ত্বের জন্য পুলকের মাথাব্যথা ছিল না, নেকীদির সঙ্গে সাঁতার দিতে পেলেই সে সুখী। নেকীর গা ঘেঁষে দাঁড়িয়ে তার একটা হাত চেপে ধরে দাদার প্রস্তাবে প্রবল আপত্তি জানিয়ে দিল। নেকী তার হাত ধরে পুকুরের দিকে অগ্রসর হল।

অশোক ক্রুদ্ধ হয়ে বললে, এই অবেলায় ওকে যে পচা ডোবায় স্নান করবার জন্য নাচালেন, অসুখ হলে দায়ী হবে কে?

মুখ না ফিরিয়েই নেকী জবাব দিল, আমি। ওর অভ্যাস আছে।

অভ্যাস আছে কি রকম? ও কি গেঁয়ো ভূত যে পচা ডোবায় স্নান করা অভ্যাস থাকবে?

গেঁয়ো ভূত না হোক, শহুরে বাবু নয়। বলে নেকী পুলককে নিয়ে মোটা আমগাছটার ওদিকে অদৃশ্য হয়ে গেল।

শহুরে বাবু! মেয়েটা শেষ পর্যন্ত তাকে শহুরে বাবু ঠাওরাল নাকি! নিতান্ত চটে যতদূর সম্ভব দূরে দূরে পা ফেলে হন হন ক'রে বাগান পার হ'য়ে অশোক মাঠে পড়ল।

মাঠে বেড়ানোর আনন্দটুকু মাঠে মারা গেল। অশোক ভাবলে, কী কুক্ষণেই মেয়েটার সঙ্গে দেখা হয়েছিল !

সন্ধ্যার অন্ধকার একটু অস্বাভাবিক রকম ঘন হয়ে এল। সেদিকে অশোকের নজর পড়ল না। নজর পড়লে নদীর চড়ায় বসে থাকবার মত সাহস তার হত না।

ঈশান কোণের জমাট-বাঁধা কালো ছায়াটি যে রকম দ্রুতবেগে আকাশের অর্ধেকটা ঢেকে ফেললে তাতে আর অল্পক্ষণের ভেতরই যে সমস্ত আকাশ ঢেকে ফেলবে সে বিষয়ে সন্দেহ করবার উপায় রইল না। হলও তাই। আকাশ যখন প্রায় সবটা ঢাকা পড়েছে তখন অশোক হঠাৎ ব্যাপারটা উপলব্ধি করল। তৎক্ষণাৎ উঠে দাঁড়িয়ে বাড়ির দিকে পা বাড়িয়ে দিল। যতবার শঙ্কিত দৃষ্টি তুলে আকাশের ভয়ানক কালো, ভয়ানক গম্ভীর মূর্তির দিকে চাইল ততবারই তার গতিবেগ বেড়ে গেল। নেকী ত নেকী, ঝড় শুরু হবার আগে কোন রকমে বাড়ি পৌছানর চিন্তা ছাড়া অন্য সব কথা তার মন থেকে বেমালুম লুপ্ত হয়ে গেল। এ সময় এক রকম নিত্যকার ব্যাপার হলেও ইতঃপূর্বে পূর্ববঙ্গের কালবৈশাখীর যে পরিচয় পেয়েছিল তাতে এই নির্জন মাঠে সেই কালবৈশাখীর সঙ্গে মুখোমুখি দাঁড়াবার কল্পনা করেই সে ভয় পেয়ে গেল।

জমাট-বাঁধা অন্ধকারকে শিউরে দিয়ে বিদ্যুৎ চমকে উঠ্‌ল। অশোকের দ্রুত চলা দৌড়নতে পরিবর্তিত হয়ে গেল।

অশোক পুরী গিয়েছিল, দূর থেকে সমুদ্রগর্জন কেমন শোনায় জানত। পিছন থেকে সেই রকম একটা অস্পষ্ট গর্জন কানে আসতেই সে বুঝতে পারল কাল-বৈশাখী তাড়া করে আসছে এবং তাকে ধরে ফেলতে মাত্র দুতিন মিনিটের ওয়াস্তা।

হাঁফ ধরে গিয়েছিল। দৌড়ে বিশেষ লাভ নেই বরং উঁচুনীচু মাঠের ভেতর অন্ধকারে আছাড় খাওয়ার আশঙ্কা পুরো মাত্রায়। বাধ্য হয়ে দৌড়ান বন্ধ করে অশোক দ্রুত চলা শুরু করলে। আর একবার বিদ্যুৎ চমকাতে অশোক দেখলে আম বাগান তখনো পাঁচ সাত মিনিটের পথ।

আম বাগান ? ঝড় ত ধরে ফেলবে ঠিক, তখন আম বাগানের ভেতর দিয়ে যাওয়াটা কি বুদ্ধিমানের কাজ হবে ? অশোকের ইচ্ছা হল একবার থমকে দাঁড়িয়ে কথাটা ভাল করে চিন্তা করে নেয়। কিন্তু পিছনের গর্জনটা খুব কাছে এবং বেশী

রকম স্পষ্ট হয়ে উঠেছে দেখে দাঁড়াবার সাহস হল না। আর দ্বিতীয় পথের সন্ধান ত সে রাখে না! অন্য সময় ঘণ্টাখানেক ধরে খুঁজে অন্যদিক দিয়ে ঘুরে যাবার ভাল রাস্তা আবিষ্কার করা হয়ত সম্ভব হত, কিন্তু এখন সারা রাত ধরে খুঁজলেও যে সে পথের খবর মিলবে না তা ঠিক। আম বাগান ছাড়া পথ নেই। কাঁচা-পাকা ঢের ফল গাছগুলি খাইয়েছে, আজ যদি নিতান্তই চাপা দেয় কি আর করা যাবে!

পিছন থেকে মহা কলরব করতে করতে ঝড় এসে অশোককে এমনি জোরে ধাক্কা দিল যে, মুখ থুবড়ে পড়তে পড়তে কোন রকমে সামলে নিল। আর জোরে চলবার চেষ্টা করবার প্রয়োজন হ'ল না, বাতাসেই অশোককে ঠেলে নিয়ে চলল।

ঠিক যেন ভোজবাজি শুরু হয়ে গেল। চিরকাল মাথা উঁচু করেই আছে, কিন্তু গাছগুলি পর্যন্ত সটান শুয়ে পড়বার জন্য আকুলি-ব্যাকুলি শুরু করে দিল। লাখ-খানেক ঢাক ঢোল বাজিয়ে প্রকৃতি যেন বিদকুটে রকমের ওয়ার-ডান্স আরম্ভ করে দিল, সব ভেঙে চুরমার করে ঠাণ্ডা হবে। মেঘের সংযম রইল না, ফোঁটা ছেড়ে ধারাপাত আরম্ভ হয়ে গেল। সেই পতনশীল বারিধারা নিয়ে পাগলা হাওয়া এমনি খেলা শুরু করে দিল যে, দেহের অনাবৃত অংশের স্পর্শেন্দ্রিয় দিয়ে এবং বিদ্যুতের আলোতে দর্শনেন্দ্রিয় দিয়ে ভাল করে অনুভব করে অশোকের ইচ্ছে হতে লাগল সেই মাঠের ভেতরই মুখ গুঁজে শুয়ে পড়ে। ঝড়ের শব্দ ত আছেই, তার ওপরে আকাশে মেঘেদের অজস্র চকমকি ঠুকে আলো জ্বালবার অবিশ্রাম চেষ্টায় ক্রমাগত যে আওয়াজ হতে লাগল তাতে অশোকের শ্রবণেন্দ্রিয় শব্দহারা হয়ে পড়বার উপক্রম করল।

আম বাগানের শেষ প্রান্তে হৃদয় মোক্তারের বাড়ি, অশোকের পথ তার রান্না-ঘরের পাশ দিয়ে। চাঁচের বেড়ার গায় বসানো জানালার পাশে আসতেই সুতীক্ষ্ণ কণ্ঠ শোনা গেল—অশোকবাবু, দাঁড়ান। অশোক থমকে দাঁড়াল।

নেকী অশোকের প্রতীক্ষাতেই রান্নাঘরের জানালায় চোখ রেখে দাঁড়িয়েছিল, ডাক দিয়েই বাইরে বেরিয়ে অশোকের কাছে গিয়ে দাঁড়াল। বললে, গলা চিরে ডেকেছি, যে শব্দ! ভাবলাম বুঝি শুনতেই পাবেন না। ঘরে চলুন।

না। মা ভাববেন।

অশোকের পথ আগলে দাঁড়িয়ে নেকী বললে, বাগানের ভেতর দিয়ে ত যাওয়া যাবে না, এর ভেতরেই তিন চারটা গাছ পড়ে গেছে শব্দ শুনেছি। দাঁড়াবেন না, আসুন।

অশোক তবু দ্বিধা করল, কিন্তু মা যে পাগল হয়ে উঠবেন।

নেকী ব্যাকুল হয়ে বললে, সে অল্পক্ষণের জন্য, কিন্তু যদি গাছ চাপা পড়েন সত্যি সত্যি পাগল হয়ে যাবেন। বলে হাত জোড় করে বললে, অন্য সময় যত পারেন রাগ করবেন, আপনার পায়ে পড়ি চলুন।

আকাশে বিদ্যুৎ চমকে গেল, সেই আলোতে নেকীর মুখের যে ব্যাকুল ভাবটা অশোকের চোখে পড়ল তাতে আর দ্বিধা করবার অবকাশ রইল না। বললে, চলুন।

নেকী অশোককে পথ দেখিয়ে রান্নাঘরের পাশ দিয়ে উঠান পার হয়ে বড় ঘরের দাওয়ায় উঠল। দরজায় বাহির থেকে শিকল লাগানো ছিল, ক্ষিপ্রহস্তে শিকল খুলে ফেললে। ঘরে প্রদীপ জ্বলছিল, দরজা খুলতেই বাতাসে নিবে গেল।

অশোককে হাত ধরে ঘরের ভেতর নিয়ে গিয়ে নেকী বললে, দাঁড়ান, আলো জ্বালছি। ঘরের একদিকের তাক হাতড়ে একটা ল্যাম্প নিয়ে এসে বললে, আপনার কাছে দেশলাই আছে?

না।

সিগারেট খান না?

না।

খুব ভাল ছেলে ত! নাঃ, আপনার সঙ্গে তা হলে পারা গেল না দেখছি! রান্নাঘরেই যেতে হল, থাকুন অন্ধকারে চুপটি করে দাঁড়িয়ে। বলে নেকী বাইরে চলে গেল।

দেশলাই নিয়ে ফিরে এসে চৌকাঠের বাইরে দাঁড়িয়েই বললে, হাত বাড়িয়ে দেশলাই নিয়ে আলোটা জ্বেলে ফেলুন অশোকবাবু। একবার ত দুজনেই খানিকটা করে জল ঢেলেছি, সর্বাঙ্গে যে রকম ধারা বইছে, এবার ঘরে ঢুকলে মেঝেতে নদী বয়ে যাবে।

নিকষ-কালো আঁধার, কিন্তু তারই ভেতর নেকীর হাতের দুগাছি সোনার চুড়ি রান্নাঘরের অদৃশ্যপ্রায় আলোয় চিকচিক করছিল। দেশলাই নিয়ে অশোক একটা কাঠি জ্বালিয়ে বললে, একেবারে ভিজে গেছেন যে!

সেটা উভয়তঃ; পরে দুঃখ করা যাবে, বাতিটা জ্বালুন।

আলো জ্বেলে অশোক বললে, মেঝেটা সত্যিই ভেসেছে।

তাহোক, মুছে নিলেই হবে। আলনা থেকে লালপেড়ে শাড়ীটা দিন্। বাক্স না খুললে আবার আপনার কাপড় জুটবে না।

অশোক শাড়ীটা এনে দিলে। বারান্দার একদিকে একটু ঘেরা ছিল, শাড়ী নিয়ে নেকী সেখানে চলে গেল।

অশোকের জামা কাপড়ের অতিরিক্ত জলটুকু ইতোমধ্যে প্রায় সবটাই ঝরে গিয়েছিল, কিন্তু ভিজে জামার আলিঙ্গনটা বড়ই বিশ্রী লাগছিল। জামাটা খুলে হাতে নিয়ে নেকীর প্রতীক্ষায় ঘরের মাঝখানে দাঁড়িয়ে অশোক একবার চারিদিকে চোখ বুলিয়ে নিল। প্রকাণ্ড ঘর। একপাশে দুটি বড় বড় খাট জোড়া লাগিয়ে পাতা রয়েছে। তাতে যে বিছানা আছে খাটের অর্ধেকটাও আবৃত করবার সাধ্য তার নেই। সেকেলে আসবাব, যেমন বিরাট তেমনি কদাকার। এক কোণে গোটা কুড়ি পঁচিশ হাঁড়ি কলসী, তাতে সংসারের চাল ডাল থাকে বোঝা গেল। পুরনো রঙচটা একটা কাঠের আলনা, সোজা দাঁড়াবার ক্ষমতা নেই, হেলে পড়েছে। ফরসা, মলিন, আস্ত এবং ছেঁড়া নানা রকমের নতুন পুরাতন ধুতি শাড়ী সেমিজ যত্ন করে গোছানো রয়েছে। চাঁচের বেড়ার গায়ে বাঁশের পেরেকে একটা আয়না ঝুলছে, কাছেই একটা চিরুণী গোঁজা। আয়নার নীচে একটা টুল, তার কাছে হাতল ভাঙা কাঠের চেয়ার। একটা আমকাঠের সিন্দুক একটা কোণের সবটুকু দখল করে আছে। মাথা নীচু করে অশোক খাটের নীচে উঁকি মারল। ধুলোয় মলিন বড় বড় পিতলের হাঁড়ি কলসী ডেকচি ইত্যাদি থেকে আরম্ভ করে কুলো ধুচুনি পর্যন্ত সেখানে জমা হয়ে আছে।

সোজা হয়ে দাঁড়াতেই দরজার কাছে নেকী খিলখিল করে হেসে উঠে বললে, ভূত দেখছিলেন নাকি ?

না বাঘ। অন্ততঃ একটা শেয়াল যে খাটের নীচে—

চোখ তুলে অর্ধপথে সে থেমে গেল। মন থেকে রাগের জ্বালা নিঃশেষে মুছে গিয়েছিল, বিদ্বেষশূন্য দৃষ্টি তুলে লণ্ঠনের আলোতে সম্মুখের তরুণী নারীটির মুখের দিকে চেয়ে অশোক মুগ্ধ হয়ে গেল। তাড়াতাড়ি কাপড় ছেড়ে এসেছে, ভিজে চুল ভাল করে মোছা হয় নি। এক গোছা জলসিক্ত কুন্তল গালের পাশ দিয়ে লতিয়ে নেমে এসে বুকের ওপর লুটিয়ে পড়েছে। কপালে বিন্দু বিন্দু জল জমে আছে, আলো পড়ে মনে হচ্ছে কে যেন মেয়েটার কপাল বেড়ে মুক্তোর মালা পরিয়ে দিয়েছে। চোখের পাতা ভেজা, তার অন্তরাল হতে যে দৃষ্টি মেলে চেয়ে আছে তার যেন তুলনা নেই।

নেকী লাল হয়ে চোখ নত করলে। হঠাৎ,—আচ্ছা ত আমি! ভিজে

কাপড়ে দাঁড়িয়ে আছেন খেয়ালই নেই। বলে কাঠের সিন্দুকটার কাছে চলে গেল। ধোপদোরস্ত একখানা ধুতি এনে অশোকের হাতে দিয়ে ভিজে জামাটা নিয়ে বলল, কাপড় ছেড়ে ফেলুন, আমি আসছি। ব'লে বেরিয়ে গেল।

কাপড় ছেড়ে অশোক ডাকল, আসুন এবার।

নেকী এল। দরজা দিয়ে প্রথম থেকেই কিছু কিছু ছাট আসছিল, ঘরে এসে এক মুহূর্ত দ্বিধা করে নেকী দরজায় খিল লাগিয়ে দিলে। ঘুরে দাঁড়িয়ে বললে, আমাকে আপনি আপনি করছেন এমন বিশ্রী লাগছে! এতটুকু সাহস নেই যে তুমি বলেন ?

অশোক বললে, সাহস আছে কিনা পরিচয় পাবে। ওটা কি হল ? বলে রুদ্ধ দরজার দিকে আঙুল বাড়িয়ে দিল।

নেকী বললে, এই সহজ কথাটা বুঝলেন না ? ছাট আসছিল, বন্ধ করে দিলাম। মেঝেটা ভাসিয়ে দিয়ে ত লাভ নেই কিছু।

কিন্তু—

সে সব পরে বিবেচনা করা যাবে অশোকবাবু, আপনি কোঁচার খুঁটটা গায়ে দিয়ে ভাঙা চেয়ারটাতে বসুন। আমার নাম নেকী, কিন্তু ন্যাকামি দুচক্ষে দেখতে পারি না। আপনার সঙ্গে এক ঘরে যদি থাকতে পারি, দরজা খোলা-বন্ধয় বিশেষ আসবে যাবে না। খোলা থাকলে বরং ঘরটা ভিজবে।

অশোক বসে বললে, তুমিও বোস, কতকগুলি প্রশ্ন আছে।

খাটের কোণায় বসে হাসিমুখে নেকী বলল, হুকুম করুন।

তুমি এখানে একা থাক ?

নেকী হেসে উঠল,—তাই কি আপনি সম্ভব মনে করেন নাকি ? হাসি থামিয়ে বলল, থাকি তিনজনে, মামা, পিসীমা, আর স্বয়ং। মামা জমি দেখতে পরশুদিন মফস্বলে গেছেন, পিসী বিকেলে কাদের বাড়ি গিয়েছিল ঝড়ের জন্য আটকা পড়ে গেছে। যে আচমকা ঝড় এল আজ! আপনি ফিরছেন না দেখে আমার যা—ঝড়ের সময় মাঠের মাঝে ভারী ভয় হয় অশোকবাবু!

ব্যস্ত হয়ে উঠে দাঁড়িয়ে অশোক বললে, আমি চললাম।

নেকী বিস্মিত হয়ে বললে, কি হল আবার ?

আমার মত মূর্খ আর নেই। ছি ছি, একবারও খেয়াল হল না।

কি হল বলুন না।

বুঝলে না? কেউ যদি হঠাৎ এসে পড়ে—সে ভারী বিশ্রী হবে, আমি যাই।

নেকী বললে, ভাববেন না, এই ঝড়ে কেউ আসবে না। যাবেনই বা কি করে?

না না, তুমি বুঝছ না। তোমার কত বড় ক্ষতি হবে, জান?

নেকী দৃঢ়কণ্ঠে বললে, জানি, বসুন। সে ভয় করলে আপনাকে ডেকে আনতাম না। পাগল হয়েছেন, ভাল দিনে কেউ আসে না, আর ঝড় বৃষ্টি মাথায় করে গোয়েন্দাগিরি করতে আসবে!

অশোক বসল। বললে, তোমার কিন্তু বেজায় সাহস। লোকে নাই জানুক, আমাকে ত একরকম জানই না, কি বলে ডেকে আনলে?

আপনাকে জানি না কে বললে?

আমি বলছি। এসেছি পাঁচদিন, দেখা হয়েছে তিনবার, তিনবারই ঝগড়া করেছি। চেনবার সুযোগ পেলে কোথায়?

পুকুর পাড়ে বরং—

নেকী খিলখিল করে হেসে উঠল। ওটা ওর স্বভাব। বললে, পুকুরের ঘটনাটা ভোলেন নি দেখছি।

না, ভুলি নি। ঠাট্টা নয়, সত্যি বল কি করে চিনলে আমায়?

নেকী বললে, একজনকে চিনতে হলে তার সঙ্গে দুচার বছর মেশবার দরকার হয় বলে মনে করেন নাকি আপনি? আমার সঙ্গে প্রথম থেকে যে অমনভাবে ঝগড়া করতে পারে, তাকে ভয় করা আমি প্রয়োজন মনে করি না। বুঝলেন?

অশোক ঘাড় নেড়ে বললে, না।

তবে অন্য রকম করে বলি। আমাদের অনুভূতি বলে একটা জিনিস আছে অশোকবাবু, একবার দেখলেই আমরা মানুষকে চিনতে পারি। আর কি জানেন, মাসীমার ছেলেকে চিনবার দরকার হয় না।

নেকীর কথায় তার মার প্রতি এমনি একটা সহজ শ্রদ্ধার ভাব প্রকাশ পেলে যে, অশোক খুশি হয়ে উঠল। একটু চুপ করে থেকে বললে, আচ্ছা নেকী, তোমার ভাল নামটা কি বল ত?

নেকী নামটা পছন্দ হয় না? ও নামটা আমায় একেবারে মানায় না, কি বলেন? আপনি না হয় আমাকে লীলা বলবেন।

লীলা? বেশ নাম।

সত্যি বেশ?

অশোক জবাব দিলে না, একটু হাসল।

হঠাৎ নেকী বললে, আপনার খিদে পেয়েছে ? আম খাবেন ?

অশোক ঘাড় নাড়ল।

আম খাবেন না ? তাহলে কী দিই ! কাল সন্দেশ করেছিলাম, গোটা চারেক আছে বোধ হয়, তাই খান তবে।

অশোক আবার ঘাড় নাড়ল।

ঘাড নাড়ছেন যে খালি ? ইচ্ছেটা কি ?

ইচ্ছে কিছু না খাওয়া। বাড়ি থেকে যতদূর সাধ্য খেয়ে বার হয়েছিলাম, খিদে নেই।

নেকী মুখ গোঁজ করে বললে, হুঁ !

রাগ হল ? আচ্ছা দাও, খাব।

থাক্। খিদে না থাকলে খেতে নেই।

অশোক তৎক্ষণাৎ বললে, খিদে যেন পাচ্ছে বলে মনে হচ্ছে, এতক্ষণ বুঝতে পারি নি। কি দেবে দাও, খেয়ে নি।

নেকী হাসিমুখে খাবার নিয়ে এল। শুধু সন্দেশ নয়, আমও কেটে দিল। ঘরেই ছিল। কোণের কলসী থেকে জল গডিয়ে দিল।

অশোক নিঃশব্দে আহারে মন দিল।

নেকী বললে, খেতে খেতে কথা বলুন, চুপ করে থাকতে ভাল লাগে না।

কি বলব ?

যা খুশি।

যা খুশি নয়, অশোক নেকীর কথাই পাড়ল। একটু একটু করে নেকীর জীবনের যে ইতিহাস সে শুনল তাতে অবাক্ হয়ে গেল।

বড়লোকের মেয়ে, কলকাতায় বাবার ব্যবসা ছিল। মা কবে মারা গিয়েছিলেন, নেকীর মনে নেই। পিসীমাই তাকে মানুষ করেছে। কি সব কারণ ঘটেছিল নেকী জানে না, তার যখন ষোল বছর বয়স, ব্যবসা ফেল পড়ল। বাজারে দেউলিয়া নাম জাহির হবার আগেই বন্দুকের গুলিতে নিজের মাথাটা ফুটো করে দিয়ে নেকীর বাবা সব দায় এড়িয়ে গেলেন। আপনার বলতে এই মামা, চোখ মুছতে মুছতে বছর দুই আগে পিসীমাকে নিয়ে এই মামার আশ্রয়ে এল। পিছনে ফেলে এল আজন্ম-অভ্যস্ত শৌখিন জীবন।

—নতুন জীবনের ভয় বাবার শোককে পর্যন্ত ছাপিয়ে উঠেছিল অশোকবাবু! পাড়াগাঁ চক্ষে দেখিনি, পিসীমার কাছে শুনে দুচোখে খালি অন্ধকার দেখতে লাগলাম। গাঁয়ের মেয়েরা কী ভাবে থাকে, ভোর পাঁচটায় উঠে গোবর দিয়ে কেমন করে ঘর নিকোয়, ডোবায় গিয়ে বাসন মাজে, লাউ কুমড়োর চচ্চড়ি দিয়ে কেমন আরামে দুবেলা পেট ভরায়, পিসীমার কাছে লম্বা ফিরিস্তি শুনে মনে হয়েছিল, কাজ নেই বাবা বেঁচে থেকে, তার চেয়ে আফিম গুলে খাওয়া সহজ!

অশোক বললে, তারপর যখন সত্যি সত্যি এলে তখন কেমন লাগল?

নেকী বললে, এসে দেখলাম, ভয়ের কারণ নেই, ঘর নিকোবার দরকার হল না, বাসনও মাজতে হল না। রান্নার ভারটাও পিসীমা নিলেন। সেদিক দিয়ে বিশেষ কষ্ট হল না, কিন্তু কপাল মন্দ, আমি আসার তিন মাসের ভেতরেই কয়েকটা মকদ্দমায় হেরে মামার অবস্থা ভয়ানক খারাপ হয়ে গেল। মামা অবশ্য বললেন না, অবস্থা বুঝে আমি নিজেই ঝিকে ছাড়িয়ে দিলাম। বুক বেঁধে একদিন যে ভয়ে আফিম খেতে ইচ্ছে হয়েছিল, সেই গোবর লেপা থেকে বাসন মাজা পর্যন্ত সব কাজগুলি করে ফেললাম। কোথায়ও কিন্তু বাধল না।

অশোক বললে, রান্নাটাও বোধ হয় এখন করতে হয়?

হ্যাঁ। পিসীমার বাতের শরীর, পারেন না।

ঝড়ের বেগ কম পড়তেই নেকী বললে, আপনি এখন আসুন অশোকবাবু। একা ফেলে গেছে, পিসীমা হয়ত ঝড় ঠেলেই এসে পড়বে। এ সামান্য ঝড়ে আর গাছ পড়বে না।

অশোক উঠে দাঁড়িয়ে বললে পিসীমার আসার কথাই ভাবছো, আমি যদি সবাইকে বলে দিই সন্ধ্যেটা কোথায় কাটিয়ে গেলাম?

নেকী হেসে বললে, ওইটুকু আপনি করতে পাবেন না, এই দুঘণ্টার কথা সম্পূর্ণ গোপন থাকবে।

মাকে কিন্তু বলতে হবে।

তা তো হবেই, মাসীমাকে বলবেন বৈকি! আমি অন্য লোকের কথা বলছিলাম। চলুন, আপনাকে বরং একটু এগিয়ে দিয়ে আসি।

অশোক হেসে বললে, তারপর তোমাকে কে এগিয়ে দিয়ে যাবে লীলা?

আমার দরকার হবে না, একাই আসতে পারব।

অশোক ঘরের বাইরে পা দিয়ে বললে, বাড়াবাড়ি কোরো না, আমি শিশু নই। দরজা দিয়ে বোস, এটুকু খুব যেতে পারব।

আচ্ছা, আসুন তবে।

অশোক বারান্দার সিঁড়ি দিয়ে নামতে যাবে, নেকী বললে, বাড়ি গিয়েই কাপড় ছেড়ে ফেলবেন কিন্তু। দুবার ভিজতে হল, অসুখ না হয়।

আচ্ছা, ব'লে সিঁড়ি দিয়ে নেমে গিয়ে আবার উঠে এল। বললে, তোমার ভয় করবে না ত?

একটু একটু করবে। আর দাঁড়াবেন না, পিসীমা এলে ভারী মুশকিলে ফেলবে।

অশোক উঠানে নেমে গেল। নেকী চেঁচিয়ে বললে, আর একটা কথা অশোকবাবু, আপনাতে আমাতে সন্ধি ত?

উঠান থেকেই ঘাড় ফিরিয়ে অশোক বললে, সন্ধিপত্রের খসড়া করে রেখো, সই করে দেব। বলে রান্নাঘরের ওদিকে অদৃশ্য হয়ে গেল।

নেকী সেইখানে দরজা ধরে দাঁড়িয়ে রইল। ঝড়ের বেগ কমেছিল, কিন্তু বৃষ্টি সমভাবেই পড়ছিল। ছাঁট লেগে নেকীব বসনপ্রান্ত ভিজে যেতে লাগল, কিন্তু সেদিকে তার খেয়ালই রইল না।

পরদিন সকালে অশোকের জামা আর কাপড হাতে করে যেতেই অশোকের মা নেকীকে জড়িয়ে ধরে চুমো খেলেন। বললেন, বাগানের এক একটা গাছ পড়ার শব্দ শুনছিলাম আর আমার বুকের পাঁজর যেন ভেঙে যাচ্ছিল মা! যে ছেলে, তুই না ডাকলে ওই বাগানের ভেতর দিয়েই আসত!

সুখে তৃপ্তিতে লজ্জায় নেকীর মুখখানি আরক্ত হয়ে উঠল। মাথা নত করল।

মা বললেন, বোস্, খাবার খেয়ে যাবি। ঠাকুরকে ভাঁড়ারটা বার ক'রে দিয়ে আসি। বলে চলে গেলেন।

আপনার জামার পকেটে এই কাগজপত্রগুলি ছিল অশোকবাবু। ভিজে চুপসে গেছে।

অশোক কাগজগুলি নিয়ে বললে, মনিব্যাগটা?

মনিব্যাগ? মনিব্যাগ ত ছিল না!

ছিল না কিরকম? কাগজ রইল, ব্যাগ উড়ে গেল?

নেকী হেসে ফেললে, যতই করুন অশোকবাবু, আর ঝগড়া বাধবে না, সন্ধি হয়ে গেছে। ঠাট্টা নয়, বেশী টাকা ছিল নাকি?

না গোটা পাঁচেক। দৌড়বার সময় মাঠে পড়েছিল বুঝেছিলাম, তুলে নেবার সুযোগ হয়নি। ভালই হয়েছে, সাপের কাজ দেবে।

তা দেবে, টাকার মত সাপ আর নেই।

মাসখানেক কেটে গেছে।

সকাল বেলা মা চা করছিলেন, ঝরা ফুলের মত পরিম্লান মূর্তি নিয়ে নেকী এসে তাঁর গা ঘেঁষে বসে পড়ল।

মা বললেন, জ্বর ছেড়েছে? উঠে এলি যে?

জ্বর নেই। আমায় এক কাপ চা দিও মাসীমা।

এখনো খাসনি কিছু?

নেকী ঘাড় নাড়ল।

তবে আগে একটু দুধ খেয়ে নে, তারপর চা খাস। দুদিনের জ্বরে কী চেহারাই হয়েছে মেয়ের!

স্টোভের ওপর কড়ায় দুধ জ্বাল হচ্ছিল, বাটিতে ঢেলে নেকীর সামনে ধরলেন।

অশোক বললে, তিন চারবার করে পচা ডোবায় স্নান করলে জ্বর হবে না?

নেকী বললে, প্রথম দিন থেকেই ওপুকুরে স্নান করাটা আপনার চক্ষুশূল হয়েছে দেখছি!

কি মুশকিল! এ মেয়েটা প্রথম দিনের সেই ঘটনাটুকু নিজেও ভুলবে না, অশোককেও ভুলতে দেবে না।

মা কি কাজে উঠে যেতেই বাটির দুধ প্রায় সবটা কড়ায় ঢেলে দিয়ে চোখ-কান বুজে বাকীটুকু নেকী উদরস্থ করে ফেললে। চায়ের কাপ তুলে নিয়ে বললে, দুধ ত না, বিষ!

তাই দেখছি। মাকে বলতে হবে।

না লক্ষ্মী, বলবেন না। এক্ষুণি একবাটি দুধ গিলিয়ে দেবেন।

ভালই ত!

ভাল বইকি! চায়ের কাপটা শেষ করে তাড়াতাড়ি উঠে দাঁড়িয়ে, মার আসবার আগেই পালাই তাহলে।

অশোক বললে, না বোস, বলব না।

রাঁধতে হবে, পিসীমার অসুখ।

এই শরীরে রাঁধবে ?

না রাঁধলে চলবে কেন ? মামা দুদিন হাত পুড়িয়ে রেঁধে খেয়েছেন। ঐ যা, আসল কথাই ভুলে গেছি। বিকালে আপনার আম খাবার নেমন্তন্ন রইল, পুলককে নিয়ে যাবেন। বলে নেকী চলে গেল।

বিকালে প্রায় ছটার সময় পুলককে নিয়ে অশোক আম খাবার নিমন্ত্রণ রক্ষা করতে গেল। হৃদয় চক্রবর্তী একগাল হেসে অভ্যর্থনা করলেন। কি সৌভাগ্য—কথাটাই উচ্চারণ করলেন বার কুড়ি।

চক্রবর্তীর বয়স নির্ণয় করা দুঃসাধ্য। মাথার চুলে পাক ধরেছে। চুল বলা সঙ্গত নয়, কদমফুলের পাপড়ি। মুখে দাড়ি-গোঁফের জঙ্গল। হাসবার উপক্রম করলেই সেই জঙ্গল ফাঁক হয়ে তামাকের ধোঁয়ায় বিবর্ণ কতকগুলি দাঁত আত্ম-প্রকাশ করে। এমনি অতিরিক্ত বিনয় প্রকাশ করতে লাগলেন যে, সেগুলি প্রকাশ হয়েই রইল।

বড় ঘরের বারান্দায় সেই ভাঙা চেয়ার আর টুলখানা পাতা হয়েছিল, অশোক আর পুলককে বসিয়ে চক্রবর্তী নিজে একটা পিঁড়ি দখল করে উবু হয়ে বসে ডাকলেন, নেকী !

নেকী ভেতর থেকে সাড়া দিল, আম কেটে নিয়ে যাচ্ছি মামা।

দুথালা বোঝাই আম দুজনের সামনে ধরে দিতেই অশোক বললে, এ কি ব্যাপার! এত আম খাব কি করে ?

চক্রবর্তী মাথা নেড়ে বললেন, কিছু না কিছু না। যুবাকাল, লোহা পেটে পড়লে হজম হয়ে যাবে। খান, লজ্জা করবেন না। আপনার মাঠাকরুন নেকীকে স্নেহ করেন তাই, নইলে আমাদের মত লোকের বাড়ি আপনাকে খেতে বলা—সাহসই হত না !

নেকী মুচকে হেসে ভেতরে চলে গেল।

কি যে বলেন! বলে অশোক একটা আম মুখে তুলে নিলে। বললে, খা পুলক, উনি যখন ছাড়বেন না, যা পারি খাই, বাকী নষ্ট হবে।

চক্রবর্তী মোক্তার মানুষ বকতে পারেন, আসর সরগরম করে রাখলেন। অশোক কখনো হুঁ দিয়ে কাজ সারতে লাগল, কখনো বললে নিশ্চয়! কখনো মৃদু হেসে বললে তা বইকি! বিষয় থেকে বিষয়ান্তরে ভ্রমণ করে চক্রবর্তী কলিকালের লোকের ধর্মজ্ঞানহীনতা এবং উৎকট লোভ-পরায়ণতার কথা কীর্তন করলেন।

বললেন, আদালতে এত মামলা মকদ্দমা কি জন্তে মশায়? ওই লোভ! মিথ্যে সাক্ষী তৈরী করে কার দুবিঘে জমি আছে তাই আত্মসাৎ করবার চেষ্টা! কেন রে বাপু? পরের জিনিস নিয়ে টানাটানি কেন? নিজের যা আছে নেড়ে চেড়ে খা না!

অশোক ঘাড় নেড়ে সায় দিলে, তা বইকি!

এইবার চক্রবর্তীর এই চিন্তার উৎসমুখের সন্ধান পাওয়া গেল। একটা পাজীলোক তাঁর পাঁচ বিঘে জমি যে কিরকম ভাবে আত্মসাৎ করবার উপক্রম করেছে এবং অশোকের বাবার কাছেই মিথ্যে দাবীর মকদ্দমা রুজু করেছে, সবিস্তার বর্ণনা করে চক্রবর্তী ফোঁস করে একটা নিঃশ্বাস ফেললেন। শুনে অশোক আন্তরিক দুঃখ প্রকাশ করলে।

থালা অর্ধেক খালি করে ঠেলে দিতেই চক্রবর্তী হাত জোড় করলেন। অশোক ব্যস্ত হয়ে বললে, ও কি? ও কি? সত্যি বলছি আর খাবার ক্ষমতা নেই, নইলে ফেলে রাখতাম না।

লোকটার প্রতি অশ্রদ্ধায় অশোকের অন্তর পূর্ণ হয়ে গেল। বাপের বয়সী ভদ্রলোক, বিনয়ের ছলে নিজেকে ক্রমাগত হীন করে ফেলছেন দেখে অত্যন্ত বেদনা অনুভব করলে।

জোড় হাতেই চক্রবর্তী নিবেদন করলেন, তবে দুটি সন্দেশ মুখে দিন। বলে হঠাৎ ক্রুদ্ধ হয়ে হাঁকলেন, নেকী! নেকী!

নেকী নিঃশব্দে চৌকাঠের কাছে এসে দাঁড়াল।

দুটো আম ফেলে দিলেই হবে? এ কি হেঁজিপেজি লোক পেয়েছিস্! বাপের ত টাকা ছিল, এটুকু শিক্ষাও হয়নি? সন্দেশগুলো কি তোর জন্তে এনেছি নাকি?

চারটে প্রশ্ন! নেকী নতমুখে শুধু সন্দেশের সংবাদটাই দিল, সন্দেশ নেই!

নেই? কি হ'ল? পাখা গজিয়েছে?

আছে, দেওয়া যাবে না। হাঁড়ি ভেঙে সন্দেশ মাটিতে পড়ে গিয়েছিল।

হাঁড়ি ভাঙল কেন?

তাকের ওপর ছিল, বেরালে ফেলে দিয়েছে।

হুঁ! ব'লে চক্রবর্তী স্তব্ধ হয়ে গেলেন।

অশোক হেসে বললে, বেরাল ভাল কাজ করেছে, এর ওপর সন্দেশ খেলে ডাক্তার ডাকতে হত।

চক্রবর্তী সখেদে বললেন, ষোল সত্তর বছর বয়স হল, কোন দিকে যদি নজর থাকে! আপনার জন্য কত যত্ন করে আনা! হায়! হায়! আগেই জানি অদৃষ্ট আমার নিতান্তই মন্দ!

অশোকের ভাগ্যে সন্দেশ জুটল না সেজন্য চক্রবর্তীর অদৃষ্ট মন্দ হতে যাবে কেন, ভেবে অশোকের হাসি পেল। লোকটির কি অপূর্ব বিনয়!

চক্রবর্তী বলে চললেন, অদৃষ্ট মন্দ না হলে এমনটা হয়! সাতপুরুষের জমি আমার, তাতে আর একজন ভোগা দেবার চেষ্টা করে! আপনার বাবার কাছে যতক্ষণ মকদ্দমা আছে ভাবনা নেই, উনি বিচক্ষণ হাকিম, চট করে সাজানো মামলা ধরে ফেলবেন। কিন্তু তা কি থাকবে! দেবে হয়ত এক দরখাস্ত ঝেড়ে, কোন্ কাঠখোট্টা হাকিমের হাতে গিয়ে পড়বে ঈশ্বরই জানেন!

সন্ধ্যার অন্ধকার ঘনিয়ে আসছিল, অশোক উঠে দাঁড়িয়ে বললে, আজ আসি চক্রবর্তী মশাই।

চক্রবর্তীও উঠে দাঁড়ালেন, আসবেন? যা ত মা নেকী একটা আলো নিয়ে সঙ্গে।

না না, আলো লাগবে না, এখনো তেমন অন্ধকার হয় নি। এটুকু বেশ যেতে পারব।

চক্রবর্তী জিব কেটে বললেন, আ রে বাস রে! তা কি হয়? গ্রীষ্মকাল, জঙ্গলের ভেতর দিয়ে পথ। একটা লণ্ঠন নিয়ে এগিয়ে দিয়ে আসুক।

অশোকের ইচ্ছা হল বলে, আপনিই আলো নিয়ে চলুন না মশাই? রোগা মেয়েটাকে না হয় নাই পাঠালেন!

এরকম ইচ্ছা দমন করতে হয়। অশোকও করল। নেকী একটা আলো জেলে নিয়ে তার সঙ্গে চলল।

বাগানের মাঝখানে হঠাৎ থমকে দাঁড়িয়ে নেকী বললে, অশোকবাবু, আমার একটা অনুরোধ রাখবেন?

অশোক হেসে বললে, মস্ত ভূমিকা, অনুরোধ ছোট হলে চলবে না।

না, ছোট নয়।

নেকী একটা ঢোঁক গিললে। আলোটা এমনভাবে ধরলে যে মুখ তার অন্ধকারেই রইল। একটু চুপ করে থেকে বললে, মামা যে জমির কথা বলছিলেন সেটা সত্যি সত্যি আমাদের। আপনার বাবাকে একটু বলবেন?

সম্মুখে সাপ দেখলে মানুষ যেমন চমকে ওঠে অশোক তেমনি চমকে উঠল।

অন্য অবস্থায় এ অনুরোধটা অশোকের কাছে এত কদর্য ঠেকত না। সরল-ভাবে নেকী যদি এই অনুরোধ জানাত অশোক মৃদু হেসে তাকে বিচারকের কর্তব্যের কথাটা বুঝিয়ে দিত। নেকীর অজ্ঞতায় কৌতুক অনুভব করত। কিন্তু এ যে ষড়যন্ত্র! তাকে ভুলিয়ে, আদর দিয়ে, যত্ন দিয়ে, নেমন্তন্ন করে খাইয়ে, শত-রকম ভাবে ঘনিষ্ঠতার বন্ধনে বাঁধবার চেষ্টা করে এমনিভাবে এই নির্জন আমবাগানে এ অনুরোধ করার আর কোন অর্থই ত হয় না! টাকা নয়, কিন্তু আদর যত্নও ত ঘুষের রূপ নিতে পারে! হয়ত এই মেয়েটার রূপ—চক্রবর্তীর নিজের মুখে না জানিয়ে সন্ধ্যার অন্ধকারে নির্জনে সুন্দরী তরুণীকে দিয়ে এ অনুরোধ করার আর কি মানে হয়? ঘৃণায় অশোকের অন্তর সঙ্কুচিত হয়ে গেল। গম্ভীর কণ্ঠে বললে, তোমার এ অনুরোধের অর্থ জান?

নেকীর গলা কেঁপে গেল, আমরা বড় গরীব অশোকবাবু।

অন্য সময় এই কণ্ঠস্বর শুনলে অশোকের হয়ত করুণা হত, এখন হল রাগ। বললে, গরীব ব'লে তোমাদের জন্য আমাকে অন্যায় করতে হবে নাকি?

অন্যায় ত নয়। জমিটা আমাদের। আমার কথা আপনার বিশ্বাস হয় না?

তিক্তস্বরে অশোক বলল, না, হয় না। হলেও জমি তোমাদের কি অন্যের সে মীমাংসা হবে আদালতে, সাক্ষী প্রমাণ দিয়ে। তোমার অনুরোধ যে আমাকে আর আমার বাবাকে কতদূর অপমান করতে পারে সে ধারণা তোমার নেই বলেই নিঃসঙ্কোচে জানাতে পারলে।

নেকী কি বলতে গিয়ে সামলে নিল। একটা নিঃশ্বাস ফেলে বললে—চলুন।

থাক্, তোমার আর কষ্ট করবার দরকার নেই।

নেকীর মুখ দেখা গেল না, দেখলে অশোক ভয় পেয়ে যেত। বললে, অতিরিক্ত সাধুতা ফলাবেন না অশোকবাবু।

অহেতুক দংশন। অন্তরে জ্বালা ধরল, কারণ যাই হোক, এই রকম যুক্তি-হীন কথাই মুখ দিয়ে বার হয়। অশোক কিন্তু তা বুঝলে না, বললে, সাধুতা-অসাধুতার তফাত বোঝবার ক্ষমতা তোমার নেই, তাই এ কথার জবাব দিলাম না। আমার সব চেয়ে বড় দুঃখ নীলা, ভগবানের দেওয়া রূপকে তুমি তুচ্ছ ঘুষের মত ব্যবহার করলে!

অন্তরে ওই কথাটাই বড় যন্ত্রণা দিচ্ছিল, তীক্ষ্ণ কাঁটার মত বিঁধছিল; অসতর্ক

মুহূর্তে অশোকের শিক্ষাদীক্ষা মার্জিত বুদ্ধি সকলের বাধা ঠেলে বাইরে বেরিয়ে এল। এমন বিশ্রী শোনালো যে অশোক নিজেই চমকে উঠল।

নেকীর হাত থেকে আলোটা পড়ে গিয়ে বার কয়েক দপদপ করে জলেই নিবে গেল।

পুলক ভয় পেয়ে গিয়েছিল, অশোকের একটা হাত ধরে বললে, বাড়ি চল দাদা।

বাড়ি? চল্।

অশোক মনকে বোঝাল, নতুন একটা অভিজ্ঞতার সঞ্চয় হল, মন্দ কি! ফুলে যে কীট থাকে সে তত্ত্বটা ত জানাই ছিল! এবার থেকে সাবধান হওয়া যাবে। উঃ, কি রকম জড়িয়ে জড়িয়ে বাঁধছিল! মুক্তি পেলাম, বাঁচা গেল।

মুক্তিও বটে, বাঁচাও বটে! দুটোর একটার চিহ্নও অশোক খুঁজে পেল না। বাঁধন খসেছে মনে করতেই বাঁধনে টান পড়ল। যা নেই বলে জানল, তারই টানে টানে পাকে পাকে হৃদয় ভেঙে পড়তে চায় দেখে অশোক চমকে গেল।

অশোক দেখে অবাক্ হয়ে গেল, নেকীকে সে যেভাবে ভাবতে চায় নেকী সে ভাবে ধরা দেয় না। মনে হয়, তার বিতৃষ্ণা যেন তার চোখের সামনে কুয়াশা রচনা করে দিয়েছে, সেই কুয়াশার ভেতর দিয়ে নেকীকে সে নিষ্প্রভ দেখছে, কিন্তু কুয়াশার ওদিকে নেকী তেমনি উজ্জ্বল হয়েই আছে।

অশোক ধরতে পারে না, কিন্তু তার মনে হয় কোথায় যেন ভুল হয়েছে। খোঁজে। হদিস মেলে না।

রাত্রে খাওয়াদাওয়ার পর বিছানায় শুয়ে অন্ধকারে সে আগাগোড়া একবার ভেবে নিল। হঠাৎ ভুলটা ধরা পড়ে গেল।

চক্রবর্তী! হৃদয় চক্রবর্তী! ঠিক।

অশোক ধড়মড় করে বিছানায় উঠে বসল। মূর্খ, মূর্খ! নিতান্ত মূর্খ সে। সবটুকুই যে হৃদয় চক্রবর্তীর খেলা এটুকু বোঝবার ক্ষমতাও তার নেই! মামা আদেশ করলে তার কথা নেকী কেমন করে অস্বীকার করবে? আজ এক মাস যার সঙ্গে পরিচয়, যার চরিত্রের এতটুকু অংশ তার কাছে গোপন নেই, তাকে কি করে এতখানি হীন বলে সে মনে করল? নেকীর ত বিন্দুমাত্র অপরাধ নেই! অশোকের বুক থেকে মস্ত একটা ভার নেমে গেল। বন্ধনের যে দড়িদড়াগুলি এতক্ষণ বেদনা দিচ্ছিল হঠাৎ সেগুলি হয়ে গেল ফুলের মালা।

খুব ভোরে ঘুম ভাঙতেই অশোক আমবাগানে চলে গেল। পুকুরধারে ঘাটের কাছে একটা তালগাছ কাত হয়ে পড়েছিল, তার গুঁড়ির ওপর বসে সরু বাঁকা পথটির দিকে চেয়ে রইল।

একগোছা বাসন হাতে নিয়ে ঝোপ ঘুরে পুকুরের তীরে এসে অশোকের দিকে নজর পড়তেই নেকী থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল। একরাত্রে তার ওপর দিয়ে ঝড় বয়ে গেছে। চোখ লাল, চোখের কোলে কালি! কাল বিকালে অতি যত্নে কবরী রচনা করেছিল, কার জন্য—বুঝে কাল অশোকের খুশির সীমা থাকেনি। আজ সে কবরী বিশৃঙ্খল হয়ে গেছে।

অশোকের বুক টনটন করে উঠল। কাছে এসে বললে, লীলা, আমায় মাপ কর।

নেকীর সর্বাঙ্গ কেঁপে উঠল। জবাব দিতে পারল না।

অশোক আবার বললে, আমি বুঝতে পারিনি লীলা। তোমার কোন দোষ ছিল না।

ছিল না?

অশোক ভুল করলে, বললে, না। আমি জানি তোমার মামার জন্যেই—

আপনার পায়ে পড়ি অশোকবাবু, যে নীচ, ভগবানের দেওয়া রূপকে যে ঘুষের মত ব্যবহার করে, দয়া করে তাকে নিচেই থাকতে দিন। বলে নেকী অগ্রসর হল, পথ ছাড়ুন।

অশোক পথ ছেড়ে দিল। তার অস্বাভাবিক বিবর্ণ মুখের দিকে চেয়ে দাঁত দিয়ে ঠোঁট কামড়ে ধরে নেকী ঘাটে নেমে গেল।

পরদিন অশোক কলকাতা রওনা হল।

মাস তিনেক পরের কথা।

সকালে মার কাছ থেকে অশোক একখানা চিঠি পেল। মা লিখেছেন, মাসখানেক ধ'রে তিনি জ্বরে ভুগছেন, খুব সম্ভব ম্যালেরিয়া ধরেছে। ডাক্তার চেঞ্জে যেতে বলেছেন, রাঁচি যাওয়া ঠিক হয়েছে। অশোকের বাবার ছুটি নেই, রাঁচি পর্যন্ত যেতে পারবেন না। কলকাতায় পৌঁছে দিয়ে তিনি ফিরে যাবেন, কলকাতা থেকে অশোককে সঙ্গে যেতে হবে। সে যেন প্রস্তুত হয়ে থাকে।

চিঠি পড়ে অশোক মিনিট পনের ভাবল, তারপর স্যুটকেস গোছাতে বসল। সেইদিন রাত্রের সিরাজগঞ্জ মেলে উঠে বসল।

মা বললেন, তোর ত আসবার দরকার ছিল না। আমরাই ত কলকাতা যাচ্ছিলাম। যাক, বেশ করেছিস।

অশোক মুখ নত করলে। কেন যে এল, সে প্রশ্নের বিরামহীন মহড়া ত তার মনেই চলেছে! জবাব দেবে কি?

তোর কি কোন অসুখ হয়েছিল অশোক?

অশোক ঘাড় নেড়েই প্রশ্ন করল, পুলকের স্কুল ত ছুটি হয়নি? ও কি এখানে থাকবে?

কথা ঘুরিয়ে নেবার জন্য ছেলের প্রয়াস দেখে মার চোখে জল এল। বললেন, থাকবে? থাকবার ছেলেই বটে। আর জানিস, নেকী আমাদের সঙ্গে যাবে।

অশোক চমকে উঠল।

মেয়েটা একেবারে শেষ হ'য়ে গেছে রে! তুই থাকতেই ম্যালেরিয়া ধরেছিল, এখন কালাজ্বরে দাঁড়িয়েছে। অত্যাচারের ত সীমা ছিল না। জ্বর গায়ে কবার যে স্নান করত ঠিক নেই। কী চেহারা হয়ে গেছে! মা একটা নিঃশ্বাস ফেলে চলে গেলেন।

মার চেপে যাওয়ার আসল উদ্দেশ্য এবার আর অশোকের কাছে গোপন রইল না।

নেকী অল্প অল্প হাঁটতে পারত, কিন্তু আমবাগান পার হয়ে আসবার তার ক্ষমতা ছিল না। মা পাল্কী নিয়ে গিয়ে নিজে তাকে নিয়ে এলেন। অশোক উঠানে দাঁড়িয়ে ছিল, পাল্কীর খোলা দরজা দিয়ে তার দিকে চেয়ে নেকী ম্লান হাসি হাসল। রাগ নেই, দ্বেষ নেই, অভিমান নেই, সারারাত্রি ঝড়ের আঘাত স'য়ে রজনীগন্ধার দল ভোরবেলা যেমন শ্রান্ত ক্লান্ত হাসি হাসে, সেইরকম হাসি। অশোক মুখ ফিরিয়ে নিল।

নেকীর পিসীর অসুখ, চক্রবর্তীর তাই এই সঙ্গে যাওয়া হল না। পিসী একটু ভাল হলেই যাবেন। যাত্রা করবার সময় ভদ্রলোক হাউমাউ করে কেঁদে ফেললেন, আশোকের মাকে উদ্দেশ করে বিকৃত কণ্ঠে বললেন, আমার আর কেউ নেই মা, ওকে আপনি ফিরিয়ে আনবেন।

চক্রবর্তীর ওপর অশোকের বিতৃষ্ণার সীমা ছিল না, আজ তার মনে হল এর চেয়ে ভাল লোক বোধ হয় পৃথিবীতে নেই!

শহরের প্রান্তবাহী ছোট নদীটি বর্ষার জলে ভরে উঠেছে। স্টীমার ঘাট পর্যন্ত গাড়ি যায় না, নৌকায় যেতে হয়। স্টীমার ঘাট শহর থেকে মাইল পাঁচেক দূরে।

স্টীমারে উঠে নেকী কেবিনে ঢুকতে রাজী হল না। রেলিঙের পাশে ডেক-চেয়ার পেতে তাকে বসিয়ে দেওয়া হল। অশোক আর তার মা কাছেই বসলেন। নেকী একদৃষ্টে মেঘনার জলরাশির দিকে চেয়ে রইল। স্টীমার এক তীর ঘেঁষে চলেছে, ওপারের তটরেখা অস্পষ্ট। দুবছর আগে এই পথ দিয়েই সে একটা অতি-পরিচিত জীবনকে পিছনে ফেলে দুরুদুরু বুকে অজানা অচেনা জীবনের মাঝে গিয়ে পড়েছিল। আজ আবার সেই পথেই কোন নতুন জীবনের সন্ধানে সে চলেছে কে জানে! দেনাপাওনা হয়ত মিটবে না, ওপারের তটরেখার মতই অস্পষ্ট অনুভূতি তাকে যে চিরন্তন জীবনের কথা মনে পড়িয়ে দিচ্ছে সে জীবনে যেতে মন হয়ত তার কেঁদেই উঠবে। কিন্তু যেতে বোধ হয় হবেই।

অশোক শুষ্ক বিষণ্ণ মুখে ডেকের পাটাতনের দিকে চেয়ে রইল। মা-ই কেবল মাঝে মাঝে দুএকটা কথা বলতে লাগলেন। পুলকের এ সমস্ত উচ্চাঙ্গের সুখ-দুঃখের বালাই নেই, রেলিঙে ভর দিয়ে তন্ময় হয়ে সে ঢেউয়ের ওঠা-নামা দেখতে লাগল।

হঠাৎ উঠে দাঁড়িয়ে মা বললেন, তোরা গল্প কর অশোক, আমার ভারী মাথা ধরেছে, কেবিনে একটু ঘুমিয়ে নিই গে।

মা উঠে যেতেই অশোকের মুখের দিকে চেয়ে নেকী হাসল। যেন বলতে চায়, রাগ ত তোমারও নেই আমারও নেই, তবে কথা বলছ না কেন?

চেয়ারটা নেকীর কাছে সরিয়ে এনে তার মুখের ওপর ব্যাকুল দৃষ্টি মেলে অশোক বললে, আমায় মাফ করেছ লীলা?

নেকী তেমনি ভাবে হেসে বললে, মাপ করবার কিছু নেই, সে সব আমি ভুলে গেছি। তুচ্ছ ব্যাপারকে বড় করে দেখবার আর আমার শক্তিও নেই, সময়ও বোধ হয় নেই।

অশোকের চোখে জল এল, বললে, আমিই তোমায় শেষ করে দিলাম লীলা!

নেকী তাড়াতাড়ি বললে, না না, ও কথা বোলো না। হঠাৎ আকাশের দিকে

আঙুল বাড়িয়ে বললে, কতকগুলি সাদা পাখি কেমন সার বেঁধে চলেছে ছাখো! বক ত নয়।

অশোক দেখলে। বললে, না, বুনো হাঁস।

' হাঁস? ও মা! এ আবার কি রকম হাঁস! আচ্ছা ওরা দল বেঁধে কোথায় চলেছে? বেড়াতে বেরিয়েছে বুঝি?

অশোক বুঝলে। একেবারে নেকীর পাশে সরে গেল। নেকীর একখানা হাত নিজের হাতের ভেতর গ্রহণ করে বললে, ওদের ত বাড়ি-ঘর নেই, ওরা বেড়িয়েই বেড়ায়।—তুচ্ছ কথার অন্তরালে অনাড়ম্বর চেষ্টায় এতদিনের বিচ্ছেদের সঙ্কোচ মুছে ফেলাই সব চেয়ে সহজ।

সত্যি? বাড়ি-ঘর না থাকা কিন্তু বেশ! না?

বাতাসে একরাশ রুক্ষ চুল নেকীর মুখের ওপর এসে পড়েছিল। অশোক সযত্নে চুলগুলি সরিয়ে দিলে। আরামে নেকীর চোখ বুজে এল। নিঃশব্দে অশোকের আঙুলের মৃদু স্পর্শটুকু সমস্ত মন দিয়ে উপভোগ করে চোখ মেলে অশোকের মুখের দিকে চেয়ে লজ্জিত সুখের হাসি হেসে বললে, ঘুম পাচ্ছে, ঘুমোই?

ঘুমোও।

নেকীর হাতখানি হাতের মুঠোতেই ধরা রইল। নেকীর মুখের ওপর থেকে দৃষ্টি সরিয়ে নীল আকাশের বুকে সঞ্চরণশীল শ্বেতচন্দনের ফোঁটার মত গতিশীল বুনো হাঁসগুলির দিকে চেয়ে রইল।

শ্রাবণের আকাশ, কিন্তু মেঘ নেই। ওপারের অস্পষ্ট তটরেখা অস্পষ্ট হয়েই রইল।

অশোক মনে মনে বললে, তাই থাক্। যে তীর ঘেঁষে চলেছি সেই তীর স্পষ্টতর হোক, উজ্জ্বলতর হোক, ওপারের তটরেখা আরও অস্পষ্ট হয়ে মিলিয়ে যাক।

চোর

আকস্মিক বর্ষায় ভিজিয়া ওঠা রাত্রি। বৈকালের মেঘশূন্য আকাশে সন্ধ্যার অন্ধকারের সঙ্গে নিবিড় হইয়া মেঘ ঘনাইয়া আসিয়াছিল। মধ্যরাত্রে নিদ্রিত নিঝুম গ্রামটির উপর সে মেঘ সহসা অবিরল ধারে গলিয়া পড়িতে শুরু করিল।

গ্রামের পাশ দিয়া একটা খাল বহিয়া গিয়া রসুলপুরের কাছে বড় নদীতে মিশিয়াছে। খালের পূবপাড়ে গ্রামের যে অংশটুকু আছে তাহাতে ভদ্রলোকের বসতি নাই। গোয়ালাপাড়া, কুমোরপাড়া, আর বাগ্দীপাড়া লইয়া খালের এ তীরের গ্রাম। কয়েকঘর দরিদ্র চাষী তাহার মধ্যে মাথা গুঁজিয়া আছে। খালের খানিক তফাতে প্রকাণ্ড একটা বিল। স্থানটা একটু জঙ্গলাকীর্ণ এবং অত্যন্ত অস্বাস্থ্যকর।

গোয়ালাপাড়ার শেষের দিকে, বিলের ধারের জঙ্গল ঘেঁষিয়া, পুরাতন বিবর্ণ খড়ের ছাওয়া বাড়িটি মধু ঘোষের। তক্তপোশে মলিন দুর্গন্ধ বিছানায় মধু ঘুমাইয়াছিল। কাল সবে তাহার জ্বর ছাড়িয়া গিয়াছে। শরীরে এখনো সে ভাল করিয়া বল পায় নাই। বৃষ্টির শব্দে ঘুম ভাঙিয়া ছেঁড়া কাঁথাটা গায়ে জড়াইয়া সে বিছানায় উঠিয়া বসিল। বেড়ার গায়ে বাঁশের কঞ্চি বসানো ক্ষুদ্র জানালাটি দিয়া উৎসুক দৃষ্টিতে বাহিরের অন্ধকারের দিকে চাহিয়া বলিল, 'ছাখ্ কাদু, কপালখানা ছাখ্ একবার।'

কাদু আগেই উঠিয়া প্রদীপ জ্বালিয়াছিল। বলিল, 'কপালের কি হল?'

মধু বিমর্ষভাবে বলিল, 'এখনো পথ্যি পেলাম না, আজ শালার জল নামল। দুদিন পরে এ জলটা হলে একবার বেরোনো যেত। ভাদ্দরের শেষ, এবছর আর জল হবে কি না ভগবান জানে!'

বর্ষার রাত্রে চুরি করবার অনেক সুবিধা আছে। অমাবস্যার রাত্রির চেয়ে অন্ধকার গাঢ় হয়, ঠাণ্ডায় মানুষ গভীরভাবে ঘুমায়, শত প্রয়োজনেও সহজে কেহ পথে বাহির হয় না। গ্রামের কুকুরগুলি আশ্রয় খুঁজিয়া লইয়া মাথা গুঁজিয়া থাকে, সামান্য পদশব্দেই খাঁ খাঁ করিয়া উঠে না। গৃহস্থের ঘরের ভিটা বৃষ্টির জলে নরম হইয়া থাকে। সিঁধ কাটা সহজ হইয়া পড়ে এবং শব্দ হয় কম।

মধুর সিঁধ কাটিবার বিশেষ দরকার ছিল। গত বৈশাখ মাসে রসুলপুরের মেলায় পুলিসের লাইসেন্স লইয়া বালা-খেলার ব্যবস্থা করিয়া সে কিছু টাকা পাইয়াছিল। তারপর এপর্যন্ত তাহার আর কোন উপার্জন হয় নাই। উপার্জনের চেষ্টাও অবশ্য সে করে নাই। হাতের টাকা একেবারে শেষ না হইয়া গেলে রোজগারের দিকে মধু নজর দিতে পারে না। এমনি ভাবেই সে এতকাল কাটাইয়াছে। এই তাহার স্বভাব। বছরের কয়েকটা মাস তাহার বেশ সুখেই কাটিয়া যায়। বাকী মাসগুলি অভাবের পীড়নে তাহার ও কাদুর কষ্টের সীমা থাকে না। একেবারে অচল হইয়া পড়ার আগে মধু সহসা আবার কিছু টাকা সংগ্রহ করিয়া ফেলে।

বৈধ উপায়ে আজ পর্যন্ত সে একটি পয়সাও উপার্জন করিয়াছে কিনা সন্দেহ। গোপন ও প্রকাশ্য যতপ্রকার উপায়ে তাহার অনিয়মিত আয় হয় তার সবগুলিই নীতিবিগর্হিত। কিন্তু কোন রকম নীতির ধার মধু ধারে না। পয়সার জন্য সে করিতে পারে না জগতে এমন কাজ নাই। সে শিশুর গলার হার ছিনাইয়া লইয়াছে, মেলায় জুয়াড়ী সাজিয়া দরিদ্র চাষীর উপার্জনে ভাগ বসাইয়াছে, পকেট মারিয়াছে, দূর গ্রামে গিয়া পিতৃদায় উদ্ধারের জন্য বাড়ি বাড়ি ভিক্ষা করিয়াছে। কোমরে ল্যাঙট আঁটিয়া সর্বাঙ্গ তৈলাক্ত করিয়া মাঝে মাঝে গৃহস্থের ভিটায় সিঁধও সে দিয়াছে। দেহে শক্তি ও মনে সাহস থাকিলে বোধ হয় ডাকাতি করিতেও সে ছাড়িত না।

দুয়ারের কাছে প্রদীপটা নামাইয়া রাখিয়া ঝাঁপ খুলিতে খুলিতে কাদু তাহার কথার জবাবে বলিল, 'বেরিয়ে ত রাজা হয়ে আসতে। মজুর খাটলে মানুষ তোমার চেয়ে বেশী রোজগার করে।'

মধু আহত ও উগ্র হইয়া বলিল, 'কেন, রোজগারটা কম হচ্ছে কি শুনি? তোকে সেদিন রুপোর চুড়ি কিনে দিইনি?'

কাদু মুখ ফিরাইয়া বলিল 'ও, ভারী রুপোর চুড়ি দিয়েছ! চারবছর ঘর করছি, ক-গাছা রুপোর চুড়ি দিয়ে বাখানের আর সীমে নেই। চুলোয় গুঁজে দেব চুড়ি।'

ঝাঁপ খুলিয়া সে বাহিরে চলিয়া গেল। ঘুঁটের ঝুড়িটা বাহিরের রোয়াক হইতে ঘরের ভিতরে আনিয়া রাখিয়া বলিল, 'সাধ আহ্লাদ চুলোয় গেছে। ঘুঁটে দিয়ে বিঁধিয়ে করে মরলাম। দুগাছা চুড়ি দিয়ে অত তোমার বড়াই কিসের? অন্য কেউ হলে কত দিত!'

মধু অবাক্ হইয়া গেল ! কাহুর মুখে এই ধরনের নালিশ শুনিবার অভ্যাস তাহার ছিল না। নালিশ করিবার স্বভাব কাহুর নয়। চার বছর আগে বৃন্দাবনপুরের যতীন সাহার বাড়িতে সিঁধ দিয়া মধুর একটা মোটা রকম লাভ হইয়াছিল। মাসে দশ টাকা আর খাওয়া-পরা দিলেই কুমোরপাড়ার সৌদামিনী তাহার সঙ্গে বাস করিতে তখন রাজী হইয়া যাইত, কিন্তু দুইশত টাকা পণ দিয়া কাহুকেই বিবাহ করিয়া সে ঘরে আনে। তিন চার বছর জেলে পচিবার বিপদ মাথায় করিয়া উপার্জন করা অতগুলি টাকা দিয়া একদিনের জন্য মধু আপসোস করে নাই। কাহুর রূপ ও গুণের তুলনায় ও-টাকা কিছুই নয়। হাতে টাকা থাকায় কাহুকে ঘরে আনিয়া বছরখানেক তাহার সুখেই কাটিয়া গিয়াছিল। এক বছরের মধ্যে উপার্জনের জন্য মধু একেবারেই মাথা ঘামায় নাই। কাহুময় জগতে কাহুর নেশায় বিভোর হইয়া অলস অকর্মণ্য জীবনযাপন করিয়াছিল। তাহার পর টাকার অভাবে প্রায়ই তাহারা কষ্ট পাইয়াছে। মাঝখানে মধু ত একবার জেলেই যাইতে বসিয়াছিল। সে সময় কাহুকে দু'এক বেলা উপবাস পর্যন্ত করিতে হইয়াছে ; কিন্তু কাহু কখনো অনুযোগ করে নাই। আজ ক-দিন ধরিয়া তাহার কি হইয়াছে কে জানে !

ফুঁ দিয়া আলো নিবানোর সময় কাহুর আলোকোজ্জল মুখখানি মধু একাগ্রদৃষ্টিতে চাহিয়া দেখিল। তাহার মনে হইল, কাহুর মুখে একটা অপরিচিত ছায়া পড়িয়াছে। প্রদীপের শিখার কাছে মুখ আগাইয়া লইয়া গিয়া ফুঁ দেওয়ার আগে কাহু যেভাবে আড়চোখে তাহার দিকে চাহিল সে ভঙ্গীও মধুর কাছে অচেনা ঠেকিল।

কাহু বিছানায় উঠিয়া আসিলে তাহাকে আদর করিবার চেষ্টা করিয়া মধু বলিল, —'একবার বেরোই আজ, কি বলিস্ কাহু ?'

কাহু রূঢ়ভাবে তাহার আদর প্রত্যাখ্যান করিয়া বলিল, 'তোমার খুশি। ঘুম পেয়েছে, জ্বালাতন কোরোনি বাপু, আমাকে ঘুমোতে দাও।'

মধু আহত হইয়া কাঁথাটা গায়ের উপর টানিয়া লইয়া নিঃশব্দে শুইয়া পড়িল। বাহিরে ঝমঝম শব্দে বৃষ্টি হইতেছে। বর্ষার শেষ অভিনয়। চার পাঁচদিন পরেই পূর্ণিমা। কাল হয়ত মেঘমুক্ত আকাশে চাঁদ উঠিবে। জ্যোৎস্না রাত্রিতে চলাফেরার গোপনতা যাইবে ঘুচিয়া। মধুর মন কেমন করিতে লাগিল। আজ রাত্রির মত সুযোগ বহুকাল পাওয়া যাইবে না। কাহুর মুখে আবার কবে সে হাসি

জুটাইতে পারিবে কে জানে। যত দিন যাইবে অভাব ততই বাড়িয়া চলিবে। কাদুর ধৈর্য যখন একবার ভাঙিয়া গিয়াছে, রাগ এবং বিরক্তি তাহার অভাবের অনুপাতে বাড়িবে বই কমিবে না।

মধুর ঘুম আসিল না। শুইয়া শুইয়া সে আকাশ-পাতাল ভাবিতে লাগিল। কিছু দিন আগে সে খবর পাইয়াছিল, গ্রামের রাখাল মিত্র অনেকগুলি নগদ টাকা সঙ্গে লইয়া বাড়ি আসিয়াছে। রাখাল মিত্রের বাড়িটা কাঁচা। রাখালের টাকা রাখিবার লোহার সিন্দুকও নাই। মধুর লোভ হইয়াছিল। রাখাল বাড়ি আসিলে রাখালের বৌ স্বামিসেবার সুবিধার জন্য একটা ঠিকা ঝি রাখে। ঘরের সন্ধান আনিবার জন্য অনেক বলিয়া কহিয়া কাদুকে রাজী করিয়া মধু তাহাকে রাখালের বাড়ি কাজ করিতে পাঠাইয়াছিল। বলিয়াছিল, 'একদিনের তরে যা কাদু। খবরটা এনে দে। একদিন কাজ ক'রে পোষালো না বলে চলে আসিস, আর তোকে যেতে হবে না।' কাদু বলিয়াছিল, 'হে ভগবান! শেষকালে ঝিগিরি পর্যন্ত অদেষ্টে ছেল!'

কোন্ ঘরের কোন্ দিকে রাখাল ঘুমায়, তার ছেলে পান্নালাল কোন্ ঘরে শোয়, রাখালের ঘরের কোথায় বাক্স-প্যাটরা থাকে, এসব খবর কাদু তাকে আনিয়া দিয়াছে। কিন্তু সেই হইতে নিজেও সে যেন কেমন বদলাইয়া গিয়াছে।

প্রথমটা মধু অত খেয়াল করে নাই। ভাবিয়াছিল, ঝির কাজ করিতে পাঠানোয় কাদুর বুঝি রাগ হইয়াছে, সে অভিমান করিয়াছে, এ আর ক-দিন স্থায়ী হইবে? কিন্তু আজ কাদুর সুস্পষ্ট কলহ-ভাষণ ও নিষ্ঠুর আচরণের পর তাহার পরিবর্তনের ইতিহাস মধুর আগাগোড়া মনে পড়িতে লাগিল। ইহাকে সাময়িক ক্রোধ ও বিরক্তি মনে করিয়া স্বস্তিলাভের সাহস তাহার আর রহিল না।

সবচেয়ে বেশী করিয়া মধুর মনে পড়িতে লাগিল এই কথা যে, কাদু জ্বরের কদিন ভাল করিয়া তাহার সেবা করে নাই, সময় মত খাইতে দেয় নাই, না ডাকিলে কাছে আসে নাই। সর্বদা কিরকম অন্যমনস্ক থাকিয়াছে। একদিনের বেশী তাহার দাসীবৃত্তি করিবার কোন প্রয়োজন ছিল না, তবু বিশেষ করিয়া বারণ করা সত্ত্বেও তাহাকে অসুস্থ রাখিয়া সে রাখালের বাড়ি কাজ করিতে চলিয়া গিয়াছে। কৈফিয়ত দিয়াছে, 'হঠাৎ কাজ ছেড়ে দিলে লোকে সন্দ' করবে যে!'

'সন্দ' করবে-না-করবে আমি বুঝব। তুই আর যাসনে কাদু।'

'এ মাসের ক-টা দিন যাই। বলা নেই কওয়া নেই হঠাৎ মানুষ কাজ ছেড়ে দেয় কি করে শুনি ?'

এমনি সব কথা, যার অর্থ বুঝা যায় না।

মাঝখানে একদিন রাখালের বড় ছেলে পান্নাবাবু আসিয়াছিল, এক অদ্ভুত প্রস্তাব লইয়া।

'রাজু কাল শ্বশুরবাড়ি যাবে মধু। তোমার বৌকে সঙ্গে দিতে হবে। বেশীদিনের জন্য নয়,—ধর, এই দিন পনরো।'

মধু রাজী হয় নাই।

কিন্তু রাখালের মেয়ের ঝি হইয়া তাহার শ্বশুরবাড়ি যাওয়ার জন্য কাতুর উৎসাহ দেখিয়া সে অবাক্ হইয়া গিয়াছিল। যাওয়ার অনুমতি না পাইয়া দুদিন কাতু তাহার সঙ্গে ভাল করিয়া কথা বলে নাই।

'দশ টাকা মাইনে দিত। দশটা টাকা তোমার জন্যে জলে গেল।' বলিয়া বলিয়া কয়েকদিন সে যে কেন আপসোস করিয়া মরিয়াছিল অনেক ভাবিয়াও মধু তাহা বুঝিতে পারে নাই।

অনেকক্ষণ পরে মধু টের পাইল, পাশে কাতুর চোখেও ঘুম আসে নাই।

'ঘুমোসনি কাতু ?'

'না।'

মধু আর একবার তাহাকে জড়াইয়া ধরিবার চেষ্টা করিয়া বলিল, 'কেন ঘুমোসনি রে ? এত ঘুমকাতুরে তুই।'

'গরম লাগছে। ছাড়ো।'

সারাদিনের গুমোট-করা গরমের পর এতক্ষণে পৃথিবীর আবহাওয়ায় মনোরম শীতলতা ঘনাইয়া আসিয়াছে। কাতুর কথাটা মধু বিশ্বাস করিতে পারিল না।

'তোর কি হয়েছে বল্ ত ?'

'কি আর হবে ? কিছু হয়নি। জ্বর থেকে উঠেছ, রাত না জেগে ঘুমোও না বাবু।'

এ অনুরোধ স্নেহের পরিচায়ক। কিন্তু কথাগুলিতে এমনি ঝাঁজ ছিল যে মধু আবার আহত ও অবাক্ হইয়া গেল। কাতুর এই স্থায়ী অনমনীয় বিরক্তির

কারণটা অনুমান করা অবধি তাহার মনের মধ্যে দারুণ অশান্তি হইতেছিল। বুনো শিয়ালের প্রকৃতি লইয়া ঈশ্বরের কোন্ বিস্ময়কর নিয়মে কাতুকে সে ভালবাসিয়াছিল বলা যায় না। আপনার বিকৃত গোপনতা, লোভ ও সেই লোভের জন্য বিরামহীন শাস্তির আশঙ্কা এবং মৃত বিবেককে বুকে করিয়া বেড়ানোর যন্ত্রণা তাহার মনের চারিদিকে হীনতার প্রাচীর তুলিয়া দিয়াছে। স্বার্থ ছাড়া জগতে সে আর কিছুই বোঝে না। তবু কাতুর প্রতি তাহার অপরিসীম মমতা আছে, যে মমতার বশে কাতুর জন্য তাহার অনেকগুলি ত্যাগ সম্ভব হইয়াছে। তাহার নিস্তেজ ভীরু মন তাহার চেয়ে যারা দুর্বল তাদের উপর অত্যাচার করিবার জন্য সর্বদা উন্মুখ হইয়া থাকে। মাঝে মাঝে কাতুর সুন্দর ফাঁপা গাল দুটিতে চড় বসাইয়া দিবার জন্য মনে মনে যে তাহার কখনও উন্মত্ত ইচ্ছা জাগে নাই এমন নয়। কিন্তু জীবনে আর কোন বিষয়ে লেশমাত্র সংযম না থাকিলেও এ ইচ্ছাকে সে বরাবর দমন করিয়া আসিয়াছে।

রাগের সময় চোখ রাঙাইয়াছে, দাঁতে দাঁত ঘষিয়াছে, যা-তা গাল দিয়া বসিয়াছে। কিন্তু কখনো গায়ে হাত তোলে নাই।

কাতুর চোখে জল দেখিবামাত্র নিজেও সে গলিয়া জল হইয়া গিয়াছে। ভদ্র-লোকে যে ভাবে প্রগাঢ় আবেগের সঙ্গে, প্রেমাত্মক সুনিবিড় আত্মীয়তার সঙ্গে, ক্রন্দসী প্রিয়াকে আদর করে, তেমনিভাবে বুকে নিয়া চুমো খাইয়া গদ্গদ ভাষায় ভালবাসা জানাইয়া কাতুকে সে সোহাগ করিয়াছে। বলিয়াছে, 'তুই আমার পাঁজরা কাতু, তুই আমার চোখের মনি। আমার আঁধার ঘরের আলো তুই, মানিক তুই,—মাইরি।' বলিয়াছে, 'এক লহমার জন্যে তোকে চোখের আড়াল করলে বুক ফেটে যায় কাতু।'

কাতু এ ভালবাসা কড়ায়-গণ্ডায় শোধ করিতে ছাড়ে নাই। মন দিয়া করিয়াছে স্নেহ, দেহ দিয়া করিয়াছে সেবা। চোরের মনটি চুরি করার জন্য যত কলাকৌশল ছল-চাতুরী সম্ভব তাহার একটিকেও সে অবহেলা করে নাই। মধুর মনে হইয়াছে, জগতে কাতুর তুলনা নাই। রূপে গুণে স্নেহ-মমতায় সে অতুলনীয়া। অনেক তপস্যায় ওকে সে পাইয়াছে।

সেই কাতু কি আজ তাহার পর হইয়া গেল? সোনার চুড়ির বদলে রূপার চুড়ি দিয়াছে বলিয়া সোনার মেয়ে কি পাথর হইয়া গিয়াছে? তাহার চেয়ে টাকাকেই ভালবাসিতে শিখিয়াছে?

আরও খানিকক্ষণ চুপচাপ শুইয়া থাকিবার পর মধু হঠাৎ উঠিয়া বসিল। বলিল, 'কাদু! ওঠ্ত একবার।'

কাদু বলিল, 'কেন, উঠবো কি জন্তে?'

'আলো জাল্। বেরুবো।'

· খানিকক্ষণ কাদুর উঠিবার লক্ষণ দেখা গেল না। মনে মনে সে কি ভাবিতে লাগিল কে জানে?

তারপর নিঃশব্দে উঠিয়া দীপ জালিল।

বলিল, 'না বেরুলেই হ'ত আজ। জর থেকে উঠেছ।'

মধুর হঠাৎ রাগ হইয়া গেল।

'অত সোহাগ তোকে আর জানাতে হবে না, জানলি? ঢের হয়েছে। অন্ত-লোকে কত দিত! যে দিত, যা না তার কাছে।'

কাদুর হাতে নূতন চুড়িগুলিকে প্রদীপের আলোয় চিকচিক করিতে দেখিয়া মধুর রাগ একমুহূর্তে অভিমানে পরিণত হইয়া গেল।

'জর গায়ে রাতদুপুরে বিষ্টি মাথায় করে কামাতে চললাম, মেয়ের মুখ তবু হাঁড়িপানা হয়েই রইল। ধরা পড়ি ত আচ্ছা হয়।'

কাদু বলিল, 'কে যেতে বলছে?'

'তুই বলছিস্, তুই!···চুপ থাক্, কাদু। রাগের সময় কথা ক'য়ে রাগ বাড়াস না।'

কাদু একটু ভয় পাইয়া বলিল, 'খামখা রাগ করলে মানুষ কি করবে?'

মধু রাগে অভিমানে স্ত্রীর কথার কোন জবাব দিল না। কেন, ও পায়ে ধরিতে পারে না? গলা জড়াইয়া কাঁদিতে পারে না? বলিতে পারে না, অসুখ শরীরে আজ তুমি যেও না গো, তোমার দুটি পায়ে পড়ি, কথা শোন, লক্ষী, নইলে আমি গলায় দড়ি দেব?

মধু কোমরে ল্যাঙট আঁটিল। কোমরে যে এত ব্যথা ধরিয়া আছে শুইয়া থাকার সময় কে তাহা জানিত! ঘরের কোণায় ভুষি-রাখা জালার ভিতর হইতে সিঁধকাঠি বাহির করিয়া মধু বলিল, 'এঃ মরচে ধরে গেছে। খেয়াল করে একটু তেলও একদিন মাখিয়ে রাখতে পারিস নি? শিলটা আন ত, একটু ঘষে নিয়ে যাই।'

কাদু বলিল, 'বিষ্টিতে মাটি নরম হয়ে আছে। ওতেই হবে।'

মধু বলিল, 'যেমন-তেমন করে আমায় বিদেয় করতে পারলে বাঁচিস, না? তোর এত টাকার খাঁকতি কবে থেকে হল বল্ ত?'

কাদু কথা কহিল না। শিলটা আনিয়া দিয়া বিছানায় বসিয়া একবার এদিক-ওদিক চাহিয়া ঘাড় হেঁট করিয়া রহিল।

তাহার এই অপরিচিত ভঙ্গী মধুর একেবারেই ভাল লাগিল না। তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে চাহিয়া সে বলিল, 'তেল মাখব, তেল দে কাদু।'

কাদু বলিল, 'তেল নেই।'

'নেই? নেই কেন?'

'জানিনে বাপু অত। নেই ত আমি কি করব? গড়িয়ে আনব?'

মধু স্থির দৃষ্টিতে কাদুর দিকে চাহিয়া রহিল। কাদুর মধ্যে একটা চাপা উত্তেজনা, একটা গোপন-করা চাঞ্চল্য এতক্ষণে সে আবিষ্কার করিতে পারিয়াছে। সে নিজে পাকা চোর, চোরের ভাবভঙ্গী তাহার অজানা নয়। কাদুর চোখে-মুখে চুরির উদ্দেশ্য সে যেন স্পষ্ট দেখিতে পাইল। সন্দিগ্ধ হইয়া বলিল, 'তোর ভাবখানা কি বল্ ত? ও-রকম করছিস কেন?'

কাদু থতমত খাইয়া বলিল, 'ভাবনা লাগছে। তোমার জন্য ভাবনা লাগছে। বাড়ির মানুষকে সজাগ দেখলে সিঁধ দিওনি বাপু, ফিরে এসো।'

তবু যাইতে বারণ করিবে না। প্রথম দিন এমনিভাবে ল্যাঙট পরিয়া সারাগায়ে তেল মাখিয়া বাহির হওয়ার সময় কাদু কেবল তাহার পায়ে ধরিতে বাকী রাখিয়াছিল। সে দিনের কথাটা ভাবিতে ভাবিতে মনের মধ্যে একটা ক্ষুব্ধ অসন্তোষ লইয়া মধু ঝাঁপ খুলিয়া বাহিরে চলিয়া গেল।

কাদুর ও তাহার নিজের শরীরের উত্তাপে উষ্ণ শয্যা ছাড়িয়া আসিয়া বৃষ্টির প্রথম স্পর্শে মধুর সর্বাঙ্গ শিহরিয়া উঠিল। একবার সে মনে করিল ফিরিয়া যায়; কিন্তু ফিরিয়া গেলে কাদু খুশি হইবে না স্মরণ করিয়া দাঁতে দাঁত চাপিয়া গোয়ালাপাড়ার ভিতর দিয়া সংকীর্ণ পথ ধরিয়া সে সাবধানে গ্রামের দিকে আগাইয়া চলিল।

বৃষ্টি ধরিয়া আসিলেও আকাশ নিবিড় মেঘে আচ্ছন্ন হইয়া আছে। জলসিক্ত স্তব্ধ খড়ের ঘরগুলির পাশ দিয়া চলিতে চলিতে মধুর অসন্তোষ বাড়িয়া গেল। সব চেয়ে ভাঙাচোরা ঘরটি দেখিয়া তার মনে হইল যে, এ বাড়ির বৌ সাতদিন উপবাস করিয়া থাকিলেও বোধ হয় অসুস্থ স্বামীকে এই অন্ধকার বাদল-রাতে

ঘরের বাহির হইতে দেয় না। ওই স্বামীটির ভাগ্যের সঙ্গে তার ভাগ্যের পার্থক্য অকারণ নয়। যত গভীর হোক, ও চোর নয়। সে চোর। তার বৌ তাই নিজের সুখের জন্য তাকে বিপদের মুখে যাইতে দিতে দ্বিধা করে না। চোর-স্বামীকে অনায়াসে ঘরের বাহির করিয়া ঝাঁপ বন্ধ করিয়া ঘুমায়।

অল্পক্ষণের মধ্যেই মধু খালের ধারে পৌঁছিয়া গেল। বহুকাল পরে আজ সে আত্মগ্লানি অনুভব করিতে আরম্ভ করিয়াছে। পাপ-পুণ্য ভালমন্দের যে সংস্কার তাহার মরিয়া মরিয়া একেবারে নবজন্ম গ্রহণ করিয়াছিল, তাহাই যেন আবার আগের রূপ ধরিয়া তাহার মনের মধ্যে অস্বস্তি ও বিতৃষ্ণা ছড়াইয়া দিতে লাগিল। খালের ধারে ধারে খানিক দূরের পুলটার দিকে চলিতে চলিতে রত্নাকরের মত সহসা মধু অনুভব করিতে আরম্ভ করিল, এতকাল সে অতি ঘৃণ্য জীবনযাপন করিয়া আসিয়াছে। অকথ্য কদর্য জীবন। পাপের তাহার সীমা নাই। নরকেও তাহার ঠাঁই হইবে না।

ভাবিয়া নিজেকে মধুর একান্ত অসহায় মনে হইতে লাগিল। একটা অভূত-পূর্ব হারাইয়া-যাওয়ার অনুভূতির মধ্যে তাহার সহসা যেন ভয় করিতে লাগিল। সে আবার ভাবিল, থাক্, কাজ নাই চুরি করিয়া, ফিরিয়া যাওয়াই ভাল। কিন্তু কাদুকে মনে করিয়া এবারও প্রত্যাবর্তনের ইচ্ছাটা তাহাকে দমন করিয়া ফেলিতে হইল। কাদুর উপরে তাহার রাগ ও অভিমানের সীমা ছিল না। তবু এমন অবস্থাতেও সে ভুলিতে পারিতেছিল না যে, কাদু তাহাকে দুর্লভ রূপ-যৌবন দিয়াছে, আজ না দিক্ এতকাল স্নেহও দিয়াছে। সেই দাবিতে কাদু তাহার কাছে সুখ চায়। প্রার্থনাটা যত স্বার্থপরের মত হোক্, অসঙ্গত নয়, অনুচিত নয়। কাদুকে এসব তাহার দিতেই হইবে যে।

খানিক আগাইয়া কুমারপাড়ার ঘাট। ঘাটে চার পাঁচটি ছোট বড় নৌকা বাঁধা আছে। একটি নৌকার ছইয়ের মধ্যে এত রাত্রে আলো জ্বলিতেছে দেখিয়া মধু একটু আশ্চর্য হইয়া গেল। এত রাত্রে খালে নৌকার মধ্যে আলো জ্বালিয়া বসিয়া আছে কে? বহুকাল ধরিয়া অন্ধকারে পথে-বিপথে বিচরণ করিয়া মধুর সাপের ভয় ছিল না। ঘন কাশবনের মধ্যে উবু হইয়া বসিয়া দুই হাতে কাশ ফাঁক করিয়া করিয়া ঘাটের পাশে নৌকার খুব কাছেই সে একটু একটু করিয়া আগাইয়া গেল। ভাবিল, বিদেশী পাটের দালাল হয়ত কপাল ভাল।

রসুলপুর নদীর ঘাটে এমনি এক বর্ষার রাত্রে মধু একজন মুখচেনা পাটের দালালের নৌকা হইতে একবার একটি ক্যাশবাক্স সরাইয়াছিল। বাক্সে ছিল নগদ প্রায় সাতশ' টাকা। আজও ফাঁকতালে তেমনি একটা দাঁও মারা যাইবে ভাবিয়া মধু খুশি হইয়া উঠিল। ভাবিল, রাখালের ভিটায় হয়ত আজ আর সিঁধ কাটিতে হইবে না। ধরা পড়িলে রাখালের গোঁয়ারগোবিন্দ ছেলেটার হাতে মার খাইয়া মরিবার ভয়ে থাকিয়া থাকিয়া মেরুদণ্ডের মধ্যে শিরশির করিয়া উঠিবে না।

পান্নাবাবুকে মধু বড় ভয় করে।

জলের স্রোতে নৌকাটি পাশাপাশি তীরের দিকে ঘেঁষিয়া আসিয়াছিল। কোমর-জলে নামিয়া ছই-এর ফুটায় চোখ দিয়া ভিতরে তাকাইতে মধুর আকাশ-কুসুম শূন্যে মিলাইয়া গেল। ভিতরে বিছানা পাতা আছে। মাথার কাছে আলো রাখিয়া সেই বিছানায় চিত হইয়া শুইয়া বই পড়িতেছে রাখালেরই বড় ছেলে পান্নাবাবু।

রাখালের বাড়িতে চুরি করিতে বাহির হইয়া রাখালের ছেলেকেই খালের নির্জন ঘাটে নৌকার মধ্যে এত রাত্রে একাকী বই পড়িতে দেখিবে মধুর ইহা কল্পনাতীতই ছিল। নৌকার ধার ঘেঁষিয়া জলের মধ্যে খানিকক্ষণ সে অভিভূত হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

তারপর তাহার মনে হইল ব্যাপারটা হয়ত খুব আশ্চর্যজনক নয়। পান্নাবাবু কাল বোধ হয় শহরে যাইবে, আকাশে মেঘের ঘটা দেখিয়া সকাল সকাল খাওয়া-দাওয়া সারিয়া নৌকায় আসিয়া শুইয়া আছে। ভোররাত্রে মাঝিরা আসিয়া নৌকা খুলিবে।

কিন্তু রাখালের বাড়ির কাছে মজুন্দার ঘাটে নৌকা না বাঁধিয়া এতদূর উজানে আসিয়া নৌকা রাখা হইয়াছে কেন, অনেক ভাবিয়াও মধু তাহার কারণটা অনুমান করিতে পারিল না। কিন্তু এক বিষয়ে সে অনেকটা নিশ্চিন্ত হইয়া গেল। রাখালের বাড়িতে বুড়া রাখাল নিজে আর দুটি ছোট ছেলে ছাড়া পুরুষ মানুষ আর কেহ নাই। তাহার আবির্ভাব প্রকাশ পাইয়া গোলমাল হইলেও সহজে তাহাকে কেহ আয়ত্ত করিতে পারিবে না।

মধু আর এ তীরে উঠিল না। সাঁতরাইয়া খাল পার হইয়া গেল। তাহার মন এখন হাল্কা হইয়া গিয়াছে। ভাগ্যের অনেকগুলি যোগাযোগের হিসাব করিয়া

তাহার ধারণা হইয়াছে আজ রাত্রে তাহার সাফল্য অনিবার্য। আজ চুরি করিতে বাহির হইবে বলিয়া কাল তাহার জ্বর ছাড়িয়া গিয়াছিল। আকাশে আজ তাহার চুরির সুবিধার জন্যই মেঘ ঘনাইয়া আসিয়াছে এবং পান্নাবাবুকে বাড়ি ছাড়িয়া নৌকায় আসিয়া শুইতে হইয়াছে। ভাগ্যের আহ্বান উপেক্ষা করিয়া দৈহিক দুর্বলতার ছুতায় সে অলস হইয়া ঘরে শুইয়া থাকিতে পারে বলিয়া তাহাকে বাহির করার জন্য কাদুর মেজাজটাও আজই গিয়াছে বিগড়াইয়া।

আজ হয়ত তাহার লাভেরই কপাল।

মধুর দুচোখ লোভে চকচক করিয়া উঠিল। অন্ধকারেরই একটা গাঢ়তর অংশের মত নিঃশব্দপদে সে গ্রামের মধ্যে প্রবেশ করিল। থাকিয়া থাকিয়া দমকা বাতাসে মধুর শীত করিয়া উঠিতেছে। কিন্তু মনে তাহার আর কোন দুঃখ নাই। কাদুর কাছে ঘা খাইয়া ক্ষণকাল পূর্বে সে একবার নরকযাত্রা করিয়াছিল, এখন সে আবার অনায়াসে স্বর্গে উঠিয়া গিয়াছে। চুরি করার মধ্যে আর সে দোষের কিছু দেখিতে পাইল না। ভাবিল, কিসের পাপ? জগতে চোর নয় কে? সবাই চুরি করে। কেউ করে আইন বাঁচাইয়া, কেউ আইন ভেঙে। স্বাধীনতার মূলধন লইয়া এ ব্যবসায় নামিতে যাহাদের সাহস নাই, চুরিকে পাপ বলে শুধু তাহারাই। পারিলে তাহারাও চুরি করিত। চোরের চেয়েও তাহারা অধম। তাহারা ভীরু, কাপুরুষ।

মধু প্রচুর আত্মপ্রসাদ ভোগ করিতে লাগিল। উত্তেজিত লোভের মধ্যে চুরির সমর্থন তাহার কাছে প্রায় গৌরবময় হইয়া উঠিয়াছে। এমন জীবন আর নাই। কতকাল ধরিয়া কত কষ্টে বিদেশে টাকা উপার্জন করিয়া রাখাল বাড়ি আসিয়াছে, রাজার খাজনা মিটাইবে, দেনা শোধ করিবে, জমি কিনিবে, মেয়ের বিবাহ দিবে। একরাত্রে কয়েক মিনিটের মধ্যে ওই টাকার হস্তান্তর! মাথার ঘাম পায়ে ফেলিয়া উপার্জন করিবার সময় সাধু রাখাল কি কখনো ভাবিতেও পারিয়াছিল টাকাগুলি শেষ পর্যন্ত কাজে লাগিবে মধুর। সে তাহার কাদুর মুখের হাসি উপভোগ করিবে বলিয়া খাটিয়া মরিয়াছে রাখাল, এ যেন কৌতুক, এ যেন তাহার বাহাদুরি। মধুর ঠোঁট ভাঙিয়া হাসি ফুটিল।

অনুতাপ ও আত্মপ্রসাদ, আজ রাত্রে মধুর মনের এই ক্ষণে ক্ষণে আকাশ-পাতাল দোল-খাওয়াটা বিস্ময়কর কিছু নয়। চোরের অভিজ্ঞতা অতুলনীয়, হৃদয়ের বিবর্তন তাহাদের অসাধারণ।

অথচ চোরেরা জীবনে বড় একা। ওদের আপন কেহ নাই। কবির মত, ভাবুকের মত নিজের মনের মধ্যে ওরা লুকাইয়া বাস করে। যে স্তরের অনুভূতিই ওদের থাক্, যে রুক্ষ শ্রীহীন সীমানার মধ্যেই ওদের কল্পনা সীমাবদ্ধ হোক্, ওদের অনুভূতি, ওদের কল্পনা ক্ষণে ক্ষণে বিচিত্র, পরিবর্তনশীল। অনেক ভদ্রলোকের চেয়ে ওরা বেশী চিন্তা করে। জীবনের এমন অনেক সত্যের সন্ধান ওরা পায়, বহু শিক্ষিত সুমার্জিত মনের দিগন্তে যাহার আভাস নাই। কবির নেশা নারী, চোরের নেশা চুরি। আসলে ও দুটো নেশাই, মানসিক উর্বরতা বিধানের পক্ষে সমান সারবান। সংসারে এমন লক্ষ লক্ষ সাধু আছে, যাহাদের লইয়া আমি গল্প লিখিতে পারি না। জীবনে তাহাদের গল্প নাই। প্রেমিকের মত, অন্যায় অসঙ্গত চুরি-করা প্রেমে ব্যুৎপন্ন প্রেমিকের মত চোরের জীবন গল্পময়।

সিঁধের ফুটা দিয়া রাখালের ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিবার সময় মধুর হৃদয় তীব্র সতেজ উত্তেজনায় ভরপূর হইয়া গেল, তাহার প্রত্যেকটি ইন্দ্রিয় তীক্ষ্ণ সতর্কতায় সজাগ হইয়া রহিল। ঘরে আলো কমানো ছিল। খাটের উপর পাঁচ ছয় বছরের ছোট ছেলেটিকে লইয়া রাখাল শুইয়া আছে। রাখালের স্ত্রী ও বিবাহযোগ্যা মেয়েটির বিছানা হইয়াছে মেঝেতে। এদিকের অন্ধকার কোণে নিঃশ্বাস রোধ করিয়া দাঁড়াইয়া মধু ঘরের চারিদিকে চাহিয়া দেখিতেছিল। নিস্তব্ধ ঘরে ঘুমন্ত মানুষের শান্ত আবহাওয়া। এর মধ্যে আসিয়া দাঁড়ানোমাত্র মধুর উত্তেজনা আরও তীব্র, আরও উন্মাদনাকর হইয়া গিয়াছিল। বাহিরের অন্ধকার হইতে আসিয়া ঘরের মৃদু আলোতেও সে সমস্ত পরিষ্কার দেখিতে পাইতেছিল। রাখালের মেয়েটির উপর চোখ পড়িতে তাহার বুকের মধ্যে ছ্যাঁৎ করিয়া উঠিল। মেয়েটা অবিকল কাদুর মত ভঙ্গী করিয়া ঘুমাইয়া আছে। জগতে সব মেয়েই কি এমনিভাবে ঘুমায়?

কিন্তু কাদুর হাতে রূপার চুড়ি। মেয়েটা সোনার চুড়ি পরিয়াছে। কাদুর মত ও মোটাও নয়, এখনো দেহটি ওর উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিবার সময় পায় নাই। ক্ষীণ কটিতটে দেহরেখা ওর ধনুকের মত বাঁকিয়া আছে। মুখখানা কচি। ফুলের মতন কোমল। কাদুর মুখের মত পাকিয়া যায় নাই। গায়ের রঙ গোধূলির মত মনোরম, প্রভাতের মত উজ্জ্বল।

এই মেয়ের বিবাহের জন্যই বিশেষ করিয়া রাখাল টাকা লইয়া বাড়ি

আসিয়াছে। কাহুকে তাহার টাকা দিয়া কিনিতে হইয়াছিল। টাকা দিয়া মেয়েকে রাখাল বিলাইয়া দিবে।

মধু নিজেই মাথা নাড়িল। এক মুহূর্তের জন্য তার মুখের ভাব বিষণ্ণ ও করুণ দেখাইল। কামনা করিবার অধিকার জগতে সকলেরই আছে। কোন অবস্থাতেই কেহ নিজেকে এই অধিকার হইতে বঞ্চিতও করে না। রাখালের ঘুমন্ত মেয়েটার জন্য একটা প্রগাঢ় অস্থায়ী প্রেম অনুভব করিতে মধুর হৃদয় কোন বাধাই পাইল না। হৃদয়ের এই আকস্মিক আবেগসঞ্চার তাহার নূতন নয়। গহনার দোকানের সামনে দাঁড়াইয়া এমনি আকস্মিক হৃদয়োচ্ছ্বাস সে অনুভব করিয়াছে। দোকানের সুরক্ষিত গহনাগুলিকে দুর্লভ জানিয়া সে যেমন ব্যথা পাইয়াছে, আজ তাহার এই কলঙ্কিত নিশীথ-অভিযানের উগ্র ভয়কাতর উপলব্ধিগুলির মধ্যে আকাশের চাঁদের মত দুষ্প্রাপ্য শিথিলবসনা মেয়েটির জন্য ক্ষণিকের নিবিড় ব্যর্থ প্রেমে তেমনি একটা বেদনা অনুভব করিল। তাহার সাধ হইল, মেয়েটিকে একবার সে স্পর্শ করে। পরম আগ্রহে কম্পিত ব্যাকুল বাহুতে কাহুর মত ওকে একবার সজোরে বুকে চাপিয়া ধরিয়া পলাইয়া যায়। টাকা দিয়া তাহার কাজ নাই।

স্বর্গচ্যুত অভিশপ্ত দেবতা হঠাৎ চোখ মেলিয়া অদূরে স্বর্গের ছবি দেখিলে যেমন করিয়া অশান্ত ও বিচলিত হইয়া পড়ে, মধুর বিকৃত মন নিষ্পাপ সুন্দরী মেয়েটির একটু স্পর্শলাভের জন্য তেমনি ভাবে কাঁদিয়া উঠিল। মরুপথিকের সামনে এ যেন সরোবরের আবির্ভাব। মরীচিকার মত মিলাইয়া যাইবে জানিয়াই ঝাঁপ দেওয়ার সাধ যেন কমে না, বাড়িয়া যায়।

মধু জোরে নিঃশ্বাস ফেলিল। দেবমন্দিরের বাহিরে দাঁড়াইয়া অশান্ত আত্মার ধূপগন্ধী বায়ুকে নিঃশ্বাসে গ্রহণ করার মত শ্বাস টানিয়া লইয়া আপনার জলসিক্ত অর্ধউলঙ্গপ্রায় দেহের দিকে চাহিয়া তার চোখে জল আসিয়া পড়িল।

সে যে নরকে বাস করে, আজ পর্যন্ত সে যে এক মুহূর্তের জন্য শান্তি পায় নাই, একথা হঠাৎ আবার তাহার মনে পড়িয়াছে। তার নোংরা দুর্গন্ধ ঘর, স্থূলাঙ্গী টাকা-দিয়া-কেনা হীনচেতা স্ত্রী, তার লোভ ও ভয়ে-ভরা একটানা অস্বাভাবিক জীবন। ভদ্রলোকে কি-ভাবে বাঁচে মধুর তাহা অজানা নয়। সৎ ধর্মভীরু গৃহস্থের জীবনযাত্রা প্রণালীর সঙ্গে তার পরিচয় আছে। তেমনি একটি ঘুমন্ত পরিবারকে চোখের সামনে রাখিয়া, একটি কিশলয়ের মত কোমল কিশোরীকে ভালবাসিয়া (কয়েক মুহূর্ত পরে মধুর অনুভূতি একেবারে লোপ

পাইবে, তবু ইহা ভালবাসাই) মনে মনে মধু নিজের জীবনের সঙ্গে সংসারে যারা চোর নয় তাহাদের জীবনের তুলনা করিল। হিংসায় ক্ষোভে হতাশায় সে জর্জরিত হইয়া গেল। ভাবিল, ফিরিয়া যায়। কাজ নাই তাহার চুরি করিয়া।

ফিরিয়া গিয়া নতুন করিয়া জীবন আরম্ভ করে। সংযত সুন্দর পবিত্র জীবন। ঈশ্বরকে আর কি ভক্তি করা যায় না? কাদুকে শেখানো যায় না লোভ করিতে নাই, নোংরা থাকিতে নাই, অবাধ্য হইতে নাই, কলহ করিতে নাই? সোনার চুড়ির চেয়ে রূপার চুড়িতে সুখ বেশী এ কি কাদুকে বোঝানো যায় না? পরকালের কথা ভাবিয়া পরদ্রব্যে লোভ করা কি তাহারা দুইজনে বন্ধ করিতে পারে না? সে মজুর খাটিবে। গরু কিনিয়া দুধ বেচিবে। জমি কিনিয়া চাষ করিবে। না হয় গ্রামের মধ্যে মনোহারী দোকান দিবে। স্বামী-স্ত্রী দুজনে মিলিয়া তাহারা মন্ত্র গ্রহণ করিবে। সকালে উঠিয়া দিনের দেবতাকে প্রণাম করিয়া সন্ধ্যা পর্যন্ত জীবিকার্জনের জন্য খাটিয়া সন্ধ্যার পর একাগ্রচিত্তে তাহারা মালাজপ করিবে। আস্তে কথা কহিতে শিখিবে। দুঃখে বিচলিত হইবে না। হৃদয়ের শান্তিতে সকল অবস্থায় শান্ত হইয়া থাকিবে। কাদুর একটি ছেলে নষ্ট হইয়া গিয়াছে,— কাদুরই অসাবধানতায়। এবার ছেলে-মেয়ে হইলে বাঁচিবে। তাহাদের লইয়া সুখে তাহারা ঘর-সংসার করিবে।

এতকাল সে ত চুরি করিয়াছে। চুরি করিয়া লাভ কোথায়?

প্রত্যেক চোর মধ্যে মধ্যে নিজেকে এ প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করে। কিন্তু তবু চুরি করিতে ছাড়ে না। চোর চুরি না করিয়া করিবে কি? চুরি ছাড়া চোরের জীবনে আর সবই যে আকাশকুসুম।

মধুর এত অনুতাপ, রাখালের মেয়ের জন্য এত ভালবাসা, সৎ হওয়ার এত ব্যাকুল আকাঙ্ক্ষা কিছুক্ষণের মধ্যেই মিলাইয়া আসিল। রাখালের তোরঙ্গটি সিঁধের ফাঁক দিয়া একটু পরে চলিয়া গেল বাহিরে। বেশী টাকা রাখিবার উপযুক্ত ওই একটি তোরঙ্গই রাখালের ছিল।

কিছুদূরে একটি আমবাগানে ঢুকিয়া মধু তোরঙ্গটি ভাঙিল। রাখালের বোধ হয় টাকা রাখিবার থলি ছিল না, নোট আর টাকাগুলি সে একটা বালিশের খোলে ভরিয়া বাক্সে রাখিয়াছিল। অনেকগুলি খুচরা টাকা থাকায় টাকার পুঁটুলিটি কম ভারী হয় নাই। হাতে করিয়া আনন্দে মধুর মন নাচিয়া উঠিল।

খাল পার হওয়ার সময় একবার তার মনে হইল, টাকার অভাবে রাখাল হয়ত

মেয়েটার বিবাহ দিতে পারিবে না। কিন্তু কথাটা তাহার মনের মধ্যে একেবারেই আমল পাইল না। রাখালের মেয়ের জন্য তাহার বুকে আর বিন্দুমাত্র প্রেমও অবশিষ্ট ছিল না। রাখালের মেয়েকে সে ভুলিয়া গিয়াছিল।

মধু জানিত, কুমারপাড়ার ঘাটে পান্নাবাবুর নৌকা বাঁধা আছে। কিন্তু ঘাটের কাছে আসিয়া ইতোমধ্যে নৌকাটি অদৃশ্য হইয়া গিয়াছে দেখিয়া সে অবাক্ হইয়া গেল। ভাবিল, এত রাত্রে নৌকা ছেড়ে পান্নাবাবু গেল কোথায় ?

বাড়ি পৌছিয়া ঘরের দরজা খোলা দেখিয়া মধু খুশি হইল। ভাবিল, কাদু তাহারই প্রতীক্ষায় দরজা খুলিয়া বসিয়া আছে।

'আমি এসেছি, কাদু। আলো জ্বাল।'

সে আসিয়াছে, কাদুকে সোনার চুড়ি দিবার ব্যবস্থা করিয়া, একবছর দেড়বছর আরামে দিন কাটানোর উপায় করিয়া ফিরিয়া আসিয়াছে। কাদু কত খুশি হইবে।

কাদুর সাড়া না পাইয়া সে ঘুমাইয়া আছে মনে করিয়া মধুর আনন্দ একটু কমিল। নিজেই সে কাঠের বাক্সের উপরটা হাতড়াইয়া দিয়াশলাই খুঁজিয়া প্রদীপ জ্বালিল। পরমুহূর্তে দীপালোকে ঘরের শূন্যতা প্রকট হইয়া গেল।

দুচোখে অপার বিস্ময় ও আশঙ্কা নিয়া মধু ঘরের শূন্যতাকে প্রত্যক্ষ করিল। এত রাত্রে মানুষের ঘর যে কি করিয়া এমনভাবে খালি হইয়া যায়, এ যেন হঠাৎ সে বুঝিয়া উঠিতে পারিল না। বিছানায় কাদু নাই। দড়িতে কাদুর কাপড় দুখানা নাই। বড় টিনের তোরঙ্গটির উপর বেতের ছোট ঝাঁপিটিও নাই। মধু সহসা ব্যাকুলভাবে টিনের তোরঙ্গটি খুলিয়া ফেলিল। ভিতরে কাদুর ক-খানা ভাল কাপড় ছিল, একটা পিতলের পানের ডিবায় সোনার মাকড়ি ছিল, আঙটি ছিল। সেগুলিও অদৃশ্য হইয়া গিয়াছে।

মধুর মনের উত্তেজিত আনন্দ সহসা নিঝুম হইয়া গেল। টাকা ও নোটে ভরা বালিশের খোলটি পায়ের কাছে মাটিতে পড়িয়া ছিল। সেদিকে তাকাইয়া তাহার মনে হইল আবার তাহার জ্বর আসিতেছে। সহসা মধু বীভৎস হাসি হাসিল। রাখালের ঘরের দিকে চলিবার সময় যে যুক্তি দিয়া নিজের চৌর্যবৃত্তিকে সে সমর্থন করিয়াছিল সেই কথাটি হঠাৎ তাহার মনে পড়িয়া গিয়াছে। জগতে চোর নয় কে ? সবাই চুরি করে।

সন্দেহ নাই যে, ব্যাপারটা বড়ই শোচনীয়। কে কল্পনা করিতে পারিত, বত্রিশ বৎসর বয়স পর্যন্ত স্বাভাবিক শান্ত জীবন যাপন করিবার পর গণপতি শেষ পর্যন্ত এমন একটা ভয়ানক ব্যাপারে জড়াইয়া পড়িবে! শিক্ষিত সদ্বংশের ছেলে, কথায়, ব্যবহারে ভদ্র ও নিরীহ, জীবনে ধরিতে গেলে, একরকম সব দিক দিয়াই সুখী, সে কিনা একটা লজ্জাকর হত্যাকাণ্ডের আসামী হিসাবে ধরা পড়িল! লোকে একেবারে 'থ' বনিয়া গেল। চরিত্রবান সংযত প্রকৃতির ভদ্রলোকের মুখোস পরিয়া কি ভাবেই সকলকে এতদিন খুনীটা ঠকাইয়া আসিয়াছিল! কি সাংঘাতিক মানুষ,—এ্যাঁ? জগতে এমন মানুষও থাকে?

গণপতিকে পুলিসে ধরিবার পর ভীত-বিব্রত ও লজ্জায় দুঃখে আধ-মরা আত্মীয়স্বজনের চেয়ে পরিচিত ও অর্ধপরিচিত অনাত্মীয় মানুষগুলির উত্তেজনাই যেন মনে হইতে লাগিল প্রখরতর। বিচারের দিন আদালতে ভিড় যা জমিতে লাগিল বলিবার নয়! টিকিট কিনিয়া রঙ্গমঞ্চে মিথ্যা নাটকের অভিনয় দেখার চেয়ে আদালতে নারী-ঘটিত খুনী মোকদ্দমার বিচার দেখা যে কত বেশী মুখরোচক সে শুধু তারাই জানে—রোজ খবরের কাগজে আগের দিনের আইন-আদালতের কার্যকলাপের বিবরণ পড়িয়াও যাদের কৌতূহল মেটে না, বেলা দশটায় খাওয়া-দাওয়া সারিয়া উকীল মোক্তারের মত যারা আদালতে ছুটিয়া যায়।

বাড়িতেই গণপতির তিনজন উকীল। তার বাবা রাজেন্দ্রনাথ এককালে মস্ত উকীল ছিলেন, মাসে একসময় তিনি দশহাজার টাকাও উপার্জন করিয়াছেন—এখন, সত্তর বৎসর বয়সে আর কোর্টে যান না। বড়ছেলে পশুপতি বছর বারো প্র্যাক্‌টিস করিতেছে,—বাপের মত না হোক নাম-ডাক তারও মন্দ নয়। গণপতির ছোট ভাই মহীপতিও উকীল, তবে আনকোরা নতুন। বড় উকীলের বড় উকীল বন্ধু থাকে—সমব্যবসায়ী কিনা! গণপতির পক্ষসমর্থনের জন্য অনেকগুলি নামকরা আইনজ্ঞ মানুষ একত্রিত হইলেন যে, তাতেও মামলার গুরুত্ব গুরুতর রকম বাড়িয়া গেল। তবে গণপতিকে শেষ পর্যন্ত বাঁচানো চলিবে কিনা সে বিষয়ে ভরসা করিবার সাহস এঁদেরও রহিল কম। মুশকিল হইল এই যে, মামলাটা

একেবারেই জটিল নয়। মামলা যত জটিল হয়, আইনের বড় বড় মাথাওয়ালা লোক মামলাকে জটিলতর করিয়া খুশিমত মীমাংসার দিকে ঠেলিয়া দিবার সুযোগ পান তত বেশী!

সহজ সরল ঘটনা। বাহির হইতে ঘরে শিকল তোলা ছিল আর স্বয়ং পুলিস গিয়া খুলিয়াছিল—সে শিকল। ভিতরে ছিল মাত্র রক্তমাখা মৃতদেহটা আর ভয়ে আধ-পাগলা গণপতি। গোটা দুই টিকটিকি আর কয়েকটা মশা ছাড়া ঘরে আর দ্বিতীয় প্রাণী ছিল না। মশা অবশ্য মানুষ মারে,—মানুষ যত মানুষ মারে তার চেয়েও ঢের ঢের বেশী, তবু কেন যেন এই খুনের অপরাধটা মশার ঘাড়ে চাপানোর কথাটা গণপতির পক্ষের উকীলেরা একবার ভাবিয়াও দেখিলেন না। তাঁরা শুধু প্রমাণ করিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন যে, মৃতদেহটা আগেই ঘরের মধ্যে ছিল, পরে গণপতিকে ফাঁকি দিয়া ঘরে ঢুকাইয়া বাহির হইতে শিকল তুলিয়া দেওয়া হয়।

'বড় বিপদ, দয়া করে শীগ্‌গির একবার আসবেন?'—এই কথা বলিয়া গণপতিকে ফাঁকি দিয়াছিল একটি লোক, যার বয়স ছিল প্রায় চল্লিশ, পরনে ছিল কোঁচানো ধুতি, সিল্কের পাঞ্জাবি আর পালিশ করা ডার্বি শু। গোঁফ দাঁড়ি কামানো, চোখে পুরু কাঁচের চশমা, বিবর্ণ ফরসা রঙ—লোকটাকে দেখতে নাকি অনেকটা ছিল কলেজের প্রফেসারের মত। (কলেজের প্রফেসার হইলেই মানুষের চেহারা কোন বৈশিষ্ট্য অর্জন করে কিনা গণপতিকে এই কথা জিজ্ঞাসা করা হইলে সে জবাব দিতে পারে নাই, বোকার মত হাঁ করিয়া বিচারকের দিকে চাহিয়া ছিল।) এই লোকটি ছাড়া আরও তিনজন লোককে গণপতি দেখিতে পাইয়াছিল, বাড়ির সরু লম্বা বারান্দাটার শেষে। তিনতলার সিঁড়ির নীচে অন্ধকারে কারা দাঁড়াইয়াছিল। (অন্ধকারে দাঁড়াইয়া থাকিলে গণপতি তাদের দেখিতে পাইল কেমন করিয়া?—বিচারক এই কথা জিজ্ঞাসা করিলে গণপতি কিছুক্ষণ বোকার মত চুপ করিয়া থাকিয়া এমন জবাব দিয়াছিল যে বিচারক সন্দিগ্ধ দৃষ্টিতে তার দিকে তাকাইয়াছিলেন।)

গণপতি যে কৈফিয়ত দিল, সেটা যে একেবারে অসম্ভব—তা অবশ্য বলা যায় না, অমন কত মজার ব্যাপার জগতে ঘটিয়া থাকে। কিন্তু দুঃখের বিষয় আট দশজন দেশ-প্রসিদ্ধ উকীল ব্যারিষ্টারের চেষ্টাতেও এটা ভালমত প্রমাণ করা গেল না। গণপতির ফাঁসির হুকুম হইয়া গেল!

ফাঁসি! বিচারক হুকুমটা দিলেন ইংরেজীতে, বাঙলায় যার মোটামুটি চুম্বক এই যে, গলায় দড়ির ফাঁস পরাইয়া গণপতিকে যথাবিধি ঝুলাইয়া দেওয়া হইবে, যতক্ষণ সে না মরে। তবে হুকুমটা যদি গণপতির পছন্দ না হয়, সে ইচ্ছা করিলে আপীল করিতে পারে।

বুড়া রাজেন্দ্রনাথের ক্ষীণদৃষ্টি চোখ দুটি কাঁদিতে কাঁদিতে প্রায় অন্ধ হইয়া গেল। গণপতির বোনেরা ও বৌদিরা যে কান্নার রোল তুলিল—সমস্ত পাড়ার আবহাওয়াটা যেন তাতে বিষণ্ন হইয়া আসিল। গণপতির বৌ রমার এত ঘন-ঘন মূর্ছা হইতে লাগিল যে, তার যে গাল দুটি লজ্জা না পাইলেও সারাক্ষণ গোলাপের মত আরক্ত দেখাইত, একেবারে কাগজের মত ফ্যাকাশে বিবর্ণ হইয়া রহিল। গণপতির বিধবা পিসী ঠাকুরঘরে এত জোরে মাথা খুঁড়িলেন যে ফাটা কপালের রক্তে চোখের জল তাহার খানিক খানিক ধুইয়া গেল।

যথাসময়ে করা হইল আপীল।

অনেক চেষ্টা ও অর্থব্যয়ের দ্বারা গণপতির পক্ষে আরও কয়েকটি সাক্ষী এবং প্রমাণও সংগ্রহ করা হইল। তার ফলে, সন্দেহের সুযোগে গণপতি পাইল মুক্তি। যে লোকটিকে খুন করার জন্য গণপতির ফাঁসির হুকুম হইয়াছিল, তাহাকে কে বা কাহারা খুন করিয়াছে—পুলিস তাহারই খোঁজ করিতে লাগিল।

বাড়ি ফিরিবার অধিকার জুটিল অপরাহ্নে—আকাশ ভরিয়া তখন মেঘ করিয়াছে। অপরাহ্নে খুব ঘটা করিয়া মেঘ করিলে মনে হয় বইকি যে, এ আর কিছুই নয়, রাত্রিরই বাড়াবাড়ি। গণপতির কান্না আসিতেছিল। আনন্দে নয়, শ্রান্তিতে নয়, বিগলিত মানসিক ভাবপ্রবণতার জন্য নয়, সম্পূর্ণ অকারণে—একটা চিন্তাহীন শুষ্ক অন্যমনস্কতায়। বন্ধু-বান্ধবের হাত এড়াইয়া সে পশুপতির সঙ্গে ব্যারিষ্টার মিষ্টার দে'র মোটরে উঠিয়া বসিল। মোটরের কোণে গা এলাইয়া দিয়া পশুপতি ফোঁস করিয়া ফেলিল একটা নিঃশ্বাস, তারপর নিজেই মিষ্টার দে'র পকেটে হাত ঢুকাইয়া মোটা একটা সিগার সংগ্রহ করিয়া সাদা ধবধবে দাঁতে কামড়াইয়া ধরিল। মিষ্টার দে একগাল হাসিয়া বলিলেন,—যাক্।

কি যে তাঁহার যাওয়ার অনুমতি পাইল বোঝা গেল না। হয়ত গণপতির দুর্ভোগ, নয়ত অসংখ্য মানুষের পাগলামিভরা দিনটা—আর নয়ত পশুপতি যে সিগারটা ধরাইয়াছে—তাই। গণপতি পাংশু মুখ তুলিয়া একবার তাহার পরিতৃপ্ত উদার মুখের দিকে চাহিল, তারপর তাড়াতাড়ি মুখ ফিরাইয়া লইল বাহিরের

দিকে, একবার এই গাড়িতেই সে মিষ্টার দে'র সঙ্গে বসিয়াছিল, কোথায় যাওয়ার জন্ত আজ সে কথা ঠিক মনে নাই। গাড়ি ছাড়িবার আগে মিষ্টার দে হঠাৎ হাত বাড়াইয়া ফুটপাথের একটা ভিখারীর দিকে একটা আনি ছুঁড়িয়া দিয়াছিলেন। দানের পুণ্য আলোর মত সেদিন যেভাবে মিষ্টার দে'র মুখখানিকে উদ্ভাসিত করিয়া তুলিয়াছিল, আজ জীবনদানের পুণ্য ত তার চেয়ে প্রখর জ্যোতির রূপ লইয়া ফুটিয়া নাই! অবিকল তেমনি মুখভঙ্গী মিষ্টার দে'র—ভিখারীকে একটা আনি দিয়া তিনি যেমন করেন।

মানুষের অনুভূতির জগতের রীতিই হয়ত এইরকম—মুড়িমুড়কির এক দর! জীবন ফিরিয়া পাইয়া তার নিজেরও তেমন উল্লাস হইল কই? জীবনের কত অসংখ্য ছোট ছোট পাওনা তাকে এর চেয়ে শতগুণে উত্তেজিত করিয়াছে, নিবিড় শান্তি দিয়াছে, আনিয়া দিয়াছে দীর্ঘস্থায়ী মনোরম উপভোগ! সুদীর্ঘ ভবিষ্যৎ ব্যাপিয়া বাঁচিয়া থাকিবার প্রত্যর্পিত অধিকারটা যত ভাবে যত দিক দিয়াই সে কল্পনা করিবার চেষ্টা করুক, জ্যোৎস্নালোকে ছাদে বসিয়া রমার সঙ্গে এক মিনিট কথা বলিবার কল্পনা তার চেয়ে কত ব্যাপক, কত গাঢ়তর রসে রসালো!

দু'ভাইকে বাড়ির দরজায় নামাইয়া দিয়া মিষ্টার দে চলিয়া গেলেন। তখন ঝম ঝম করিয়া বৃষ্টি নামিয়াছে। গাড়ি-বারান্দার সিঁড়িতে বাড়ির সকলে ভিড় করিয়া দাঁড়াইয়া ছিল; বৃষ্টি না নামিলে হয়ত প্রতিবেশীরাও অনেকে আসিত। গণপতি নামিয়া প্রথমে রাজেন্দ্রনাথকে প্রণাম করিবে, পিসীমা তাই সে-পর্যন্ত ধৈর্য ধরিয়া রহিলেন। গণপতির প্রণাম শেষ হইতেই তাহাকে বুকে জড়াইয়া ধরিয়া হুহু করিয়া কাঁদিয়া উঠিলেন। এ কান্না অবশ্য অপ্রত্যাশিত নয়, সকলেই জানিত পিসীমা এমনিভাবে কাঁদিবেন। তাই খানিকক্ষণ সকলেই চুপচাপ দাঁড়াইয়া থাকিয়া তাঁহাকে কাঁদিতে দিল। গণপতির কেমন একটা অস্বাভাবিক লজ্জা বোধ হইতেছিল। বাড়ি আসিবার জন্ত মিষ্টার দে'র গাড়িতে উঠিয়া কাঁদিবার যে জোরালো ইচ্ছা তাহার হইয়াছিল, হঠাৎ কখন তাহা লোপ পাইয়া গিয়াছে। নিজেকে লুকাইতে পারিলে এখন যেন সে বাঁচিয়া যায়। নিজের বাড়িতে আপনার জনের আবেষ্টনীর মধ্যে ক্রন্দনশীলা পিসীমার বক্ষলগ্ন হইয়া থাকিবার সময় জেলখানায় তাহার সেই নিভৃত সেলটির জন্ত গণপতির সমস্ত মনটা লোলুপ হইয়া উঠিয়াছে। মনে হইতেছে, আর কিছুক্ষণ এমনিভাবে কাটিলে তার মাথার মধ্যে একটা কিছু ছিঁড়িয়া যাইবে!

আর কেহ কাঁদিতেছে না দেখিয়া পিসীমা একটু পরে আত্মসম্বরণ করিলেন। তখন পশুপতির স্ত্রী পরিমল বলিল, কি চেহারাই তোমার হয়েছে ঠাকুরপো!

গণপতি গলা সাফ করিয়া মৃদু একটু হাসিয়া বিনয়ের সঙ্গে বলিল, আর চেহারা……?

যার জীবন যাইতে বসিয়াছিল, চেহারা দিয়া সে কি করিবে—এই কথাটাই গণপতি এমনিভাবে বলিতে চাহিয়াছিল; কিন্তু শোনাইল অন্যরকম, মনে হইল, বৌদির স্নেহপূর্ণ উৎকণ্ঠার জবাবে সে যেন ভারী রূঢ় একটা ভদ্রতা করিয়াছে। গণপতিও হঠাৎ তাহা খেয়াল করিয়া মনে মনে অবাক্ হইয়া গেল। এমন শোনাইল কেন কথাটা? রোগ হইয়া যার জীবন যাইতে বসে, সে ভাল হইয়া উঠিলে এমনিভাবে যখন কেহ তাহার চেহারা সম্বন্ধে উৎকণ্ঠা প্রকাশ করে, তখন অবিকল এমনিভাবেই ত জবাব দিতে হয়! চেহারা কেন খারাপ হইয়াছে, উভয়পক্ষেরই যখন তাহা জানা থাকে, চেহারা সম্বন্ধে এই ত তখন বলাবলির রীতি! অথচ আজ এই কথোপকথন তার এতগুলি আপনার জনের কানে গিয়া আঘাত করিয়াছে।

কারণটা গণপতি যেন বুঝিতে পারিল, রোগে যে রোগা হয়, চেহারা খারাপ হওয়ার অধিকার তাহার আছে, সেটা তার দোষ নয়। কিন্তু খুনের দায়ে জেলে গিয়া রোগা হইয়া আসিবার অধিকার এ জগতে কারো ত নাই—সে ত পাপের ফল, অন্যায়ের প্রতিক্রিয়া তার দুর্বল দেহ ও পাংশু মুখ যে শুধু এই কথাটাই ঘোষণা করিতেছে,—অতি লজ্জাকর একটা খুনের দায়ে সে পুলিসের হাতে ধরা পড়িয়াছিল।

মাথাটা ঘুরিতেছিল, গণপতি একবার বিহ্বলের মত সকলের মুখের দিকে চাহিয়া দেখিল। এতক্ষণে তাহার চোখ পড়িল রমার দিকে। আর সকলে তাহার চারিদিকে ভিড় করিয়া আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। রমা কিন্তু কাছে আসে নাই, পাশের লাইব্রেরি ঘরে ঢুকিবার দরজাটার আড়ালে সে পাথরের মূর্তির মত স্তব্ধ হইয়া আছে,—অনেক দূরে··দীর্ঘ ব্যবধানে। চাহিয়া থাকিতে থাকিতে ব্যবধানটা যেন ক্রমেই বাড়িতে লাগিল, তারপর লুপ্ত হইয়া গেল অন্ধকারে।

বাড়ি ফিরিয়া পরিমলের সঙ্গে একটা কথা বলিয়াই গণপতি যে মূর্ছিত হইয়া পড়িয়া গেল—এতে কারো অবাক্ হওয়ার কারণ ছিল না। আহা, প্রায় ছমাস ধরিয়া বেচারা কিরকম সহ্য করিয়াছে! কারাগারের পাষাণ-প্রাচীরের অন্তরালে নিজের জীবন লইয়া ভাগ্যের লটারি খেলার অনিশ্চিত ফলাফলের প্রতীক্ষায়

একাকী দিন কাটানো ত শুধু নয়,—বাহিরের অদৃশ্য জগতের কাছে ঘাড় মোচড়ানো অফুরন্ত কাল্পনিক লজ্জা ভোগ-করাও ত শুধু নয়, গণপতি যে অনেক-গুলি দিন ধরিয়া ফাঁসির দিনও গুণিয়াছে। ফাঁসি! ভাবিতে গেলেও নিরাপদ সহজ মানুষের দম আটকাইয়া আসে না? মূর্ছিত হইয়া পড়িবে বইকি গণপতি! অনেক আগেই তার দুবার মূর্ছা যাওয়া উচিত ছিল। একবার যখন সে নিজের ফাঁসির হুকুম শোনে—আর একবার যখন সে জানিতে পারে, এ জীবনের মত ফাঁসিটা তাহার বাতিল হইয়া গিয়াছে। আশ্চর্যরকম শক্ত মানুষ বলিয়াই না মূর্ছাটা সে এতক্ষণ ঠেকাইয়া রাখিয়াছিল!

সহ্যশক্তি রমারও কম নয়। আজ কতকাল সে খুনী-আসামীর বৌ হইয়া বাঁচিয়া আছে—অপাপবিদ্ধ পবিত্র মানুষের ঘরকন্নার মধ্যে পাড়ার একপাল ভদ্রমহিলার কৌতুক ও কৌতূহল মেশানো সহানুভূতির আকণ্ঠ আবর্তে! কতদিন ধরিয়া সে অহোরাত্রি যাপন করিয়াছে—স্বামীর আগামী ফাঁসির তারিখের বৈধব্যকে ক্রমাগত বরণ করিয়া করিয়া! আপীল যদি না করা হইত—আজ রাত্রি প্রভাত হইলে কারো সাধ্য ছিল না রমাকে বৌ করিয়া রাখে। তবু এখনো, লাইব্রেরি ঘরে ঢুকিবার দরজার আড়ালে পাষাণ-প্রতিমার মত তাহার দাঁড়াইয়া থাকিবার ভঙ্গী দেখিলে অবাক্ হইয়া যাইতে হয়। না আছে চোখে ভয়, না আছে দেহে শিহরণ! পাষাণ-প্রতিমার মতই তার কাঠিন্য যেন অকৃত্রিম। গণপতি যে মূর্ছিত হইয়া পড়িয়া গেল, তাতেও যেন তার কিছু আসিয়া গেল না। এক-পা আগানো দূরে থাক, এক-পা পিছাইয়া লাইব্রেরি ঘরের ভিতরে আত্মগোপন করাটাই সে যেন ভাল মনে করিল। স্বামীর—সত্যবানের মতই যে স্বামী তাহার —মৃত্যুর কবল হইতে ফিরিয়া আসিয়াছে, সেই স্বামীর মূর্ছা ভাঙিবার কি আয়োজন হইল, একবার তাহা চাহিয়া দেখিবার শখটাও অন্ততঃপক্ষে রমার গেল কোথায়? এ কৌতূহল যে মেয়েমানুষ দমন করিতে পারে—ধরিত্রীর মত তার সহ্যশক্তিও সত্যই অতুলনীয়—মৃত ও অসাড়।

মাথায় জল দিতে দিতে অল্পক্ষণ পরেই গণপতির জ্ঞান ফিরিয়া আসিল। জামা কাপড় বদলাইয়া একবাটি গরম দুধ খাইয়া সে সকলের সঙ্গে ভিতরের বড় ঘরে গিয়া বসিল। পশুপতি একবার প্রস্তাব করিয়াছিল যে, গণপতি নিজের ঘরে গিয়া বিছানায় শুইয়া বিশ্রাম করুক। গণপতি নিজেই তাহাতে রাজী হইল না। মূর্ছা ভাঙিবার পর নিজেকে লুকানোর ইচ্ছাটা কি কারণে যেন তাহার কমিয়া গিয়াছে।

অনেক জল ঢালার ফলে মাথাটা বোধ হয় তাহার ঠাণ্ডা হইয়া আসিয়াছিল, সকলের সঙ্গে কথা বলিবার জন্য এতক্ষণে সে একটু একটু আগ্রহই বরং বোধ করিতে লাগিল।

অল্প অল্পে একথা-সেকথা হইতে হইতে কথাবার্তা অনেকটা সহজ হইয়া আসিল। ছমাসের মধ্যে আত্মীয়স্বজন অনেকের সঙ্গেই বহুবার গণপতির দেখা হইয়াছে, তবু সে এমনভাবে কথা বলিতে লাগিল, যেন ওই সময়কার পারিবারিক ইতিহাসটা ঘুণাক্ষরে জানিবার উপায়ও তাহার ছিল না। তিনমাস আগে জেলে বসিয়া পশুপতির কাছে বাড়ির যে ঘটনার কথা শুনিয়া সে নবজাগ্রত বিস্ময় বোধ করিল, এমন কি—যে ব্যাপার এখানে সে স্বয়ং প্রত্যক্ষ করিয়া জেলে গিয়াছিল—পরিমল তার বর্ণনা দিতে আরম্ভ করিলে, আজই যেন প্রথম শুনিতেছে এমনিভাবে শুনিয়া গেল। স্মৃতি, চিন্তা, অনুভূতি, কল্পনা প্রভৃতি গণপতির ভিতরে কমবেশী জড়াইয়া গিয়াছে সত্য, তবু জানা কথা ভুলিবার মত অন্যমনস্কতা ত ফাঁসির আসামীরও আসিবার কথা নয়! কিন্তু এই অভিনয়ই গণপতির ভাল লাগিতেছিল। এমনই উৎসুকভাবে একথা-সেকথা জানিতে চাহিলে এবং তার জবাবে যে যা-ই বলুক গভীর মনোযোগের সঙ্গে তাই শুনিয়া গেলে, ক্রমে ক্রমে তার নিজের ও অন্যান্য সকলেরই যেন বিশ্বাস জন্মিয়া যাইবে—দীর্ঘকালের জন্য সে দূরদেশে বেড়াইতে গিয়াছিল। এতদিন তার গৃহে অনুপস্থিত থাকিবার আসল কারণটা সকলে ভুলিয়া যাইবে।

হয়ত তাই যাইতে লাগিল এবং সেই জন্য হয়ত যখন আবার ওই আসল কারণটা মনে পড়িবার অনিবার্য কারণ ঘটিতে লাগিল, সকলেই যেন তখন হঠাৎ একটু একটু চমকাইয়া উঠিতে লাগিল। গণপতিকে পুলিসে ধরিবার অল্প কিছুদিন আগে মহাসমারোহে তার ছোটবোন রেণুর বিবাহ হইয়াছিল। গণপতি একসময় রেণুর সম্বন্ধে প্রশ্ন করিতে সকলের এমনি সচকিতভাব দেখা গেল! এ ওর মুখের দিকে চাহিল—কিন্তু বয়স্ক কেহ জবাব দিল না। শুধু পশুপতির সাতবছরের মেয়ে মায়া বলিল, পিসীমাকে শ্বশুরবাড়িতে রোজ মারে, কাকা।

গণপতি অবাক্ হইয়া বলিল, মারে?

মায়া বলিল, তুমি মানুষ মেরেছ কিনা তাই জন্তে।

তিন চারজন একসঙ্গে ধমক দিতে মায়া সভয়ে চুপ করিয়া গেল। মনে হইল, ধমকটা যেন গণপতিকেই দেওয়া হইয়াছে। কারণ, মায়ার চেয়েও তার মুখখানা

শুকাইয়া গেল বেশী। আবার কিছুক্ষণ এখন তাহার কারো মুখের দিকে চোখ তুলিয়া চাহিবার ক্ষমতা হইবে না।

পশুপতি গলা সাফ করিল। বলিল, ঠিক যে মারে তা নয়, তবে ওরা ব্যবহারটা ভাল করছে না।

বড় বোন রেণু বলিল, বিয়ের পর সেই যে নিয়ে গেল মেয়েটাকে, এ পর্যন্ত আর একবারও পাঠায় নি। মহী দুবার আনতে গেছলো।

মহীপতি বলিল, 'আমার সঙ্গে একবার দেখা করতেও দেয় নি। বললে—'

রাজেন্দ্রনাথ কাঁপা গলায় বলিলেন, আহা, থাক না ও সব কথা, বাড়িতে ঢুকতে-না-ঢুকতে ওকে ও-সব শোনাবার দরকার কি! ও ত আর পালিয়ে যাবে না!

খানিকক্ষণ সকলে চুপ করিয়া রহিল। বাহিরে বাদল মাঝখানে একটু কমিয়াছিল, এখন আবার আরও জোরের সঙ্গে বর্ষণ শুরু হইয়াছে। ঘরের মধ্যে এখন ভিজা বাতাসের গাঢ়তম স্পর্শ মেলে। রমা এবারও ঘরে আসে নাই, এবারও সে নিজেকে আড়াল করিয়া রাখিয়াছে—পাশের ঘরের দরজার ওদিকে। তবে এবার আর সে দাঁড়াইয়া নাই, মেঝেতে বসিয়াছে। একতলার রান্নাঘর হইতে ডাল সম্বরার গন্ধ ভিজা বাতাসকে আশ্রয় করিয়া আসিয়া এঘরে জমা হইয়াছে, রেণুর বড় মেয়ে শৌখিন সুহাসের অঙ্গ হইতে এসেন্সের যে গন্ধ এতক্ষণ পাওয়া যাইতেছিল তাও ঢাকিয়া গিয়াছে। পিসীমা কয়েক মিনিটের জন্য ঠাকুর-ঘরে গিয়াছিলেন, প্রসাদ ও প্রসাদী ফুলের রেকাবি হাতে তিনি এই সময় ফিরিয়া আসিলেন। সকলের আগে গণপতিকে বলিলেন, জুতো থেকে পা-টা খোল ত বাবা।

জুতার স্পর্শ ত্যাগ করিয়া গণপতি পবিত্র হইলে, পিসীমা প্রসাদী ফুল লইয়া তাহার কপালে ঠেকাইলেন, তারপর হাতে দিলেন প্রসাদ এবং আজও আধা-মমতা আধা-ধমকের সুরে তাঁহার চিরন্তন অনুযোগটা শুনাইয়া দিলেন—ঠাকুরদেবতা কিছু ত মানবি নে, শুধু অনাচার করে বেড়াবি।

এঘরে কেহ কিছু বলিল না; কিন্তু পাশের ঘরের দরজার ওদিক হইতে অস্ফুট কণ্ঠে শোনা গেল, মাগো!

পিসীমা চমকাইয়া বলিলেন, কে গো ওখানে, বৌমা?

পরিমল জিজ্ঞাসা করিল,—কি হল রে, রমা?

রমার আর কোন সাড়াশব্দ পাওয়া গেল না। পরিমলের কোলের ছেলেটি

মেঝেতে হামা দিতে দিতে নাগালের মধ্যে আসিয়া পড়িয়াছিল, গণপতি হাত বাড়াইয়া তাকে কোলে তুলিয়া লইল—ওকে আদর করিবার ছলে মাথা হেঁট করিয়া থাকা সহজ। রাজেন্দ্রনাথ কাঁপা গলায় বলিলেন, ছাখ্ ত সুহাস, মেজ-বৌমার কি হল ? ফিট্-টিট্ হল নাকি ?

পরিমল বলিল, তুই বোস্ আমি দেখছি।

উঠিয়া গিয়া নিচুগলায় রমাকে কি যেন জিজ্ঞাসা-বাদ করিয়া সে ফিরিয়া আসিল ; বলিল, না, কিছু হয় নি।

—কিছু না। একেবারেই কিছু হয় নাই। কি হইবে ওই পাথরের মত শক্ত মেয়েমানুষটার ? এই যে এতকাল গণপতি জেলখানায় আটক ছিল, ফাঁসি-এড়ানোর ভরসা কয়েকদিন আগেও তাহার ছিল না,—রমা কি একদিন আবেগে ভাঙিয়া পড়িয়াছিল, কাঁপিতে কাঁপিতে কাঁদিতে কাঁদিতে ননদ, জা কারো বুকে একবার আশ্রয় খুঁজিয়াছিল, কারোকে টের পাইতে দিয়াছিল—তার কিছুমাত্র সান্ত্বনার প্রয়োজন আছে ? একথা সত্য যে, যেদিন হইতে গণপতিকে পুলিসে ধরিয়াছিল, সেদিন হইতে সে হাসিতে ভুলিয়া গিযাছে, দিনের-পব-দিন কথা কমাইয়া প্রায় বোবা হইয়া গিয়াছে, রোগা হইতে হইতে সোনার বরণ তাহার হইয়া গিয়াছে কালি ! তা, সেটা আব এমন কি বেশী ! দুঃখের ভাগ ত সে দেয় নাই, সান্ত্বনা ত নেয় নাই, লুটাইয়া বুকফাটা কান্না ত কাঁদে নাই !

একদিন বুঝি কাঁদিয়াছিল। শুধু একদিন !

গভীর রাত্রে বাড়ির সকলে তখন ঘুমাইয়া পড়িয়াছে,—সুহাস ছাড়া। সেদিন সুহাসের বর আসিয়াছিল, তাই বর-বউ দুজনেরই হইয়াছিল অনিদ্রা-রোগ। অত রাত্রে ঘর ছাড়িয়া বাহির হইয়া দুজনে হাত ধরাধরি করিয়া রমার ঘরের সামনে দিয়া তাদের কোথায় যাওয়ার প্রয়োজন হইয়াছিল—সে কথা বলা মিছে। নিজের ঘরে বমা একা থাকিত, এখনো তাই থাকে। অনেক বলিয়া—অনেক বকিয়াও তাকে কারো সঙ্গে শুইতে রাজী করা যায় নাই। এমন কি শ্বশুরের অনুরোধেও না।

যাই হোক, রমার ঘরের সামনে সুহাস থমকিয়া দাঁড়াইয়াছিল। কান পাতিয়া ঘরের মধ্যে বিশ্রী একটা গোঙানির আওয়াজ শুনিয়া ভয়ে বেচারীর স্বামী-সোহাগে তাতানো দেহটা হইয়া গিয়াছিল হিম। বরকে ঘরে পাঠাইয়া, তারপর সে ডাকিয়া তুলিয়াছিল পরিমলকে ; বলিয়াছিল, বড়মামী, ঘরের মধ্যে মেজমামী গোঙাচ্ছে, শীগ্গির এসো।

—গোঙাচ্ছে? ডাক্ ডাক্ তোর মামাকে ডেকে তোল, সুহাস!—কি হবে মা গো!

পশুপতিকে পিছনে করিয়া পা টিপিয়া টিপিয়া গিয়া পরিমল খানিকক্ষণ রুদ্ধ দরজায় কান পাতিয়া রমার গোঙানি শুনিয়াছিল। তারপর জোরে জোরে দরজা ঠেলিয়া ডাকিয়াছিল, মেজ-বৌ! ও মেজ-বৌ, শীগ্‌গির দরজা খোল।

প্রথম ডাকেই গোঙানি থামিয়া গিয়াছিল, কিন্তু তারপর অনেক ডাকাডাকিতেও রমা প্রথমে সাড়া দেয় নাই। শেষে ধরা গলায় বলিয়াছিল,—কে?

আমি। দরজা খোল ত মেজ-বৌ, শীগ্‌গির।

—কেন দিদি?

পরিমল অবশ্য সে কৈফিয়ত দেয় নাই, আরও জোরে ধমক দিয়া আবার দরজাই খুলিতে বলিয়াছিল। রমারও আর দরজা না খুলিয়া উপায় থাকে নাই।

—কি হয়েছে দিদি?

—তুই গোঙাচ্ছিলি কেন রে, মেজ-বৌ?

রমা বিস্ময়ের ভান করিয়া বলিয়াছিল, গোঙাচ্ছিলাম? কে বললে?

বারান্দার আলোয় রমার মুখে চোখের জলের দাগগুলি স্পষ্টই দেখা যাইতেছিল। একটু থামিয়া ঢোক গিলিয়া পরিমল বলিয়াছিল—'আমি নিজে শুনেছি, তুই তবে কাঁদছিলি?'

—না কাঁদিনি ত! কে বললে কাঁদছিলাম?—বলিয়া পশুপতির দিকে নজর পড়ায় রমা লম্বা ঘোমটা টানিয়া দিয়াছিল।

তখন পরিমল বলিয়াছিল, আমি আজ তোর ঘরে শোব রমা?—

রমা বলিয়াছিল,—কেন?

কি কৈফিয়তই যে মেয়েটা দাবি করিতে জানে!—অফুরন্ত!

পরিমল ইতস্ততঃ করিয়া বলিয়াছিল,—ভয়টয় যদি পাস—

রমা বলিয়াছিল,—ভয় পাব কেন? আমার অত ভয় নেই,···বড্ড ঘুম পাচ্ছে দিদি।

বলিয়া সকলের মুখের উপর দরজা বন্ধ করিয়া দিয়াছিল। কি রূঢ় ব্যবহার! মনে করলে আজও পরিমলের গা জ্বালা করে।

যাই হোক তারপর হইতে রাত্রে বাহিরে গেলে বাড়ির অনেকেই চুপি চুপি

রমার ঘরের দরজায় কান পাতিয়া ভিতরের শব্দ শুনিবার চেষ্টা করিয়াছে। কিন্তু আর কোন দিন কিছু শোনা যায় নাই।

শোনা যাইবে কি, রমা কি সহজ মেয়ে! হোক না স্বামীর ফাঁসি, সে দিব্যি মস্ত একটা ঘরে সারারাত একা নাক ডাকাইয়া ঘুমাইতে পারে। আজ হঠাৎ অস্ফুটস্বরে একবার 'মা গো' বলিয়া ফেলিয়াছে বলিয়াই ওর যে কিছু হইয়াছে—একথা মনে করিবার কোন প্রয়োজন নাই!

মিষ্টার দে'র কড়া সিগার টানিয়া পশুপতির বোধ হয় গলাটা খুসখুস করিতেছিল, সে আর একবার গলা সাফ করিয়া বলিল, রেণুর জন্য তুমি ভেব না গণু। ওকে আসতে দেয়নি বটে, কিন্তু ওকে কষ্ট ওরা দেয় না।

বিবাহের পর প্রথম শ্বশুরবাড়ি গিয়া আর আসিতে না দিলে, ষোল বছরের মেয়েকে কষ্ট দেওয়া হয় কিনা, গণপতি ধারণা করিয়া উঠিতে পারিল না; কিন্তু বোনটার জন্য তার নিজের বড় কষ্ট হইতে লাগিল। মৃদুস্বরে সে বলিল, ওকে একটা তার করে দিলে হত না?

পশুপতি বলিল,—তোমার কথা? থাকগে, কাজ নেই, কি আর হবে ওতে? মাঝখান থেকে বাড়ির লোকে হয়ত অসন্তুষ্ট হবে। কাল খবরের কাগজেই সব পড়তে পারবে।

খবরের কাগজ? তা ঠিক, খবরের কাগজে কাল সব খবরই বাহির হইবে বটে। কিন্তু রেণু কি খবরের কাগজ পড়িতে পায়? ভাই খুনের দায়ে ধরা পড়িয়াছে বলিয়া অতটুকু মেয়েকে যারা আটক করিয়া রাখিতে পারে—এতখানি উদারতা কি তাদের হওয়া সম্ভব? গণপতি পরিমলের ছেলেকে মেঝেতে নামাইয়া দিয়া বলিল, তবু আপীলের ফলটা আগে থাকতে জানতে পারলে—

রাজেন্দ্র বলিলেন, তাই বরং দাও পশু, রেণুর শ্বশুরকে একটা তার ক'রে দাও। লিখে দিও 'প্লিজ ইনফর্ম রেণু'—নয়ত সে ব্যাটা হয়ত মেয়েটাকে কিছু জানাবে না।

তার লিখিতে পশুপতি আপিস ঘরে গেল।

মানুষের মধ্যে খোঁজ করিলে সব সময়েই মানুষকে খুঁজিয়া পাওয়া যায়, পাশবিকতা দিয়া হোক, দেবত্ব দিয়া হোক, কে নিজেকে সম্পূর্ণ ঢাকিয়া রাখিতে পারে? বত্রিশ বছর যে পরিবারে গণপতি সহজ স্বাভাবিক জীবনযাপন করিয়াছে, আজ সেখানে একটা বীভৎস অসাধারণত্ব অর্জন করিয়া ফিরিয়া আসিয়া সে

যে বিশেষভাবে অনুসন্ধিৎসু হইয়া উঠিবে এবং এতগুলি মানুষের মধ্যে ক্রমাগত মানুষকে খুঁজিয়া পাইতে থাকিবে—তাতে আশ্চর্যের কিছু নাই। পলকে পলকে সে টের পাইতে লাগিল, এরা ভুলিতে পারিতেছে না। বিচার নয়, বিশ্লেষণ নয়, বিরাগ অথবা ক্ষমাও নয়, শুধু স্মরণ করিয়া রাখা—স্মরণ করিয়া রাখা যে, তাদের এই গণপতির অকথ্য কলঙ্ক রটিয়াছে, দেশের ও দশের কাছে সে পরিবারের মাথা হেঁট করিয়া দিয়াছে। আইনের আদালতে ভালরকম প্রমাণ না হোক, মানুষের আদালতে তার পাশবিকতা প্রমাণিত হইয়া গিয়াছে। ফাঁসির হুকুম রদ হোক, এ ব্যাপারের এইখানে শেষ নয়, এখনও অনেক বাকী,—অনেক মন ও মানের লড়াই! প্রত্যেকের ভিতরের মানুষটি এই অনিবার্য ক্ষতি ও বিপদের চিন্তায় ভীত ও বিমর্ষ হইয়া আছে, এই যে মানুষ, ভিতরের মানুষ, এ বড় দুর্বল, বড স্বার্থপর—তাই এ কথাটাও কে না ভাবিয়া থাকিতে পারিয়াছে যে, এর চেয়ে ফাঁসি হইয়া গেলেই অনেক সহজে সব চুকিয়া যাইতে পারিত! যে নাই, কত কাল কে তার কলঙ্ককাহিনী মনে করিয়া রাখে? মনে করিয়া রাখিলেই বা কি? গণপতি না থাকিলে, এ বাড়িতে কেন তার কলঙ্কের ছায়াপাত হইবে? সেটা নিয়ম নয়। লোকে শুধু এই পর্যন্ত ভাবিতে পারিত যে, এ বাড়িতে একটা বদলোক থাকিত, যে একটা স্ত্রীলোকঘটিত অপরাধে জড়িত হইয়া একটা মানুষ খুন করিয়া ফেলিয়াছিল—কিন্তু সে লোকটা এখন আব নাই, এই বাড়ির আবহাওয়া এখন আবার পবিত্র, এ বাড়ির মানুষগুলি ভাল।

আর তা হইবার নয়! দুষ্ট মানুষ ঘরে আসিয়াছে, তার দোষে ঘরের আবহাওয়া দূষিত হইয়াছে, দূষিত আবহাওয়া মানুষগুলিকে করিয়াছে মন্দ! অন্ততঃ লোকে ত তাই ভাবিবে।

এত স্পষ্টভাবে না হোক্, মোটামুটি এই চিন্তাগুলিই গণপতির অনুসন্ধান তার মনে আনিয়া দিতে লাগিল। ভাবিতে ভাবিতে সহসা রমার জন্য তার মনে দেখা দিল—গভীর মমতা! জেলে বসিয়া রমার কথা ভাবিয়া তার খুব কষ্ট হইত, কিন্তু সে ছিল শুধু তার দুর্ভাগ্যের কথা ভাবিয়া—রমা যে যাতনা ভোগ করিতেছে, তাই ভাবার কষ্ট! কিন্তু এখন হঠাৎ সে বুঝিতে পারিল, স্বামীর জন্য শুধু ভাবিয়াই রমা রেহাই পায় নাই, নিজের অন্ধকার ভবিষ্যৎটার পীড়ন সহিয়াই তার মহাশক্তির পরীক্ষা শেষ হয় নাই, আরও অনেক কিছু জুটিয়াছে। বাহিরের জগৎ নরঘাতকের স্ত্রীকে যা দেয়! সে সব যে কি এবং সে সব সহ্য করিতে একটি

নিরুপায় ভীরু বধূর যে কতখানি কষ্ট হইতে পারে—ধারণা করিবার মত কল্পনাশক্তি গণপতির ছিল না। যেটুকু সে অনুমান করিতে পারিল—তাতেই বুকের ভিতরটা তাহার তোলপাড় করিতে লাগিল।

নিজেকে সে বুঝাইবার চেষ্টা করিতে লাগিল যে, যাক্, রমার একটা প্রকাণ্ড দুর্ভাবনা ত দূর হইয়াছে! স্বামীকে ফিরিয়া পাইয়া আজ ত মনে তার আনন্দের বান ডাকিয়াছে! এতদিন সে যদি অকথ্য দুঃখ পাইয়াই থাকে—আজ আর সে-কথা ভাবিয়া লাভ কি? প্রতিকারের উপায়ও তাহার হাতে ছিল না যে, রমার দুঃখ কমানোর চেষ্টা না-করার জন্য আজ আপসোস করিলে চলিবে। জেলে বসিয়া রমার দুঃখটা সে ঠিকমত পরিমাপ করিতে পারে নাই; অন্যায় যদি কিছু হইয়া থাকে—তা শুধু এই। তা এ অন্যায়ের জন্য রমার আর কি আসিয়া গিয়াছে! সে বুঝিলেই ত রমার দুঃখ কমিত না।

রাত্রি ন'টার সময় বৃষ্টি বন্ধ হইলে, পাড়ার দু'একজন ভদ্রলোক এবং পাড়ার বাহিরের দু'চারজন বন্ধুবান্ধব দেখা করিতে আসিলেন। পশুপতির ইচ্ছা ছিল, গণপতি আজ কারো সঙ্গে দেখা না করে—সে-ই সকলকে বলিয়া দেয় যে, গণপতির শরীর খুব খারাপ, সে শুইয়া পড়িয়াছে। কিন্তু গণপতি এ কথা কানে তুলিল না, নিচে গিয়া সকলের সঙ্গে দেখা ও বসিয়া আলাপ করিল। রমার কথা নূতনভাবে ভাবিতে আরম্ভ করিবার পর গণপতি নিজের মধ্যে একটা নূতন তেজের আবির্ভাব অনুভব করিতেছিল। সে বুঝিতে পারিয়াছিল, যা-ই ঘটিয়া থাক, ভীরু ও দুর্বলের মত হাল ছাড়িয়া দিলে চলিবে না; নিজের জোরে আবার তাহাকে নিজের পারিবারিক ও সামাজিক জীবনকে গড়িয়া তুলিতে হইবে। ভূমিকম্পে বাড়ি অল্পবিস্তর জখম হইয়াছে বলিয়া মাঠে বাস করিলে ত তাহার চলিবে না? বাড়িটা আবার মেরামত করিয়া লইতে হইবে। লজ্জায় সে যদি এখন মুখ লুকায়, তার লজ্জার কারণটা যে লোকে আরও বেশী সত্য বলিয়া মনে করিতে আরম্ভ করিবে, আরও বড় বলিয়া ভাবিতে থাকিবে।

যাঁরা আসিয়াছিলেন, গণপতির মুক্তিতে আনন্দ জানানোর ছলে কৌতূহল মিটাইতেই তাঁদের আগমন। গণপতির সঙ্গে কথা বলিয়া সকলে একটু অবাক্ হইয়াই বাড়ি গেলেন। মানুষটা ভাঙিয়া-চুরিয়া গিয়াছে সন্দেহ নাই, কিন্তু খুব যে নিচে নামিয়াছে—কারো তা মনে হইল না। সে নিজেই একরকম চেষ্টা করিয়া প্রথম আলাপের আড়ষ্টতা কাটাইয়া আনিল। বেশী বকিল না। বেশী গম্ভীর

হইয়া থাকিল না, গোঁয়ারের মত ফাঁসির হুকুম পাওয়ার ব্যাপারটাকে অবহেলা করিয়া একেবারে উড়াইয়াও দিল না, আবার এমন ভাবও দেখাইল না যে, ফাঁসির হাত এড়ানোর আনন্দে বিগলিত হইয়া পড়িয়াছে! ভগবান ত আছেন, বিনা দোষে একজনকে তিনি শাস্তি দিতে পারেন?—এমন আশ্চর্য সরলতার সঙ্গে এমনভাবে গণপতি একবার এই কথাগুলি বলিল যে, শ্রোতাদের মনে তার প্রতি সত্য সত্যই একটু শ্রদ্ধার ভাব দেখা দিল, মনে হইল—আসিবার সময় লোকটার সম্বন্ধে যে ধারণা তাদের ছিল, লোকটা হয়ত সত্যই অতটা খারাপ নয়।

আগন্তুকদের মধ্যে এই পরিবর্তনটুকু টের পাইতে গণপতির বাকী রহিল না। জয়ের গর্বে ও আশার আনন্দে তার বুক ভরিয়া গেল। এবার তাহার বিশ্বাস হইতে লাগিল যে, সে পারিবে, তার ভাঙা মান-সম্ভ্রমকে আবার সে নিটোল করিয়া গড়িয়া তুলিতে পারিবে। তার নামে চারিদিকে যে ঢি-ঢি শব্দ পড়িয়া গিয়াছে—ক্রমে ক্রমে একদিন সে শব্দ ক্ষীণ হইতে ক্ষীণতর হইয়া আসিয়া একেবারে মিলাইয়া যাইবে। তার সম্বন্ধে ঘৃণা ও অশ্রদ্ধার ভাব মরিয়া গিয়া মানুষের মনে আবার জাগিয়া উঠিবে প্রীতি ও শ্রদ্ধা—মানুষের মাঝখানে মানুষের মত বাঁচিয়া থাকিতে আর তার কোন অসুবিধা থাকিবে না।

রাত্রি বাড়িয়া যাইতেছিল, বাহিরের সকলে চলিয়া গেলে, গণপতি আর বেশী দেরি না করিয়া সামান্য কিছু খাইয়া নিজের ঘরে শুইতে গেল। নবজীবনের স্থচনা করিতে বাহিরের কয়েকটি লোকের কাছে খানিক আগে সে সাফল্যলাভ করিয়াছিল, তখনও তার মন হইতে তার মাদকতাভরা মোহ কাটিয়া যায় নাই এবং খানিক পরে সেই জন্যই রমার সঙ্গে তার বাধিল বিবাদ।

বিবাদ? এমন প্রত্যাবর্তনের পর রমার সঙ্গে প্রথম দেখা হওয়ার রাত্রে—বিবাদ? হয়ত ঠিক তা নয়; কিন্তু রমা ঘরে আসিবার ঘণ্টাখানেক পরে দুজনের মধ্যে যে সব কথার আদান প্রদান হইল, সেগুলি বিবাদের মতই একটা কিছু হইবে।

আবেগে উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিবার সাহস দুজনের কাহারো ছিল না। ঘরে ঢুকিয়া রমা তাই যেমন ধীর-পদে তার কাছে আসিল—সেও তেমনি ধীর ভাবেই তাহাকে বুকের মধ্যে গ্রহণ করিল। রমার ওজন অর্ধেক হাল্কা হইয়া গিয়াছিল, কিন্তু গণপতি সেটা ভাল রকম টের পাইল না। তার গায়ের জোরও যে অর্ধেক কমিয়া গিয়াছে!

রমার দুচোখ দিয়া আস্তে আস্তে জলের ফোঁটা নামিতেছিল। খানিকক্ষণ পরে সে বলিল, তোমায় ফিরে পাব ভাবি নি।

গণপতি তার মাথাটা কাঁধের পাশে চাপিয়া ধরিয়া বলিল, আমিও ভাবি নি আবার এ-ঘরে তোমার কাছে ফিরে আসতে পাব।

শুধু রমার কাছে নয়, এ-ঘরে রমার কাছে ফিরিয়া আসিবার সাধ! রমাকে দেখিবার ফাঁকে ফাঁকে এখনো গণপতি ঘরখানাকেও দেখিতেছিল। প্রায় কিছুই বদলায় নাই ঘরের! বাগানের দিকে দুটি জানালার কাছে, যে-খানে যে-ভাবে খাট পাতা ছিল—আজও সেইখানে তেমনিভাবে পাতা আছে। ও-কোণে দেওয়ালে বসানো আলোটার ঠিক নিচে রমার প্রসাধনের টেবিল,—ছমাস কি সে প্রসাধন করিয়াছিল? এখানে খাটে বসিয়া আজও আয়নাটাতে তাদের প্রতিবিম্ব দেখা যাইতেছে: রমা আগে মাঝে মাঝে কৌতুক করিয়া জিজ্ঞাসা করিত, ওরা কে গো? আমাদের দেখছে না ত? দেওয়ালে তাদের বিবাহের বেশে তোলা এবং এ-বাড়ির ও রমার বাড়ির কয়েকজনের ফটো টাঙানো আছে। কেবল পুরানো যে তিনটি দামী ক্যালেণ্ডার ছিল তার একটির বদলে আসিয়াছে দুটি সাধারণ ছবিওয়ালা ক্যালেণ্ডার। তার অনুপস্থিতির সময়ের মধ্যে একটা বছর কাবার হইয়া গিয়া নতুন একটা বছর যে আরম্ভ হইয়া গিয়াছে! আরও একটা পরিবর্তন হইয়াছে ঘরের। ঘরের ঔজ্জ্বল্য কমিয়া গিয়াছে। মেঝেটা সে-রকম ঝকঝকে নেই, ফটো আর ছবিগুলিতে অল্প অল্প ধূলা আর ঝুল পড়িয়াছে, চারিদিকে আরও যেন আসিয়া জুটিয়াছে কত অদৃশ্য মলিনতা।

কি দেখছ?—রমা এক সময় জিজ্ঞাসা করিল। প্রায় একঘণ্টা পরে।

গণপতি বলিল, ঘর দেখছি।

রমা বলিল, ঘর দেখে আর কি হবে? এ ঘরে ত আমরা থাকব না।

—থাকব না? কোন্ ঘরে যাব তবে?

—আমরা চলে যাব।

রমা বিছানায় নামিয়া একটু সরিয়া ভাল করিয়া বসিল। বিবাদ শুরু হইয়া গিয়াছে।

গণপতি একটু বিস্মিত হইয়া বলিল,—কোথায় চলে যাব রমা?...

অনেক বিনিদ্র রাত্রি ব্যাপিয়া রমা এ প্রশ্নের জবাব ভাবিয়া রাখিয়াছে, সে সঙ্গে সঙ্গে জবাব দিল, যে দিকে দুচোখ যায়,—অনেক দূর অচেনা দেশে, কেউ যেখানে

আমাদের চেনে না, নাম-ধাম জানে না—সেখানে গিয়ে আমরা বাসা বাঁধব। আজ রাত্রেই সব বেঁধে-ছেঁদে রাখি, কাল সকাল সকাল বেরিয়ে পড়ব, কেমন? আর একটা দিনও আমি এখানে থাকতে পারব না।

গণপতি বোকার মত জিজ্ঞাসা করিল,—কেন?…

রমা স্থির দৃষ্টিতে চাহিয়া থাকিয়া বলিল, বুঝতে পারছ না? সবাই আমাদের ঘেন্না করবে—আমরা এখানে থাকব কি করে?

এমনিভাবে শুরু হইল তাহাদের কথা-কাটাকাটি! গণপতি বলিল যে, এমন পাগলের মত কি কথা বলিতে আছে, বাড়ি-ঘর আত্মীয়স্বজন অর্থোপার্জন সব ফেলিয়া গেলেই কি চলে? কি-ই বা দরকার যাওয়ার? দু'চারদিন লোকে হয়ত একটু কেমন কেমন ব্যবহার করিতে পারে, তারপর সব ঠিক হইয়া যাইবে। এত ভাবিতেছে কেন রমা? বিবাদ করার মত করিয়া নয়, আদর করিয়া—খুব মিষ্টি ভাষাতেই গণপতি তাহাকে কথাগুলি বুঝাইবার চেষ্টা করিতে লাগিল। বাহিরের ঘরে, বাহিরের কয়েকটি লোকের মন হইতে অশ্রদ্ধার ভাব সে যে মোটে আধঘণ্টার চেষ্টাতে প্রায় দূর করিয়া দিয়াছিল, একথা গণপতি কিছুতেই ভুলিতে পারিতেছিল না। দেশ ছাড়িয়া চিরদিনের জন্য বহু দূরদেশে—অজানা লোকের মাঝে আত্মগোপন করিয়া থাকিবার ইচ্ছাটা রমার, তাই তার মনে হইতেছিল ছেলেমানুষি।

রমা শেষে হতাশ হইয়া বলিল,—যাবে না?

গণপতি তাহাকে বুকে টানিয়া আনিল, সস্নেহে তাহার পাংশু কপোলে চুম্বন করিয়া বলিল,—যাব না বলেছি, পাগলি? চল না দুজনে দুচার মাসের জন্য কোথা থেকে বেড়িয়ে আসি।

রমা অসহিষ্ণুভাবে মাথা নাড়িয়া বলিল, দুচার মাসের জন্য আমি কোথাও যাব না। চিরদিনের জন্যে।

—আচ্ছা, কাল এসব কথা হবে রমা।

—না, আজকে বল যাবে কিনা, এখুনি বল। কাল ভোরে উঠে আমরা চলে যাব।

গণপতি এবার হাসিয়া ফেলিল। বলিল,—আচ্ছা, তোমার কি হয়েছে বল ত? এমন করে কেউ কখনো যায়? রমা নিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিল,—আচ্ছা, তবে থাক।

গণপতি আরও খানিকক্ষণ তাহাকে আদর করিল, আরও খানিকক্ষণ বুঝাইল। কিন্তু দুর্বল শরীরটা তাহার শ্রান্তিতে ভাঙিয়া পড়িতেছিল, তাই আধঘণ্টাখানেক পরে ছেলেমানুষ বৌকে আদর করা ও বোঝান দুটাই যথেষ্ট হইয়াছে মনে করিয়া সে ঘুমাইয়া পড়িল।

পরদিন সকালে রাজেন্দ্র উকীলের বাড়িতে একটা বিরাট হইচই শোনা গেল। বাড়ির মেজবৌ রমা নাকি গলায় ফাঁসি দিয়া মরিয়াছে।

ভূমিকম্প

মাঝরাত্রে বাসুকি একবার মাথা নাড়িলেন।

প্রসন্ন অঘোরে ঘুমাইতেছিল। কাল গরমে তাহার ভাল ঘুম হয় নাই, আজ ন'টা বাজিতে-না-বাজিতে তাহার চোখ জড়াইয়া আসিতেছিল। খাইয়া উঠিয়া দশ মিনিট কালও সে আজ বসিতে পারে নাই। অমন চাঁদ উঠিয়াছিল আজ, টুকরা টুকরা গতিশীল মেঘে অমন অপরূপ হইয়া উঠিয়াছিল আকাশ, ওদিকে তাকাইবার অবসরও তাহার ছিল না। চোখে ঘুম লইয়া সে শুইয়াছিল এবং শোয়ামাত্র ঘুমাইয়াছিল।

তারপর মাঝরাত্রে প্রকৃতির এই কাণ্ড।

প্রসন্নের ঘুম ভাঙিল আতঙ্কে। তখন চাঁদ অস্ত গিয়াছে, ঘরের ভিতর অন্ধকার এমন গাঢ় যে চোখের পাতাটি পর্যন্ত দেখা যায় না। চৌকিটা বেতালে দুলিতেছে, টিনের চালে ঝনঝন শব্দ উঠিয়াছে, বাহিরের আকাশ শঙ্খের আর্তনাদে মুখর। কোণ ছিঁড়িয়া মশারির একটা দিক্ গায়ে আসিয়া পড়িয়াছে। হঠাৎ ঘুম ভাঙিয়া বুঝিবার জো নাই যে এই কোমল অবাধ্য আলিঙ্গন মশারিরই, একটা নাম-না-জানা ভয়ানক কোন কিছুর নয়।

প্রসন্নের মনে হইল, সে মরিয়া গিয়াছে। ভয়ের এতগুলি সমন্বয় মানুষের জীবনে বাঁচিয়া থাকিতে ঘটে না।

হঠাৎ প্রসন্ন সচেতন হইয়া উঠিল, কে যেন উঠানে তারস্বরে হাঁকিতেছে, 'প্রসন্ন ওঠ্ শীগ্‌গির, ভূমিকম্প হচ্ছে। ওরে প্রসন্ন, প্রসন্ন ?'

ভয়ের মধ্যে পলায়নের প্রেরণা থাকে, কত যুগযুগান্ত ধরিয়া যে ভয়ের আগে আগে সে পলাইয়া বেড়াইতেছিল তাহার ঠিকানা নাই, কিছু না জানিয়া কিছু না বুঝিয়া ও-ভাবে পালানোর মত ভয়ানক আর কিছু নাই, এবার প্রসন্ন বাঁচিল। মশারির আলিঙ্গন ছাড়াইয়া সে চৌকির নিচে নামিয়া পড়িল।

কিন্তু পলাইতে আরম্ভ করার মধ্যে যে পরিত্রাণ নাই সে কথা বোঝা গেল মুহূর্তের মধ্যেই। প্রসন্ন দরজা খুঁজিয়া পাইল না। তাহার ধারণামত যেখানে দরজা থাকার কথা, সেখানটা হাতড়াইয়া শুধু দরমার বেড়াই তাহার হাতে

ঠেকিল। আজ এই একান্ত অসময়ে সে দরজার অবস্থান ভুলিয়া গিয়াছে। এ কি অসহায় অবস্থা!

ভূমিকম্পের চেয়ে হৃৎকম্পই এবার তাহার বড় বিপদ হইয়া উঠিল। মাটির সঙ্গে কাঁপিতে গিয়া সাজানো ইটের বাড়ি যেভাবে ভাঙিতে থাকে, প্রসন্ন তেমনি ভাবে ভাঙিয়া পড়িতে লাগিল। নাড়া খাইয়া তাহার মগ্ন চেতনা হইতে যে কত দুঃখ, ভয় ও উত্তেজনার তলানি উঠিয়া আসিয়া তাহার বর্তমান আতঙ্কের সঙ্গে মিশিয়া গেল তাহার হিসাব হয় না।

বাহিরে শঙ্খের শব্দ, হুলুধ্বনি ও আত্মীয়স্বজনের ব্যাকুল ডাকাডাকির বিরাম নাই। পৃথিবীর যেখানে যত মমতা আছে, সব যেন তাহার বিপদে একসঙ্গে আপসোস জুড়িয়া দিয়াছে, সে বাহির হইতে না পারিলে শেষ পর্যন্ত ওদের বুকও তাহার বুকের মতই ভাঙিয়া যাইবে।

'দরজা কই, দরজা?'

'এইখানে দরজা, এইখানে—' মার হাতের বালা ঠকাঠক্ শব্দে দরজায় মাথা খুঁড়িতে লাগিল।

প্রসন্ন দরজা খুলিয়া বাহির হইয়া আসিল। বাঁচিবার অনন্ত অবকাশ লইয়া উঠানের কোণে ভাঙা চৌকিটাতে সে বসিয়া পড়িল। এই রুক্ষ-কঠোর মাটির পৃথিবীর সঙ্গে অসমান যুদ্ধে সে জয়লাভ করিয়াছে, কিন্তু সে দারুণ আহত।

সেই ভূমিকম্পের পর প্রায় দুই বৎসর পর্যন্ত প্রসন্নের মস্তিষ্কে একটা অদ্ভুত ব্যাপার ঘটিতে লাগিল। বসিয়া থাকিতে থাকিতে হঠাৎ উঠিয়া দাঁড়াইলে, অন্যমনস্ক অবস্থায় হঠাৎ কেহ জোরে নাম ধরিয়া ডাকিলে তাহার মাথার মধ্যে একটা কালো পর্দা দুলিতে আরম্ভ করে। পর্দাটির প্রান্তগুলি পর পর অন্ধকার দিয়া দরমার বেড়ার মত করিয়া বোনা এবং ঝাপসা অন্ধকারের দেয়ালে আটকানো। দুই হাতে চোখ রগড়াইয়া জোরে জোরে মাথায় ঝাঁকুনি দিয়া পর্দা সরানো যায় না, অতীত-জীবনের চেনা অথচ অজানা রহস্যের মত দুলিতে থাকে। চেষ্টা স্থগিত করিলে হঠাৎ এক সময় পর্দাটা অন্তর্হিত হইয়া যায়। আশ্চর্য এই, তখন আর পর্দাটির ভূতপূর্ব অস্তিত্বে প্রসন্ন বিশ্বাস করে না। মাথার মধ্যে যে মাঝে মাঝে তাহার অমন খাপছাড়া অভিনয় হয়, সে কথাটাও সে বেশ ভুলিয়া থাকে।

বছর দুই পরে চাকরির চেষ্টায় একবার মাদ্রাজ ঘুরিয়া আসিয়া পর্দাটা তাহার মাথা ছাড়িয়া চলিয়া গেল। কিন্তু রাখিয়া গেল অন্য উপসর্গ।

মাদ্রাজ যাওয়ার সময় তাহার সঙ্গে একটি স্যুটকেসে খান-দুই ধুতি ও একটি জামা ছিল, ওই সামান্য জিনিস চুরি যাওয়ার ভয়ে সমস্ত পথ সে চোখ বুজিতে পারে নাই। রূপান্তর লইয়া এই ভয় তাহার মনে কায়েমী হইয়া রহিল। প্রত্যেক রাত্রে সমস্ত রাত্রির জন্য নিজের অচেতন অসহায় অবস্থার কথা ভাবিয়া তাহার ঘুম টুটিয়া যাইতে লাগিল। কৌতূহলের ছোট বড় সমস্ত বিষয় ঘুমের রহস্যের মতই তাহাকে পীড়ন করিতে লাগিল। যাহা গোপন, যাহা সে বোঝে না তাহাই ভয়ানক, তাহাই নিষ্ঠুর। একদিন ছেলেদের পুরানো মাসিকে একটা সামান্য ধাঁধার জবাব বাহির করিতে না পারিয়া ক্রোধে ক্ষোভে সে এমন বিচলিত হইয়া পড়িল যে, পরে ঠাণ্ডা মাথায় বিবেচনা করিয়া দেখিয়া তাহার দুঃখ ও লজ্জার সীমা রহিল না।

তখন দিনের আলো নিবিয়া আসিয়াছে, চারিদিকে আনন্দের দীনতা। কপালের ঘাম বাতাসেই শুকাইয়াছে, তথাপি কাপড় দিয়া কপাল মুছিয়া প্রসন্ন ভাবিতে লাগিল, সে যে পাগল নয় তার প্রমাণের সংখ্যাগুলি যদি এমনিভাবে কমিয়া আসে তাহা হইলে উপায় হইবে কি ?

অথচ প্রতিকার নাই। সে সবই বুঝিতে পারে, কিন্তু নিজেকে কিছুই বুঝাইতে পারে না। রাত্রে মশারি গুঁজিয়া শুইয়া তাহার মনে হয় ভাল করিয়া বুঝি গোঁজা হয় নাই, কোথায় ফাঁক রহিয়াছে, মশা ঢুকিবে। এ যে ভুল বুঝিতে পারিলেও তিন চারবার সন্তর্পণে তোশকের চারিপ্রান্ত না হাতড়াইলে তাহার স্বস্তি থাকে না। বসিবার ঘরে তালা দিয়া বার-বার টানিয়া দেখিয়া আসিলেও তাহাকে আবার ফিরিয়া গিয়া তালা ঠিকমত লাগানো সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ হইতে হয়। চৌকির নিচে রোজই সে চোর খোঁজে।

এমনি সব অন্তহীন পাগলামি। মাঝে মাঝে সে বিদ্রোহ করে, কিন্তু তাহাতে ফল আরও খারাপ হয়। যুদ্ধ করিয়া হার মানিতে জ্বালা যেন বাড়িয়া যায়।. নিজের কাছে নিজের সে কি নির্মম অপমান!

প্রসন্নের হৃদয়বৃত্তিগুলি ক্রমে তীক্ষ্ণ ও সতেজ হইয়া উঠিল, অনুভবশক্তি আশ্চর্যরকম বাড়িয়া গেল—তাহার মধ্যে ভাবপ্রবণতা দেখা দিল। ছোট দুঃখ তাহার কাছে এখন আর ছোট নয়, প্রাত্যহিক জীবনের যে-সব সূক্ষ্ম ও কোমল

সুর তাহার মত অকবির কানে পশিবার কথা নয়, এখন সেগুলি সে বেশ ধরিতে পারে। কল্পনাকে,—অবাস্তব কল্পনাকে, আমল দিতে তাহার ভাল লাগে।

সময় সময় সে অত্যন্ত বিমর্ষ হইয়া পড়ে। জীবনের দেনাপাওনার কড়া হিসাবী সে নয়, তবু সে টের পায় জীবনটা অর্থহীন। বাঁচিয়া থাকার কোন মানেই সে খুঁজিয়া পায় না।

জীবনের যে মানে সে খোঁজে তাহা যে অসাধারণ বৈচিত্র্য, উত্তেজনা, ভূমিকম্প, রোগশোক ও আতঙ্কের সমারোহ ভিন্ন আর কিছু নয়। মদের তৃষ্ণা জলে মিটিবে কেন? নিত্য পাত্র ভরিয়া তীব্র সুরা সম্মুখে ধরিবে মানুষের জীবন তেমন সাকীও নয়।

রাত্রে প্রসন্ন আশ্চর্য স্বপ্ন দেখে।

একটা খাড়া উঁচু পাহাড়। তার উপরে প্রসন্নের স্কুল। অনেক বয়সে স্কুলে পড়িতেছে বলিয়া প্রসন্নের বড় লজ্জা, টিফিনের ছুটির সময় স্কুলের সামনে পাহাড়ের একেবারে ধারে সে চুপচাপ দাঁড়াইয়া আছে। হঠাৎ একটা ছেলে তাহাকে এমন ধাক্কাই দিল যে পাহাড়ের নিচে আছড়াইয়া না পড়িয়া প্রসন্নের আর উপায় নাই; কারণ আজ শাড়ি পরিয়া স্কুলে আসিয়াছে বলিয়া উড়িবার প্রক্রিয়াটা সে ভুলিয়া গিয়াছে। পাহাড়ের ঠিক নিচে একটা ইঁদারা, শূন্যে পড়িতে পড়িতে প্রসন্ন বিবেচনা করিয়া দেখিল ইচ্ছা করিলে ইঁদারার মধ্যেও পড়া যায় অথবা একটু বাঁকিয়া ইঁদারার পাকা বাঁধানো পাড়ের উপরেও আছড়ানো চলে। কি করা উচিত?

আধাআধি পড়িয়া সে মন স্থির করিয়া ফেলিল। ইঁদারার জলে পড়িলে লাগিবে না বটে, কিন্তু ওর মধ্যে আবছা অন্ধকার, ওর মধ্যে অজানা রহস্য। তাছাড়া নিজের চেষ্টায় উঠিয়া আসিতে না পারিলে ওর মধ্যেই তাহাকে বাকী জীবনটা কাটাইতে হইবে। হেড মাষ্টার নিয়ম করিয়াছেন কোন ছেলে ইঁদারায় পড়িলে তাহাকে আর তোলা হইবে না।

নৌকার হালের মত হাতের খাতায় বাতাস কাটিয়া প্রসন্ন ইঁদারার পাড়ে আছড়াইয়া পড়িল।

হাত পা ভাঙিল না বটে, কিন্তু আঘাত লাগিল, সত্যিকারের আছাড় খাওয়ার সমানই। স্বপ্নে আর বাস্তবে ও-ছাড়া আর তফাত আছে কি? ভালবাসিয়া যাহাকে পাই নাই, স্বপ্নে সে পাশে আসিয়া বসিলে এই স্বপ্নে পাওয়ার মধ্যে শুধু

বাস্তবতার ফাঁকিটুকুই থাকে বলিয়া বাঁচা সম্ভব হইয়াছে। স্বপ্নকে তাহার স্থায্য মূল্য দিতেই হইবে।

প্রসন্ন উঠিয়া আলো জ্বালিল। জল খাইয়া গায়ে একটা চাদর জড়াইয়া চুপচাপ বিছানায় বসিয়া রহিল। শুধু বাড়ি নয়, সমস্ত পাড়াটা নিঝুম হইয়া পড়িয়াছে। আলোটা ভয়ে ভয়ে মিটিমিটি জ্বলিতেছে, রাস্তার আলো এতখানি অন্তরালে যে অস্তিত্বের মৃদু প্রমাণটাই বিস্ময়কর।

এ যেন রাত্রি নয়, শঙ্কার কুয়াশা।

প্রসন্ন ভাবিতে লাগিল, একটা বউ থাকিলে এ সময়ে কাজ দিত। প্রেমালাপ নয়, মানুষের সঙ্গে দুটি সাধারণ কথা বলিবার এত বড় প্রয়োজন কি সচরাচর আসে? বউ নিশ্চয় তাহার ভয়ের ভাগ লইত, দুচোখ বড় বড় করিয়া ভীত কণ্ঠে বলিত, 'কি গো? কি?' সে বলিত, 'কিছু না, বড্ড মশা লাগ্‌ছে। উঠে মশারিটা একবার ঝাড় না?'—'আলোটা বাড়িয়ে দাও, আমার বড় ভয় করছে।' 'আমি রয়েছি, ভয় কি?' বলিয়া সে হাসিত। বউ তথাপি বলিত, 'না না, আলোটা তুমি বাড়িয়ে দাও।'

মা কেমন করিয়া টের পাইয়াছিলেন, উঠিয়া আসিয়া জানালা দিয়া প্রশ্ন করিলেন, 'রাতদুপুরে আলো জেলে বসে রয়েছিস যে?'

'একটা দুঃস্বপ্ন দেখলাম, মা।'

'তা দেখবি না? যে অনাচারটাই তুই করিস্। কাপড়ে ভাত পড়ল, পইপই করে বারণ করলাম কানে তুললি না, সেই কাপড়ে এসে শুলি। নে, মা দুর্গাকে ডেকে আলো নিবিয়ে ঘুমো।'

পরদিন সকালে মা বলিলেন, 'এবার একটা বিয়ে কর বাবা, মাথা খাস। রোজগার-পাতি করছিস্—'

সকালে বউয়ের প্রয়োজন মিটিয়া গিয়াছে, খবরের কাগজটা নামাইয়া প্রসন্ন বলিল, 'কানপুরে কি ভয়ানক কাণ্ড হয়েছে জান মা? একটা আপিসের ছাদ ভেঙে সাতজন কেরানী মারা গেছে, পনরো জন জখম হয়েছে।'

মোটা হেডিংটা দেখিয়া মা বলিলেন, 'ওই লিখেছে বুঝি?

'না, ওটা যুদ্ধের খবর।'

'পড়্ ত শুনি।'

'যুদ্ধের খবর আর কি শুনবে মা? কানপুরের কাণ্ডটা কি ভয়ানক বল ত!

আপন মনে সবাই কাজ করছে, কেউ কিছু জানে না, হঠাৎ হুড়মুড় ক'রে ছাদ ভেঙে সাতজনের কবর হয়ে গেল, পনরো জন জখম হল। ভাবলে গা শিউরে ওঠে!'

বলিয়া প্রসন্ন উপরের দিকে তাকাইল। এ বাড়ির কড়ি-বরগা সমস্তই লোহার। ছাদ ভাঙিবার সম্ভাবনা তেমন নাই। সে মৃদু মৃদু হাসিল। ভাবিল, খবরের কাগজের খবরগুলিও ওষুধের বিজ্ঞাপনের মত এমন হিপ্‌নটিক! ষ্টোভ-দুর্ঘটনার বিবরণ পড়া অবধি আজকাল সে কত ভয়ে ভয়ে ষ্টোভ জ্বালায়, মাকে জ্বালাইতে দেয় না, চাকরকেও না।

চাকরি পিতৃবন্ধুর কল্যাণে। পিতৃবন্ধু আপিসের বড়বাবু। ব্যবহার দেখিয়া মনে হয় প্রসন্নকে তিনি ভালবাসেন। দোষ করিলে ধমকান না, মাঝে মাঝে ডাকিয়া উপদেশাদি দেন এবং কামানো চিবুকে হাত বুলাইতে বুলাইতে কি যেন ভাবেন।

ঠিক যেন ভাবেন না, দুশ্চিন্তা করেন।

সুতরাং অল্পকালের মধ্যে প্রসন্নর প্রমোশন হইল। সবদিক দিয়াই সে উপরে উঠিল, তাহার মাহিনা যেমন বাড়িল সত্তর হইতে আশী টাকায়, তাহাকে কাজ করিতে হইল একতলা হইতে একেবারে চারতলায় উঠিয়া গিয়া। বড়বাবুর পক্ষপাত-ভরা দরদ প্রসন্নকে এমন বিচলিত করিল বলিবার নয়।

বড়বাবু ডাকিয়া বলিলেন, 'তোমার বয়স কত হল হে প্রসন্ন?'

'আজ্ঞে, সাতাশ।'

'বল কি, সাতাশ! বিয়েটিয়ে ক'রে এবার সংসারী হও? না, ও-সব ইচ্ছে নেই?'

প্রসন্ন চোখ নামাইয়া বলিল, 'আজ্ঞে সামান্য আয়—'

বড়বাবু কথাটা হাসিয়া উড়াইয়া দিলেন। তিনি যখন বিবাহ করেন তাঁহার এক পয়সা আয় ছিল না। স্ত্রী কি তাঁহার খাইতে পায় নাই? প্রসন্ন আশী টাকা বেতন পায়, দেশে বাড়িঘর জমি-জায়গা আছে, বিবাহ করিতে হইলে কি রাজা হইতে হয় নাকি? তারপর—

'আমি যদ্দিন এখানে বড়বাবু আছি, মাইনে বাড়ার ভাবনাটা তোমার ভাবতে হবে না বাপু।' বলিয়া বড়বাবু হাসিলেন।

এ ত শুধু চুম্বক, কথা তিনি কম বলেন নাই। দুর্ভাবনায় ঘামে হাতের তেলো

ভিজাইয়া প্রসন্ন নীরবে আগাগোড়া সবটাই শুনিল। বড়বাবুর কন্যাটিকে সে দেখিয়াছে। লোভ করা যায় এমন সে মেয়ে, তাছাড়া বাপ তার বড়বাবু। হইলে সব দিক দিয়া ভালই হয়। প্রসন্ন কিন্তু কিছুমাত্র উৎসাহ পাইতেছিল না। এমন একরাশি কালো চুল পিঠে ছড়াইয়া অল্প বিরক্তিতে ভ্রূ-দুটি অমনভাবে একটুখানি কুঁচকাইয়া যে মেয়ে ওরকম আশ্চর্যকণ্ঠে বলিতে পারে 'বাবা বাড়ি নেই' তাহাকে বিবাহ করা কি ভয়ের কথা? ও-মেয়ের সঙ্গে একা একঘরে বসিয়া আছে কল্পনা করিলেও তাহার বুকের মধ্যে ঢিপঢিপ করিতে থাকে। ওকে বিপদ বলিয়া ভাবা যায়, বউ বলিয়া কোন মতেই যেন ভাবা যায় না।

এদিকে বড়বাবুকে না বলিবার সাহসই বা সে কোথায় পায়?

বড়বাবুর বুদ্ধি-বিবেচনার উপর প্রসন্নর শ্রদ্ধা কমিয়া গেল। নিজের ঘরে ফিরিয়া গিয়া সে ভাবিতে লাগিল, নিজের মেয়ের উপরেও কি লোকটার কিছুমাত্র মমতা নাই? অমন মেয়েকে কি বলিয়া তাহার মত লোকের হাতে সঁপিয়া দিতে চায়? দেশে কি সুপাত্রের অভাব ঘটিয়াছে?

যেখানে বসিয়া প্রসন্ন কাজ করে তার পাশেই প্রকাণ্ড একটা জানালা। পাঁচ-সাতজন মানুষ একসঙ্গে গলিয়া যাইতে পারে জানালাটা এত বড়। শিক নাই। তা তিনতলার জানালায় শিকের কি প্রয়োজন? গলিয়া পড়া সহজ বলিয়াই কে আর তিনতলার জানালা দিয়া গলিয়া নিচে পড়িতেছে? মানুষ ত পাগল নয়!

কাজ করিতে করিতে প্রসন্ন বার-বার জানালায় উঠিয়া যায়। শহরটা ইটের বটে। পথ দিয়া গাড়ি-ঘোড়ার আর মানুষের স্রোত বহিয়া যায়, পথটা যেন নদী। নিচু ফুটপাথটার দিকে চাহিয়া প্রসন্নর গা একটু ছমছম করে।

লিফটে উঠিবার সময় যেমন হয় তেমনি একটা অনুভূতি, কেবল তীব্রতা কম। গভীর কিন্তু তীব্র নয়।

আজ বিচলিত মন লইয়া খোলা জানালায় দাঁড়াইয়া প্রসন্ন প্রথম অনুভব করিল যে, ফুটপাথটা আসলে বেশী নিচু নয়, তিনতলার মানুষের অনায়াস মরণ বিছানো আছে বলিয়াই অত নিচু মনে হয়। ফুটপাথের চৌকা পাথরের প্রান্তগুলি সে বেশ দেখিতে পাইতেছে, একটা কলার খোসা পড়িয়া আছে ইহাও তাহার লক্ষ্য এড়ায় নাই। প্রসন্ন এক দৃষ্টিতে কলার খোসাটার দিকে চাহিয়া রহিল। তিনতলা হইতে লাফাইয়া পড়িলে মানুষ বাঁচে কিনা এই কৌতুককর সমস্যাটা তাহাকে হঠাৎ আজ বিব্রত করিয়াছে।

মরিবেই যে এমন কোন মানে নাই। বাড়িতে আগুন লাগিলে ইহার চেয়ে উঁচু হইতে লাফাইয়া মানুষ প্রাণ বাঁচাইয়াছে, আর এই জানালা দিয়া লাফাইয়া পড়িলে বাঁচিবার সম্ভাবনা থাকিবে না? বাড়িতে আগুন লাগিয়া হোক্, ছাদটা ধ্বসিয়া পড়ার উপক্রমেই হোক্, প্রাণ বাঁচাইবার জন্য তাহাকেই যদি এই জানালা দিয়া লাফাইয়া পড়িতে হয়, তাহাকে মরিতেই হইবে?

প্রথমটা ক্ষুব্ধ হইয়া শেষে প্রসন্ন শান্ত হইল। মরেও যদি, মন্দ হয় না। তাহাকে ঘিরিয়া রাস্তায় ভিড় জমে, আপিসসুদ্ধ সকলে ছুটিয়া নিচে নামে, চকিতের জন্য বড়বাবুর মনে কন্যার বৈধব্য সংঘটিত হয়, য়্যাম্বুলেন্স আসে, সমারোহের আর সীমা থাকে না। বৃদ্ধ বয়সে রোগশয্যায় শুইয়া মরার চেয়ে এ মৃত্যুতে বেশ খানিকটা অভিনবত্ব থাকে।

সেদিন কাজে আর তার মন বসিল না। বার-বার উঠিয়া গিয়া সে দেখিয়া আসিতে লাগিল, কলার খোসাটা তখনও পড়িয়া আছে কিনা। তাহার বড়ই ইচ্ছা হইতে লাগিল যে, তাহার চোখের সামনে একজন খোসাটায় পা দিয়া পিছলাইয়া পড়ে, দেখিয়া মনের আনন্দে সে খানিকক্ষণ হাস্য করে। এত লোক চলিতেছে পথে, কারও পা কি খোসাটায় পড়ে না? এমনি সব সাবধানী পথিক যে পা পিছলাইয়া পড়াটাও সকলে সাবধানে বাঁচাইয়া চলে?

কলার খোসার সদ্গতিই হইল। প্রসন্নর চোখের সামনে একটা গরু সেটা খাইয়া গেল! ক্ষুণ্ণমনে সে টেবিলে ফিরিয়া গেল। সেদিন আর জানালায় উঠিয়া যাইবার ইচ্ছা তাহার হইল না। কলার খোসার অপচয়কে উপলক্ষ করিয়া জানালা দিয়া লাফাইয়া পড়িতে না পারার দুঃখ তাহার মনে মৃদু বিষের মত প্রভাব বিস্তার করিল, আকাশের রহস্যভরা সুনীল রূপ দিগন্তবিস্তৃত ইটের স্তূপের গম্ভীর মহিমা, আর জানালার ঠিক নিচে পাথর-বাঁধানো ফুটপাথ প্রসন্নের কাছে সমস্ত আকর্ষণ হারাইয়া ফেলিল। কাহার উপর অভিমান করা উচিত সে ঠিক বুঝিয়া উঠিতে পারিল না, কিন্তু তাহার মনে হইতে লাগিল কে যেন তাহাকে ঠকাইতেছে, ক্রমাগতই ঠকাইতেছে।

প্রসন্ন চমকাইয়া উঠিল। বড়বাবু কাঁধে হাত রাখিয়াছেন।

'মাকে ব'লো হে, রবিবার দেখা করতে যাব।'

'আজ্ঞে বল্‌ব।'

তিনতলায় কাজ আরম্ভ করা অবধি প্রসন্ন নানা ছলে লিফ্‌টে ওঠা-নামা

করিয়াছে। একটা ছোটখাটো ঘর, মেঝে আছে, দেয়াল আছে, ছাদ আছে, তার মধ্যে মিনিটখানেক বন্দী থাকিয়া সোঁ করিয়া উপরে ওঠা নিচে নামা কি রোমাঞ্চকর রোমান্স! আজ সে সিঁড়ি দিয়াই নিচে নামিল। লিফ্‌টের মোহ আজ তাহার নাই। যার এমন বিপদ ঘটিতে বসিয়াছে অত শখে তাহার কাজ কি? জীবনে সহসা যে সমস্যা দেখা দিয়াছে এখন গভীরভাবে সে বিষয়ে চিন্তা করিয়া দেখা দরকার। মেয়েটাকে আর একবার দেখিতে পারিলে ভাল হইত। একবার মাত্র দেখিয়া ওকে যেন বেশী রহস্যময়ী মনে হইতেছে। অল্প-বিরক্তিতে ঠিক কি ভাবে সে ভ্রূ-দুটি কুঞ্চিত করে আর একবার না দেখিয়া ও-মেয়েকে বিবাহ করা বোধ হয় সুবিবেচনার কাজ হইবে না।

অন্যমনে বাসে উঠিতে গিয়া প্রসন্ন পড়িতে পড়িতে অল্পের জন্য বাঁচিয়া গেল। ভিতরে বসিয়া লজ্জায় সে কাহারও দিকে চাহিতে পারিল না। অপরাধ সে কাহারও কাছে করে নাই, কিন্তু সেজন্য শাস্তি আটকায় না, এমনি মন্দ তার কপাল। রাত্রে ঘুমাইতে সে যে কষ্টটা পাইল তাহার তুলনা হয় না। বড়বাবুর মেয়েটি যেন কড়া নেশা, তাহার কল্পনা সেই নেশারই অবসাদ, নিস্তেজ অথচ নির্মম; তাহার বেশ ঘুম আসিতে থাকে, শৃঙ্খলা নষ্ট হইয়া চিন্তাগুলি পরস্পরের সঙ্গে জট পাকাইয়া যায়, ঘুমাইয়া পড়িতে আর বিলম্ব নাই,—সহসা সে পূর্ণমাত্রায় জাগরিত হইয়া ওঠে। জাগরণ এমন আকস্মিক হয়, যেন চমক লাগে। সার্কাসের তাঁবুতে পাঁচ ছয়টা উঁচু দোলনার একটা ছাড়িয়া আর একটা ধরিয়া দুলিবার কসরত করিতে করিতে এ কি ঘুম ভাঙা!

এমনিভাবে তাহার রাত্রি প্রভাত হইল। সকালে সে মাকে বলিল, 'তাড়াহুড়ো ক'রে রাঁধবার দরকার নেই মা। আজ আপিস যাব না।'

মা কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। প্রসন্ন বলিল, 'রাত্রে তাহার জ্বর আসিয়াছিল।' মা চিন্তিত হইয়া বলিলেন, 'ওষুধপত্তর কিছু খা বাবা তুই। বড় খারাপ হয়ে যাচ্ছে তোর চেহারা।'

প্রসন্ন মৃদু হাসিয়া বলিল, 'ওষুধপত্রের ব্যবস্থাই হচ্ছে মা।'

বিবাহের প্রক্রিয়াটা প্রসন্ন সাহসী পুরুষের মতই সহ্য করিল। বিশেষ কঠিন নয়, কারণ নিজের তাহার কিছুই করিবার নাই, যাহা দরকার অন্যে করাইয়া লয়। তাহার ভয় ছিল বাসরে। একগাদা মেয়ে যখন তাহাকে ছাঁকিয়া ধরিবে, হাল-ভাঙা নৌকার মত টলমল করিলে চলিবে না, নিজেকেই তাহার

চারিদিক সামলাইয়া চলিতে হইবে। ঘর নির্জন হইলে বউয়ের সঙ্গে ভাবও করিতে হইবে তাহাকেই।

বাসর বসিতে রাত্ত বারোটা বাজিয়া গেল। মেয়েরা হাসিল, ফাজলামি করিল, গান গাহিল, রাত্রি আড়াইটা পর্যন্ত। তবু কি তাহারা উঠিতে চায়—এই যে আরম্ভ এ যাহার শেষ হইয়া গিয়াছে, কারণে-অকারণে স্বামী এখন যার বকে, অসুস্থ শিশু যার দিবারাত্র ককায়, পরের জীবনে এই আরম্ভকে সেও ঘাঁটিতে চায়, ইহাকে প্রকাশ্ত ও সাধারণ করিয়া তুলিবার আকাঙ্ক্ষা তাহার কম নয়। বাসরে বিবাহিতা মেয়েরাই ভিড় করে বেশী। বিবাহোৎসবে সধবা নারী অপরিহার্য এবং সে নিয়ম তাহাদেরই তৈরি।

প্রসন্ন ইহাদের চিনিতে পারিল না। সংসারের সংস্রবে সে এত বড় হইয়াছে, ইহাদের জীবনী তাহার অজানা নয়, এত উল্লাস ইহাদের আসে কোথা হইতে? অবাধে ইহারা আনন্দ করিতেছে, হাসি ইহাদের আন্তরিক, দেখিয়া মনে হয় না জীবনে ইহাদের কোনদিন দুঃখের ছায়াপাতও হইয়াছিল। একে একে প্রসন্ন উপস্থিত প্রত্যেকের মুখের দিকে তাকাইয়া দেখিল, কারও চোখ দুটিতে পর্যন্ত বিষণ্ণতার আভাসটুকু নাই, খুব যে নিরীহ সেও হাসিমুখে অন্যের পরিহাস উপভোগ করিতেছে, দুচোখ খুশীতে চপল। প্রসন্ন সবিস্ময়ে ভাবিতে লাগিল, সংসারে শোক-তাপ নাই একথা সত্য নয়, তার বড ভাগটা মেয়েরাই গ্রহণ করিয়া থাকে; কিন্তু প্রযোজন উপস্থিত হইলে ব্যক্তিগত জীবনকে কিছুকালের জন্য অতিক্রম করিয়া যাওয়ার প্রক্রিয়াটা ইহাদের বোধ হয় জানা আছে।

ভাবিয়া প্রসন্ন খুশী হইল। খানিক পরে যে-স্ত্রীর সঙ্গে তাহার আলাপ করিতে হইবে সে ইহাদের স্বজাতীয়া। যে প্রকৃতিগত দুর্বলতার দরুন ইহারা কান্নার সময় প্রাণ দিয়া কাঁদিয়া হাসিবার সময় নির্বিকার চিত্তে হাসিতে পারে, বডবাবুর মেয়ের মধ্যেও সে দুর্বলতা নিশ্চয় আছে। সকল নারীর মত তার বউও জীবনকে যাচাই করিবে না, হাসিকান্না যাহাই আসুক বিনা প্রতিবাদে দ্বিধামাত্র না করিয়া গ্রহণ করিবে, এমনি একটা সান্ত্বনা প্রসন্নকে খানিক আত্মস্থ করিল। আড়চোখে সে একবার চেলি-পরা বউকে দেখিয়া লইল। বুকের মধ্যে কাঁপিয়া উঠিলেও সে বিশ্বাস করিল দুঃখ এবং আনন্দের মত স্বামীকেও সমগ্র সত্তা দিয়া গ্রহণ করিবার শিক্ষা এ মেয়ের হইয়াছে, স্বামীকে ভালবাসা হাসা-কাঁদার মতই ইহার পক্ষে সহজ ও স্বাভাবিক।

ইহার অস্থিমজ্জায় নিঃসন্দেহ স্বামিপ্রেম আছে এবং সে প্রেমে শ্রদ্ধাভক্তির অংশটা অন্য মেয়ের চেয়ে কম নয়।

ক্রমে মেয়েরা বিদায় লইল। বাহির হইতে কে যেন দরজায় শিকল তুলিয়া দিল।

প্রসন্ন মুহূর্তে পাংশু হইয়া গেল।

যে মেয়েটি শিকল দিয়াছিল বাহির হইতে সে পরিহাস করিয়া বলিল, 'কই গো বর, খিল চড়াবার শব্দটা পাচ্ছি না যে? আমাদের ভদ্রতায় এতখানি বিশ্বাস ক'রো না, ঠকে যাবে।'

প্রসন্ন এতক্ষণে উঠিয়া গিয়া বারান্দার দিকের বন্ধ জানালাটা খুলিয়া ফেলিয়াছে। তাহার হৃৎপিণ্ড সজোরে স্পন্দিত হইতেছিল। চাপা উত্তেজিত কণ্ঠে সে বলিল, 'শিকল দিলেন কেন? খুলে দিন।'

বউ ঘোমটা ফাঁক করিয়া সবিস্ময়ে চাহিয়া রহিল। কি রকম বর?

বারান্দার মেয়েটি চলিয়া যাইতে যাইতে হাসিয়া বলিয়া গেল, 'কাল সকালে খুলব।'

কাল সকাল! সমস্ত রাত তাহাকে এই ঘরে বন্দী হইয়া থাকিতে হইবে, ইচ্ছা করিলেও বাহিরে যাইতে পারিবে না? কি ভয়ানক! প্রসন্ন মিনতি করিয়া বলিল, 'না না, এখুনি খুলে দিন। আমি একবার বাইরে যাব। দেখুন ত কি করছেন আপনি!'

ছোট একটি কিল দেখাইয়া মেয়েটি হাসিমুখে চলিয়া গেল।

প্রসন্ন খাটে গিয়া বসিল। তাহার কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম বাহির হইয়াছে। ঘরের বাতাস তাহার নিঃশ্বাস লওয়ার পক্ষে অপ্রচুর।

কত জল্পনাকল্পনাই সে করিয়া রাখিয়াছিল! সে-সব কিছুই হইল না। বিপন্ন হইয়া প্রসন্ন এই বলিয়া স্ত্রীর সঙ্গে প্রথম আলাপ আরম্ভ করিল—

'তোমার ভাইটাই কাউকে ডেকে বল না শিকলটা খুলে দিক!'

বউ মৃদুস্বরে বলিল, 'একটু পরেই খুলে দেবে!'

প্রসন্ন তাহা জানে। এ যে কৌতুক, দশ পনরো মিনিট পরে মেয়েটি যে পা টিপিয়া টিপিয়া আসিয়া শিকল খুলিয়া দিয়া যাইবে ইহাতে তাহার একটুও সন্দেহ নাই। কিন্তু তাহাতে স্বস্তি মেলে না। বন্ধ ঘরে এক মুহূর্ত থাকাও তাহার পক্ষে অসম্ভব। তাহার দম আটকাইয়া আসে। যদি এখনি একটা অঘটন ঘটিয়া বসে সে কি করিয়া ঘরের বাহির হইবে? অপমান হইতে রক্ষা পাইবে কি করিয়া? 'না, এখুনি খুলে দিতে বল। এসব কি? এসব আমি ভালবাসি না।'

নিরুপায় বউ চুপ করিয়া রহিল।

টিকটিকি

দোতলা বাড়ি। শহরের যে অঞ্চল বেজায় শহুরে বলে খ্যাত সেইখানে। তিনদিকে গাদা করা বাড়ির চাপ, একদিকে রাজপথের চটুল ফাজলামি, আবেষ্টনীকে লক্ষ্য করলে সন্দেহ হয়, সমস্তটাই বুঝি হাই মায়োপিয়ার লীলা। তাছাড়া, এমন চেহারা বাড়িটার যে দাঁড়িয়ে থাকার ভঙ্গীটা অসবর্ণ রহস্যের মত কুৎসিত। সস্তা মেয়েমানুষ যেন পথিকের দিকে পিছন ফিরে দাঁড়িয়ে বিজ্ঞাপন দিচ্ছে, আমি ভীরু ও সরলা খাঁটি গাঁয়ের মেয়ে, তবে অসতী। বে-আবরু সমতল পিঠে পুরনো বাদামীরঙের আবরণটা চোখেই পড়তে চায় না, প্রাচীনতার ছাপ এত বেশী।

দোতলা বাড়ি বটে, একতলা-দোতলায় কিন্তু সিঁড়ির যোগাযোগ নেই। তিনটি সদর দরজার ডাইনেরটি দিয়ে ঢুকলেই খাঁচা-বন্দী দোতলার সিঁড়ি। অকারণ নড়াচড়ার একটু স্থান অবশ্য আছে, কিন্তু সিঁড়ি বেয়ে দোতলায় ওঠা অথবা পথে ফিরে যাওয়া ছাড়া যাওয়ার উপায় নেই কোন দিকেই। দোতলায় থাকেন ইতিহাসের প্রফেসর, সদর দরজাটির পাশে ছোট পিতলের ফলকে যিনি এম-এ। একতলায় থাকেন জ্যোতিষার্ণব, বাকী দুটি সদর দরজার উপরে কাঠের ফ্রেম-লাগানো রঙিন টিনের মস্ত সাইনবোর্ডে যিনি প্রথিতযশা! দুটি দরজাই একটি ঘরের, যার বেশীরভাগ জ্যোতিষার্ণবের গণনালয়, বাকীটুকু অন্দরের প্যাসেজ। তিনটি সদর দরজার মাঝেরটি দিয়ে ঢুকলেই ডাইনে দোতলার সিঁড়ি আড়াল-করা দেয়াল আর বাঁয়ে দুটি বই-ভরা আলমারির বে-আবরু পিঠ। এগিয়ে এগিয়ে যখন অন্দরের দরজা ডিঙিয়ে জ্যোতিষার্ণবের আবছা অন্ধকার সেঁতসেঁতে অন্দরে পদার্পণ না করে প্রায় আর উপায় থাকে না, তখন দেখা যায়, আলমারির দেয়াল একেবারে অন্দরের দেয়ালে গিয়ে ঠেকেনি, ফাঁক আছে হাতখানেক। এই ফাঁকটুকু দিয়ে জ্যোতিষার্ণব নিজে আর তার নিজের লোক অন্দর থেকে গণনালয়ে যাতায়াত করে।

বাইরের লোক আসে তিন নম্বর সদর দরজা দিয়ে। এসে ডবল চৌকির ময়লা ফরাসেই হোক আর অয়েলক্লথ মোড়া টেবিলের সামনে কাঠের চেয়ারেই হোক,

বসে। ব'সে চারিদিকে তাকায়, বিশ্বাস-অবিশ্বাস শ্রদ্ধা-অশ্রদ্ধা আশা-নিরাশার ভারে বিব্রত চোরের মত। যা চোখে পড়ে তাই মনকে নাড়া দেয়, দেয়ালের টিকটিকি পর্যন্ত। সস্তা মেয়েমানুষ যেন সমস্ত পরপুরুষের দৃষ্টি নিয়ে নিজের সমালোচনা করছে, আমার কি উপায় হবে ?

আসলে, এ ছাড়া প্রশ্নও নেই জগতে। সব কিছুতে এই সমস্যার ছাপ মারা। ভবিষ্যৎ কি সব কিছুকে গ্রাস ক'রে নেই ?

জ্যোতিষার্ণবের কপালে চন্দনের ফোঁটা দেবার সময় তার ছেলেমেয়ের মা মাথা কাত করে, চোখ উল্টে দেয়, মোটা আলগা ঠোঁট দুটিকে টান করে হাসে। জ্যোতিষার্ণবের অপরাধ, সাত বছর আগে এই ভঙ্গী তাকে ভুলিয়েছিল। তবে, কেবল ভঙ্গী নয়। সেই সঙ্গে জিজ্ঞাসাও করে, 'আমি মরলে তোমার কি উপায় হবে ?'

জিজ্ঞাসা করে সকালবেলা আর মরে যায় সেই সন্ধ্যার কাছাকাছি সময়ে, তবু মনে হয় প্রশ্নটা জিজ্ঞাসা করেই যেন সে মরে গেল।

অতীত বর্তমান ভবিষ্যৎ যার নখদর্পণে, সেও বুঝতে পারে না ব্যাপারখানা কি। তার ছেলেমেয়ের মা মরণের কথা বলবে মনে করার আগেই মাথার উপর কড়িকাঠে যে টিকটিকিটার লেজ নড়তে আরম্ভ করেছিল, তার ছেলেমেয়ের মা মরণের কথা বলার পরে সেই টিকটিকিটাই যে আরেকটা টিকটিকিকে তার ছেলেমেয়ের মা হতে ডেকেছে, এইটুকু কেবল জ্যোতিষার্ণব জানে না। কিন্তু তাতে কি এসে যায় ? আর সব ত তার জানা আছে, যা কিছু মানুষের জানা দরকার। ওই জ্ঞানটুকু লাভ করলেই কি তার মনের এ ধাঁধা মিটে যেত যে, তার ছেলেমেয়ের মা মরবে বলে টিকটিকিটা ডেকেছিল, অথবা টিকটিকিটা ডেকেছিল বলেই তার ছেলেমেয়ের মা মরে গেছে ?

ছেলেমেয়েরা ছোট। বড় ছেলেটি প্রথমভাগের বানান শেখে, ছোট ছেলেটি শেখে কথা বলতে। এদের মাঝখানেরটি মেয়ে, বোবা ব'লে সে কথা বলতে শেখেনি। মার সম্বন্ধে তাই প্রশ্ন করে শুধু বড় ছেলেটি।

'মা কোথায় গেছে বাবা ?'

'স্বর্গে।'

ব'লে প্রমাণের জন্য জ্যোতিষার্ণব কান পেতে থাকে। টিকটিকি বাড়িতে আট দশটার কম নয়, কিন্তু একটাও জ্যোতিষার্ণবের কথায় সায় দেয় না। নিজের

ভুল বুঝতে পেরে নিজেকে বোকা মনে করার লজ্জায় করুণভাবে একটু হেসে জ্যোতির্বার্ণব নিজে নিজেই কয়েকবার মাথা নাড়ে। স্বর্গে যদি গিয়েও থাকে তার ছেলেমেয়ের মা, এতদিনে সেখানে পৌঁছে গেছে। অতীত ঘটনার সঙ্গে কি সম্পর্ক টিকটিকির যে তার ছেলেমেয়ের মা স্বর্গে গেছে সে একথা বললে সঙ্গে সঙ্গে সায় না দিয়ে টিকটিকি থাকতে পারবে না? তাছাড়া, স্বর্গে যাওয়া না যাওয়া ত জীবনের ঘটনা নয় মানুষের। মরে মানুষ যে-স্বর্গে যায়, ইহলোকে কি সে-স্বর্গ আছে? স্বর্গই নেই ইহলোকে!

মনে মনে এত গভীর ও জটিল যুক্তিতর্ক নাড়াচাড়া করেও কিন্তু সন্দেহ যায় না। তার ছেলেমেয়ের মা স্বর্গে যায় বা যায়নি বলেও ত চুপ করে থাকতে পারে ত্রিকালদর্শী টিকটিকিগুলি? স্বর্গে গিয়ে থাকলে অন্যগুলি না হোক, যে টিকটিকিটা তার ছেলেমেয়ের মার মৃত্যুর কথা ঘোষণা করেছিল, সেটা অন্ততঃ একবার ডেকে উঠত। হোক না অতটুকু জীব, একবার যে অতখানি জ্ঞানের পরিচয় দিয়েছে তার কি এতটুকু কাণ্ডজ্ঞান নেই? জ্যোতির্বার্ণবের বিপদ এই সে জানে তার ছেলে-মেয়ের মার স্বর্গে যাওয়া নিষেধ। অবিবাহিতা বৌদের জন্য স্বর্গ নয়। কিন্তু কুমারী জীবন থেকে একজন পুরুষের সঙ্গে যারা জীবন কাটিয়ে দেয়, তাদের জন্যও কি স্বর্গে যাওয়ার কড়া ব্যবস্থা একটু শিথিল হয় না? তার ছেলেমেয়ের মার পারলৌকিক জীবন সম্বন্ধে এইটুকুই আশা ভরসা জ্যোতির্বার্ণবের।

মার জন্য ছোট ছেলেটা ককায়। মেয়েটা বোবা-কান্না কাঁদে। বড় ছেলেটা কাঁদে আর জিজ্ঞাসা করে, 'মা কোথায় গেছে বাবা?'

জিজ্ঞাসা করে গণনালয়ে, তিনজন ক্লায়েন্টের সামনে। জ্যোতির্বার্ণব দেয়ালে টাঙান যোগিনীচক্রের পাশে নিস্পন্দ টিকটিকিটার দিকে একবার তাকিয়েই উঠে দাঁড়ায়। ক্লায়েন্টদের সবিনয়ে বলে, 'একটু বসুন, আসছি।'

ব'লে ছেলেকে নিয়ে অন্দরে শোবার ঘরে ঢুকে দেয়ালে আর সিলিং-এ ব্যাকুল দৃষ্টিতে খুঁজে বেড়ায় তার টিকটিকিকে। সে দিন ঘরে যা কিছু ছিল আজও তার সবই আছে, কেবল নেই শৃঙ্খলা আর সেই টিকটিকিটা। শৃঙ্খলা সত্যই নেই, শৃঙ্খলা লুকিয়ে থাকে না, কিন্তু টিকটিকি ত ফাঁকে ফোকরে জিনিসপত্রের আড়ালে অনায়াসে লুকিয়ে থাকতে পারে, অতটুকু জীব টিকটিকি! একটু আশ্বস্ত হয় জ্যোতির্বার্ণব। ছেলেকে বলে, 'কি বলছিলি তুই খোকা?'

বাপের কোলে উঠে ছেলের মন এতক্ষণে শান্ত হয়েছে।

'কখন বাবা ?'

'আপিসে ঢুকে কি বললি না আমাকে ?'

'কিছু বলিনি ত।'

ছোটবোন আর ভাইটি বাপের যে লোমশ বুকখানায় আজকাল রাজত্ব করে, সেখানে উঠে স্মৃতিভ্রংশ হবার বয়স খোকার পার হয়ে যায়নি। তবে বয়সের তুলনায় ওজনটা তার হয়েছে অস্বাভাবিক। ছেলেকে জ্যোতির্ষার্ণব মেঝেতে নামিয়ে দেয়। মৃদুস্বরে সন্তর্পণে বলে, 'তোর মার কথা কি জিজ্ঞেস করলি না ?'

'মা কোথায় গেছে বাবা ?'

বোমা নিয়ে খেলা করবার মত অসহায় সাহসের সঙ্গে জ্যোতির্ষার্ণব বলে, 'নরকে।' ব'লে কান পেতে থাকে। কানে আসে ছোট ছেলেটার কান্না, দোতলায় ইতিহাসের প্রফেসারের স্ত্রীর হঠাৎ-গাওয়া দুলাইন গান, রাজপথের চটুল ফাজলামি।

বড় ছেলেটা বাপের মুখ দেখেই বোধ হয় কেঁদে উঠবার উপক্রম করেছিল।

জ্যোতির্ষার্ণব চোখ রাঙিয়ে বলে, 'কাঁদিস না।'

খোকা কাঁদে না।

'শোন, আমি ভুল বলেছি। তোর মা এখনও নরকে যায়নি, যাবে। বুঝলি ? যাবে, ভবিষ্যতে যাবে।'

আবার জ্যোতির্ষার্ণব কান পেতে থাকে। বড় ছেলেটা কেঁদে ওঠা মাত্র হাত চাপা দেয় তার মুখে। কানে আসে ছোট ছেলেটার থেমে-আসা ছাড়া-ছাড়া কান্না, দোতলায় ইতিহাসের প্রফেসরের স্ত্রী থেমে-আসা দুলাইন গানের দুর্বোধ্য গুন-গুনানো সুর, রাজপথের চটুল ফাজলামি আর টিকটিকির ডাক।

সেই টিকটিকিটার নয়। সে যাকে সেদিন তার ছেলেমেয়ের মা হতে ডেকেছিল, সেটার। দুটি টিকটিকির আকারে, চামড়ার রঙে, চালচলনে পার্থক্য অবশ্য আছে অনেক, কিন্তু সব টিকটিকিরই এক রা।

মনে যার ব্যথা থাকে তার শখ চাপে মনের কথা বলবার। মনের ব্যথা যে মনকে কামড়ায় এটা তার একটা লক্ষণ। ছেলেমেয়ের মা যার নরকে যাবে, মনে তার ব্যথা থাকা স্বাভাবিক। জ্যোতির্ষার্ণব তাই হাত দেখাতে, ঠিকুজী মেলাতে, ভাগ্য গণাতে, মাদুলি-কবচ বিধান-ব্যবস্থা নিতে, পূজা-পার্বণ, শান্তি-স্বস্ত্যয়ন নির্বাহের আহ্বান জানাতে যারা আসে, তাদেরও যেমন মনের কথা বলে, শুধু দেখা করতে

যে বন্ধুরা আসে তাদেরও তেমনি মনের কথা বলে। জ্যোতিষ-বচনের মত মনের কথা বলার কথা তার প্রায় মুখস্থ হয়ে গেছে। এ যুগের মানুষের অবিশ্বাসপ্রবণতা দিয়ে আরম্ভ করে চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিলেও যে কেউ কিছু বিশ্বাস করতে চায় না, এ পর্যন্ত আসতে আসতে জ্যোতিষার্ণবের মুখ বড় বিমর্ষ হয়ে যায়। গভীর আর্ত বিষাদের ছাপ। তাছাড়া গলাও কাঁপে। ফরাসে বা চেয়ারে যেখানেই তার শ্রোতা বসে থাক, কথার চেয়ে কথার সুর আর জ্যোতিষার্ণবের চেয়ে তার মুখের ভাব শ্রোতাকে বিচলিত করে বেশী। জ্যোতিষার্ণবের ভণ্ডামিতে আর যেন বিশ্বাস থাকে না, অন্ততঃ তখনকার মত।

'প্রমাণ? বিশ্বাসের জন্য প্রমাণ চাই? আমার নিজের জীবনেই কত বড় বড় প্রমাণ ঘটেছে। এই ত সেদিন আমার স্ত্রী মারা গেলেন, আমি কি জানতাম না তিনি ওই দিন ওই সময় মারা যাবেন?'

'জানতেন?'

গণনালয়ের টিকটিকিটা সব সময় নিজেকে প্রকাশ করে রাখে। হস্তরেখার প্রকাণ্ড ম্যাপ, রাশিচক্র, বর্ষচক্র, পতাকীচক্র, যোগিনীচক্রের ছবি, সুকেশিনীর ছবিযুক্ত কেশতৈলের দেয়ালপঞ্জী-বিজ্ঞাপন, দেয়ালে বসানো তাক, জানালার চতুষ্কোণ গহ্বর, ফাঁকা দেয়াল, ছাদ, কড়িবরগার আড়াল, সমস্ত জায়গা পাঁতি পাঁতি করে খুঁজে তাকে আবিষ্কার করতে হয় না, এদিক ওদিক একটু তাকালেই নজরে পড়ে। জ্যোতিষার্ণব খানিকক্ষণ আনমনে তাকিয়ে থাকে টিকটিকিটার দিকে, তার পর মাথা হেলিয়ে বলে, 'প্রথমে জানতাম না। নিজের লোকের মৃত্যুর দিন গণনা করতে নেই, মানুষের মন ত, মন বিচলিত হয়ে পড়ে। সেদিন সকালবেলা হল কি, তামাসা করে আমায় বললেন, আমি মরে গেলে তোমার কি উপায় হবে? মানে, সংসার ত এক রকম চালাতেন তিনি, তাই হঠাৎ পরিহাস করে বললেন আর কি যে, তিনি যদি মরে যান এ সব কাজকর্মই বা কে করবে, ছেলেমেয়ে মানুষই বা কে করবে। যেই বললেন কথাটা, সঙ্গে সঙ্গে একটা টিকটিকি ডেকে উঠল।'

'টিকটিকি?'

'হ্যাঁ, টিকটিকি। মনে কেমন খটকা বাধল। হস্তরেখা বিচার করে ওঁর বয়স জিজ্ঞেস করলাম। বয়স অবশ্য আমি জানতাম, বিয়ের সময় থেকেই জানতাম, তবু জিজ্ঞেস করলাম। তারপর বললাম, তোমার কোষ্ঠীটা বার করো

ত, কালো তোরঙ্গের তলায় আছে। উনি হাসতে হাসতে কোষ্ঠীটা বার করে দিলেন। তখনও আমার মন বলছে, থাকগে কাজ নেই, মরণ যদি ওর ঘনিয়ে এসে থাকে, কি হবে আগে থেকে জেনে? লাভ ত কিছুই হবে না, মাঝখান থেকে কিছুদিন অতিরিক্ত মনোকষ্ট ভোগ করব। কিন্তু শেষ পর্যন্ত গণনা না করে পারলাম না। গণনার ফল দেখে মাথা ঘুরে গেল। সেদিন গোধূলি বেলা পর্যন্ত ওঁর আয়ু। ওঁর দিকে তাকিয়ে মনে হল যেন একটা শবের দিকে তাকিয়ে আছি, ঠিক পিছনে আবছা মতন—'

শ্রোতা স্তব্ধ। গলা শুকিয়ে গেছে। ভয়ে নয়, প্রকৃত তৃষ্ণায়। কিন্তু এখন জল চাওয়া যায় না।

'জানতাম কোন লাভ নেই, ওঁর বাবা ছিলেন পরম নিষ্ঠাবান সত্যবাদী পণ্ডিত, তবু একবার জিজ্ঞাসা করলাম, বিয়ের সময় তোমার বয়স ত দুএক বছর কম করে বলা হয় নি? কোষ্ঠী ঠিক আছে ত? বিয়ের সময় যদি—থাকগে ওসব কথা। আপনাকে যা বলছিলাম, পার্শ্বমুখ নক্ষত্র—'

নয়টি পার্শ্বমুখ নক্ষত্রের একটির নাম রেবতী। ছমাস পরে জ্যোতিষার্ণব ছেলেমেয়েদের মানুষ করার জন্য রেবতীকে বিয়ে করে আনে। মরে গেলে স্বর্গে যাবার অধিকার নিয়েই রেবতী এ বাড়িতে আসে বটে, বাড়িতে কিন্তু একটিও টিকটিকির দেখা সে পায় না।

তবু, সাবধানের মার নেই ভেবে জ্যোতিষার্ণব বৌকে সতর্ক করে দেয়, 'ত্মাখো, কোনদিন মরার কথা মুখে এনো না।'

রেবতী তখনও পার্শ্বমুখী, সোজা জ্যোতিষার্ণবের মুখের দিকে তাকাতে পারে না। জ্যোতিষার্ণব হরদম তাকায়। নিজে যোটক বিচার করে সে রেবতীকে বিয়ে করেছে। বিপদ দুজনের নক্ষত্র নিয়ে। তার নিজের শতভিষা নক্ষত্র আর রেবতীর উত্তর ভাদ্রপদ নক্ষত্র তাদের মিলনকে করেছে রাক্ষস ও নরের মিলনের মত।

এখন এই যে জ্যোতিষার্ণব, আমি এর জীবনে উদিত হয়েছিলাম, কি এ-ই আমার জীবনে উদিত হয়েছিল, আজও আমি এ সমস্যার মীমাংসা করতে পারিনি।

কত আর বয়স তখন আমার হবে, রেবতীর চেয়ে অনেক ছোট। কিছুদিনের জন্য থাকতে গিয়েছি ইতিহাসের প্রফেসরের বাড়ি, কি ভীষণ ভাবটাই যে হয়ে

গেল রেবতীর সঙ্গে। বয়েসের তুলনায় কি প্রকাণ্ড তখন আমার দেহ, কত পরিণত মন,—কারো স্ত্রীর সঙ্গে ভাব হওয়াটাই তখন আমার পক্ষে পরমাশ্চর্য। অথচ রেবতীর সঙ্গে সারাদিন এত বেশী কড়ি আর তাস খেলতাম যে ইতিহাসের প্রফেসরের স্ত্রী অভিমানে আমার সঙ্গে ভাল করে কথাই বলত না।

তাতে আমার সুবিধাই ছিল। আমায় যে ভালবাসে তার সঙ্গে কথা বলতে আমার বড় কষ্ট হয়। মনে হয়, শব্দ দিয়ে অনেক দামী কি যেন আদায় করে নিচ্ছি।

আমি রেবতীর সঙ্গে কড়ি খেলি, জ্যোতির্বিার্ণব দু'বার ঘুরে গিয়ে তৃতীয়বার কাছে এসে উবু হয়ে বসে।

'দেখি হে ছোকরা তোমার হাতটা! আরে বাস্ রে, এ কি হাত, এত হিজি-বিজি রেখা পেলে কোথায়? ভাল করে দেখতে হবে ত হাতটা তোমার। বাঁচবে অনেকদিন, তবে—'

রেবতী আমার হাত কেড়ে নেয়।

'খুব হয়েছে, ছেলেমানুষকে ভয় না দেখালেও চলবে।'

অন্দর থেকে বেরিয়ে যাবার সময় গণনালয়ে জ্যোতির্বিার্ণব আমায় পাকড়াও করে, শোনায় ভূতের গল্প। প্রথমে কান দিয়ে আরম্ভ করে শেষে লোমকূপ-গুলিকেও শোনার কাজে লাগিয়ে দিই। ক্ষুধাতৃষ্ণার তাগিদটা চাপা পড়ে যায়, তাকিয়ে দেখি রেবতী এসে আলমারির পাশের ফাঁকটাতে দাঁড়িয়ে আছে।

জ্যোতির্বিার্ণবের গল্প শেষ হতে বলি 'আরেকটা।'

রেবতী ম্লান মুখে চুপ করে থাকে।

জ্যোতির্বিার্ণব হাসির ভান করে বলে, 'এ বাড়ির টিকটিকিগুলি যদি মেরে ফ্যালো, তাহলে বলব। একটা টিকটিকির জন্যে একটা গল্প। এ ঘরেই ত তিনটে আছে, লাঠিটা দিয়ে মার না একটা!'

আমি বলি, 'লাঠি দিয়ে বুঝি টিকটিকি মারে? দাঁড়ান, আমার তীর ধনুক নিয়ে আসি।'

রেবতী বলে, 'মানিক, মেরো না, টিকটিকি মারতে নেই।'

আমি একটু দাঁড়াই। হিসাব করে দেখি যে, রেবতীর মত মেয়ে যখন একবার আমাকে ভালবেসেছে, কথা না শুনলেও ভাল না বেসে সে পারবে না, আমার সঙ্গে কড়ি আর পাতাবিন্তি খেলবার জন্য সে যে রকম পাগল হয়ে উঠেছে, সে

পাগলামি যাবার নয়। গল্প না বলে আমায় কষ্ট দেবার সুযোগ পেলে জ্যোতিষার্ণব: কিন্তু কিছুতেই সে সুযোগ ছাড়বে না। সোজা দোতলায় গিয়ে আমার বাঁশের ধনুক, আর শরের তীর নিয়ে আসি। তীর আমার সাংঘাতিক মারণাস্ত্র, ডগায় দুটি আলপিন বসান আছে।

এককোণে একটা টিকটিকি ছিল, ফরাসে উঠে দাঁড়ালে আমার তীরের আয়ত্তে আসে এইরকম স্থানে। নিস্পন্দ শরীর, নিস্পলক চোখ, ধূসর জীবটিকে দেখলেই মায়া হয়।

রেবতী আবার বলে, 'মানিক, মেরো না, মারতে নেই।'

রেবতীকে আমি ত্যাগ করিনি, কিন্তু তার কথার কোন দাম আমার কাছে নেই। আকর্ণ সন্ধান ক'রে চার ইঞ্চি তফাত থেকে বাণ নিক্ষেপ করি। এমন আশ্চর্য জীব টিকটিকি যে শিকারীকে গায়ের ওপর হুমড়ি খেয়ে পড়তে দেখলেও নড়ে না।

বাণবিদ্ধ টিকটিকি নিচে পড়ে। বাণটি টেনে খুলে নিয়ে দেখি, দুটি আলপিন বিঁধে টিকটিকিটার চোখের পাশে দুটি রক্তের ফোঁটা জমেছে—যেন নূতন দুটি চোখ। মানুষের রক্তের মত লাল রক্ত টিকটিকির নয়—

জ্যোতিষার্ণব হাসি চেপে হাসতে আরম্ভ করে।

'চার-চোখো করে দিলে! টিকটিকিকে চার-চোখো করে দিলে! তোমাকেও চার-চোখো হতে হবে মানিক।'

সঙ্গে সঙ্গে দেয়ালে কোথায় যেন একটা টিকটিকি ডেকে ওঠে। কে জানে বাণবিদ্ধ টিকটিকির সঙ্গে তার কি সম্পর্ক! ছেলেমেয়ের বাপ-মা হবার জন্য তারা যদি পরস্পরকে কোনদিন ডাকাডাকি করে থাকে, সে খবর কেবল তারাই জানে।

রেবতী নক্ষত্রের মত জলজলে চোখে তাকিয়ে বলে, 'ফের? ফের ছেলেমানুষকে ভয় দেখাচ্ছ?' ব'লে জ্যোতিষার্ণবের গম্ভীর মুখের দিকে চেয়ে নিজেই ভয়ে মুষড়ে যায়।

স্কুলে বোর্ডের লেখা দেখতে না পাওয়ায় এক মাসের মধ্যে আমাকে চশমা নিতে হয়। চশমা চোখ নয়, কিন্তু বন্ধুরা আমায় চার-চোখো বলে কত যে তামাসা করে ঠিক নেই।

তারপর ইতিহাসের প্রফেসরের বাড়িতে আমি কোন দিন যাই নি। চার-চোখে

রেবতীকে একবার চোখেও দেখি নি। রেবতীর কথা মনে হলেই সেই বাণবিদ্ধ টিকটিকিটার দুটি ধূসর চোখ, তার চোখ দুটির পাশে দুটি ফ্যাকাশে রক্তবিন্দুর ছবি মনে ভেসে আসে, দারুণ বিতৃষ্ণায় আমার মন ভরে যায়। রেবতীর প্রতি বিতৃষ্ণা,—রেবতীর কোন দোষ ছিল না, তবু।

হয়ত রেবতী জ্যোতির্ষার্ণবের ছেলেমেয়ের মা হয়েছে। হয়ত টিকটিকির জন্য জ্যোতির্ষার্ণবের প্রথম ছেলেমেয়ের মা স্বর্গে যেতে না পারলেও, টিকটিকির জন্যই রেবতীর স্বর্গে যাবার পথ বন্ধ হবার বিপদ কেটে গিয়েছে এবং স্বর্গে যাবার প্রতীক্ষায় সে পৃথিবীতেই স্বর্গসুখ ভোগ করছে।

এদিকে আমার বেড়েছে চশমার পাওয়ার। কখনো দেয়ালের টিকটিকি না দেখবার ইচ্ছা হলে আমার চোখ বুজতে হয় না—চশমাটা খুলে ফেললেই চলে।

বিপত্নীক

কার্তিকের কুয়াশাচ্ছন্ন প্রভাত। ঘুম ভেঙে আমি প্রকাণ্ড একটা হাই তুললাম। কাল রাত্রে গাঢ় ঘুম হয়েছে। চোখ মেলে ঘরের সিলিং-এ কালো কড়িকাঠটার পাশে একটা টিকটিকিকে আবিষ্কার করে খানিকক্ষণ অলস অর্থহীন দৃষ্টিতে সেদিকে চেয়ে রইলাম। আজ রবিবার, ওঠবার তাড়া নেই। আর ঘুমানো যাবে না বটে, কিন্তু চুপচাপ আরও ঘণ্টাখানেক বিছানায় পড়ে থাকার কল্পনাতেই প্রচুর তৃপ্তি বোধ করলাম।

বিছানার ডানদিকের অংশটা খালি। সবিতা সকালে কখন বিছানা ছেড়ে উঠে যায়, আমি কোনদিনই প্রায় তা জানতে পারি না। আমার ঘুম ভাঙতে ভাঙতে সবিতার বাসন মাজা শেষ হয়ে রান্না চেপে যায়। অত ভোরে কি করে যে মানুষ ওঠে! ভোরবেলা বিছানায় শুয়ে থাকার আরামটুকু থেকে প্রত্যেকদিন নিজেকে বঞ্চিত করেও সবিতাকে বেশ খুশীই দেখতে পাই। মুখ ধুয়ে উঠতে না উঠতে চা জলখাবার এনে দিয়ে সে যে কথাটি বলে, তাতে বোঝা যায়, রাত্রির অন্ধকার কেটে যাওয়ার পর এক মিনিট চিত হয়ে জেগে পড়ে থাকার মত কষ্টকর ব্যাপার, সবিতার মতে, জগতে আর নেই।

ডানহাতটি আলস্যভাঙার ভঙ্গীতে বিছানার শূন্য অংশে প্রসারিত করে দিলাম। সবিতার অঙ্গের উত্তাপ উবে গিয়ে বিছানা ঠাণ্ডা হয়ে আছে।

হঠাৎ আমার মনে পড়ে গেল, কাল রাত্রে সবিতার সঙ্গে ঝগড়া করেছিলাম।

এতক্ষণ এ কথাটা একেবারেই ভুলে গিয়েছিলাম। মনে পড়ামাত্র রৌদ্রহীন শীতল প্রভাতে সমস্ত রাত্রিব্যাপী গাঢ় নিদ্রার জের টেনে চলার আনন্দ এক মুহূর্তে নিঃশেষ হয়ে গেল। আরামে এলানো অঙ্গপ্রত্যঙ্গ নিজের অজ্ঞাতেই গুটিয়ে সঙ্কুচিত করে নিলাম।

কি কটু কলহই কাল আমরা করেছিলাম!

আমরা করেছিলাম? কথাটা বিবেচনা করে দেখবার সময় না নিয়ে খুব সংক্ষেপেই নিজেকে জবাব দিলাম,—না। ঝগড়া বলি, কলহ বলি, কাল আমি একাই সব করেছিলাম। মাঝে মাঝে ক্ষীণ করুণ প্রতিবাদ করে কাঁদা ছাড়া

সবিতা তাতে আর কোন অংশ গ্রহণ করে নি। কাল আমাদের মধ্যে যে ব্যাপার ঘটেছিল, চাপড়া চাপড়া রঙ চড়িয়েও তাকে দাম্পত্য কলহ কোনমতেই বলা যায় না।

সবিতাকে কাল আমি করেছিলাম শাসন।

মনের মধ্যে তীব্র বিদ্বেষ নিয়ে অত্যন্ত হিংস্রভাবেই ওকে কাল আক্রমণ করেছিলাম। যা মুখে এসেছে অবাধে কাল তাই সবিতাকে বলেছিলাম। যে বিশেষণ যত বেশী রূঢ়, যত বেশী কদর্য মনে হয়েছে, তাই দিয়ে ওকে অভিহিত করে কাল আমার আনন্দ হয়েছে তত বেশী। মেয়েদের একেবারে মর্মে গিয়ে আঘাত করে মানুষের ভাষায় এমন শব্দ যত আছে তার একটিও কাল বোধ হয় ব্যবহার করতে বাকী রাখিনি। শেষে রাগ সামলাতে না পেরে পায়ের এক পাটি চটি জুতো ওকে ছুঁড়ে মেরেছিলাম।

সেইখানেই ইতি। দুহাতে চোখে আঁচল চাপা দিয়ে সবিতা তখন কাঁদছিল। চটিটা সজোরে তার কান্নায় ফুলে ওঠা বুকে গিয়ে লাগল। চোখ থেকে আঁচল সরিয়ে সবিতা তখন একবাব জুতোটার দিকে একবার আমার মুখের দিকে তাকিয়েছিল। দুচোখ তার জলে ভরপুর, সবিতা কি দেখেছিল বলতে পারব না। কিন্তু তার মুখের যে ভাব দেখেছিলাম এখনো আমার স্পষ্ট মনে আছে।

তবু, রাত্রে গাঢ় ঘুম হতে বাধা হয় নি। সবিতাকে শাসন করার জন্য না হোক, জুতা খেয়ে তার অবর্ণনীয় মুখভঙ্গী দেখার জন্যও না হোক, যে কারণে কাল ওরকম ক্ষেপে গিয়ে স্ত্রীকে শাসন করেছিলাম সারারাত কণ্টকশয্যায় তাকে জাগিয়ে রাখার পক্ষে তাই কি যথেষ্ট ছিল না? এই মাত্র মনের মধ্যে যে নিবিড় শান্তি অনুভব করছিলাম তা স্মরণ করে অবাক্ হয়ে গেলাম। স্ত্রীর চরিত্রে সন্দেহ করে যে স্বামী রাত্রে স্ত্রীকে চটিজুতো ছুঁড়ে মারে, সারারাত অঘোরে ঘুমিয়ে সকালে চোখ মেলেই কি করে সে অত আরাম বোধ করে? পৃথিবীতে শীতের আমেজ এসেছে টের পেয়ে উল্লসিত হয়ে ওঠে?

ঘুম ভেঙেই আমার অনুতপ্ত হয়ে ওঠা উচিত ছিল। কাল বাড়াবাড়ি করেছিলাম বইকি! নিছক একটা সন্দেহের উপর অত কাণ্ড করার কোন সমর্থনই শান্ত মনে কথাটা ভেবে দেখতে গেলে খুঁজে বার করা যায় না। স্ত্রীকে অবশ্য মাঝে মাঝে শাসন করা ভাল। বড় পাজী জাত। কেবল আদর দিলে একেবারে মাথায় উঠে যায়। কিন্তু শাসনের যে একটা মাত্রা থাকা দরকার, এটা

অস্বীকার করব কেন? সবিতাকে ত কম ভালবাসি না। এই যে দশটা থেকে পাঁচটা অবধি আপিসে কলম পিষে মরি, সে কার জন্য? সবিতার জন্য নয় কি! ওর ভালর জন্যই ওকে মাঝে মাঝে শাসন করা প্রয়োজন। কাল কিছু না বলে চুপ করে থাকলে শেষ পর্যন্ত ওরই ত ক্ষতি হ'ত! নিজের ভালমন্দ মানুষ সব সময় বুঝতে পারে না। বিশেষতঃ মেয়েমানুষ। ভুল-ত্রুটি দেখিয়ে দিলে, ভুল সংশোধনের জন্য একটু বকলে তাতে ওদের মঙ্গলই হয়।

কিন্তু অতটা না করলেই হ'ত। অন্ততঃ ঘুমিয়ে পড়ার আগে সহজভাবে ওর কাছে একগ্লাস জলটল চেয়ে নিয়ে অথবা পা কামড়াচ্ছে বলে দুচার মিনিট ওকে একটু সেবা করতে দিয়ে ব্যাপারটা স্বাভাবিকতার স্তরে নামিয়ে আনলে কোন ক্ষতিই ছিল না।

পাশ ফিরলাম। তাকিয়ে দেখি, সবিতাকে ছুঁড়ে মারা জুতোর পাটিটা কাল রাত্রে যেখানে পড়েছিল, সেইখানেই এখনও পড়ে আছে। মনে হল, এতক্ষণে আমার যেন সত্যসত্যই একটু অনুতাপ হচ্ছে।

কিন্তু সান্ত্বনা খুঁজে নিতেও দেরি হল না। যা' হবার হয়ে গিয়েছে। হাত থেকে খসে যাওয়া ঢিল আর আর মুখ থেকে খসে যাওয়া কথার মত আর ফিরবে না। দুঃখ বা অনুতাপ করে লাভ নেই। শুয়ে শুয়ে আরাম করাটা আজ আর কপালে হল না। উঠে গিয়ে সবিতাকে একটু খুশী করতে হবে।

সবিতাকে একটু খুশী করার জন্য কি পদ্ধতি অবলম্বন করব শুয়ে শুয়ে তাই ভাবতে লাগলাম। ক্ষমাটমা চাইতে পারব না। স্ত্রীর কাছে দুঃখ প্রকাশ, মার্জনা ভিক্ষা,—এসব আমার ধাতে নেই। ভাবলেও কি রকম সঙ্কোচ বোধ হয়, বাধোবাধো ঠেকে। কাল রাত্রের কথাটা উত্থাপনই করব না। কাল যেন সবিতাকে কিছু বলিনি এমনি একটা অভিনয় করে যাব। প্রতিদিন যেমন চটি ফটর ফটর করে নিচে নামি আজও তেমনি শব্দ করে নিচে নামব, কলতলায় গলা খাঁকরে মুখ ধোব। সাড়া পেয়ে উনান থেকে হাঁড়ি নামিয়ে সবিতা চায়ের কেটলি চাপিয়ে দেবে, কিন্তু মুখ ধুয়ে আজ আর দোতলায় উঠে যাব না। একেবারে রান্নাঘরে হাজির হয়ে নিজেই একটা আসন টেনে নিয়ে বসব। গম্ভীর মুখে নয়, মুখখানা বেশ হাসি হাসি করে। সবিতা বিষণ্ণতা ও অভিমানে নিজেকে আচ্ছন্ন ও নির্বাক করে সামনে খাবার দিলে খেতে খেতে একথা বলব, সেকথা

বলব। সবিতা ভাল করে জবাব না দিলেও কিছুই যেন লক্ষ্য করিনি এমনি-ভাবে নিজের কথার স্রোতকে অব্যাহত রেখে যাব।

সবিতা প্রথমটা নিশ্চয় একটু অবাক হয়ে যাবে। ভাববে, ব্যাপারখানা কি? কাল রাতে আমাকে অমন করে যে গাল দিলে, সে সেধে এসে এত কথা কইছে! তারপর একসময় সে বুঝতে পারবে তার গভীর অপরাধ স্বামী তার এবারের মত ক্ষমা করেছে। কাল রাত্রের ব্যাপার কাল রাত্রেই চুকে গিয়েছে—আজ সকালে তার জের নেই। এটা বুঝতে পেরে সবিতাও ক্রমে ক্রমে সহজভাবে কথা বলতে আরম্ভ করবে। রাগ করে থাকার যার উপায় নেই, রাত্রের শাসন সকালে উঠে নতুন করে আরম্ভ করলেও যার বলার কিছু ছিল না, নিজে থেকে তাকে যেচে সহজভাবে কথা বলা, সহজভাবে চলাফেরা করার সুযোগ দেওয়ার জন্য স্বামীর প্রতি সবিতার ভক্তি জন্মে যাবে! ভাববে, স্বামী আমার সদাশিব। যে অন্যায় করছিলাম বা করতে যাচ্ছিলাম, অন্য স্বামী হলে আমাকে একেবারে মেরেই ফেলত। আমার স্বামী একটু শাসন করেই ক্ষান্ত হয়েছে। শুধু তাই নয়, সকালে উঠে এমনি করে আমার মান রাখল, আমার অভিমানের মর্যাদা দিল।

মুখে হয়ত সবিতা কিছুই বলবে না। মেয়ে ত কম চাপা নয়! কিন্তু কৃতজ্ঞতায় তার চোখ ছলছল করবে। স্বামিপ্রেমে স্বামিগর্বে তার মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠবে। স্বস্তি ও আনন্দ তার গৃহকর্মের সুচারু সম্পাদনায় স্পষ্ট রূপ নিয়ে ফুটে উঠবে।

উঠে বসলাম। অনুতাপ মিলিয়ে গিয়ে মন এখন খুশী হয়ে উঠেছে। কাল রাত্রে সবিতাকে তার প্রাপ্যের যতটুকু অতিরিক্ত শাসন করেছি, আজ তার তিন-গুণ সোহাগ ফিরিয়ে দেব। যে সোহাগ করে, শাসনও ত সে-ই করে! একটি মাত্রা ছাড়িয়ে গেলে অন্যটি বেশী মাত্রায় দিলে ক্ষতিপূরণ হয়েও কিছু লাভ থাকতে কোন বাধা নেই। সবিতার আজ লাভের কপাল।

একপাটি চটি পায়ে দিয়ে ন্যাংচাতে ন্যাংচাতে গিয়ে সবিতাকে ছুঁড়ে মারা চটিটা অন্য পায়ে লাগালাম। বাঁয়ে সবিতার ড্রেসিং টেবল্। আয়নাটা কুয়াশায় ম্লান হয়ে আছে। সবিতার এই বিলাসিতার ব্যবস্থা করেছি আমি। সবিতার বাপ যৌতুক দেয়নি! বাপের জন্মে সবিতা ড্রেসিং টেবল্ দেখেছে কিনা সন্দেহ। ডাইনের আলনায় সবিতার রঙ-বেরঙের কাপড় সাজানো। কুয়াশায় কাপড়গুলির

ভাল রঙ খোলেনি। এসবও আমি কিনে দিয়েছি সবিতাকে, সবিতাকে ভালবেসে কিনে দিয়েছি। সামনে বেঞ্চির উপর সবিতার বাক্স, ক্যাসবাক্স, স্যুটকেস, হারমোনিয়ম। কুয়াশায় সবিতার এই সম্পত্তিগুলিকে কেমন যেন মন-মরা দেখাচ্ছে। সবিতার জন্য মাথার ঘাম পায়ে ফেলে উপার্জন করা টাকায় এগুলি কেনা। চারিদিকে সবিতার প্রতি আমার উদারতার সংখ্যাতীত প্রমাণ দেখে, সবিতাকে যে অনন্যসাধারণ ভালবাসা দিয়েছি এ বিষয়ে একেবারে নিঃসন্দেহ হয়ে, আমি আরও গভীর তৃপ্তি বোধ করলাম। এতক্ষণে বুঝতে পারলাম, কাল রাত্রে ধৈর্য হারিয়েছিলাম কেন। সবিতাকে ভালবাসি বলে। সবিতার প্রতি প্রেম আমার এত তীব্র যে ঈর্ষাও সেই অনুপাতেই প্রচণ্ড হয়। একটা মিথ্যা সন্দেহ পর্যন্ত তাই আমাকে একেবারে ক্ষেপিয়ে দেয়।

সবিতা ঘরের দরজা ভেজিয়ে দিয়ে গেছে। দরজাটি খোলা, ঘেরা বারান্দায়। সেও একটি লম্বাটে ঘরেরই মত। রাত্রে এই বারান্দার দরজা বন্ধ করা হয়, কিন্তু ঘরের দরজাটি খোলাই থাকে। বন্ধ করার দরকার হয় না। সকালে বারান্দায় রাত্রি-ভোজনের এঁটো বাসন তুলে ধোয়া-মোছার শব্দে আমার ঘুমের ব্যাঘাত হয় ব'লে সবিতা দরজাটি ভেজিয়ে দিয়ে যায়।

সবিতার ড্রেসিং-টেব্‌লের আয়নায় খানিকক্ষণ নিজের মুখখানা নিরীক্ষণ করে ভেজানো দরজা খুলে বারান্দায় গেলাম। প্রথমে চোখে পড়ল এঁটো বাসনগুলি, তারপর সিঁড়ির বন্ধ দরজাটা—তারপর দোদুল্যমানা সবিতাকে।

উঠানের দিকের দুটো বড় বড় খোলা জানালা দিয়ে আলো আসছিল। এক মুহূর্ত্তে বুঝতে পারলাম সবিতা গলায় দড়ি দিয়েছে।

পাশের বসবার ঘর থেকে হাল্কা টেবিলটা এনে তার উপরে চেয়ার পেতেও সে বোধ হয় কড়িকাঠের নাগাল পায়নি। তাই টেবিল চেয়ার একপাশে সরিয়ে রেখেছে। ছেলে হলে যে হুক থেকে সবিতার ছেলের দোলনা ঝুলত, দড়ি ছুঁড়ে ছুঁড়ে সবিতা তাতে দড়ি আটকেছে বোধ হয়। কিন্তু এ কাজে যে পরিমাণ অধ্যবসায় দরকার হয়েছিল, আত্মহত্যা করতে চাওয়ার উন্মত্ততা ছাড়া, ছুঁড়ে ছুঁড়েই সে যে কড়িকাঠে দড়ি আটকেছিল, তারও কোন প্রমাণ নেই। হয়ত অন্য কোন উপায়ে এই কাজকে সে সম্ভব করেছিল। রাত্রির গাঢ় অন্ধকারে মানুষের ঘুমের আড়ালে যে মরতে যায়, বুদ্ধি হয়ত তার এমন তীক্ষ্ণ হয়ে ওঠে, অসম্ভব কাজকে সম্ভব করার এমন উপায়ই হয়ত সে অবিষ্কার করে ফেলে যে

প্রত্যেকটি সকালে যারা ঘুম ভেঙে জীবিত অবস্থায় বিছানায় উঠে বসার আশা পোষণ করে, তারা সেই বুদ্ধির প্রক্রিয়াকে আবিষ্কার করার কল্পনা পর্যন্ত করতে পারে না।

গলায় ফাঁসিটা পরাবার আগে কাল সবিতা কি করেছিল জীবনে কখনো আমি তা জানতে পারব না, ভাবতেও পারব না।

এই সমস্যাই যেন আমাকে বিচলিত করে দিল। সবিতা গলায় দড়ি দিয়েছে এটা বুঝতে আমার দেরিও হয়নি, অসুবিধাও হয়নি। কিন্তু কড়িকাঠের অত উঁচু হুকে সে দড়ি আটকাল কি করে এটা বুঝতে না পেরে কাতর হয়ে পড়লাম। অসহায়ের মত চারিদিকে তাকাতে লাগলাম। সবিতা গলায় দড়ি দেবার ঠিক আগের কাজটিকে সে দুর্বোধ্য ও রহস্যময় করে রেখে গেছে বলেই আমার মাথাব মধ্যে ঝিমঝিম করে উঠল। সবিতা কি করে কড়িকাঠে তার মৃত্যুর আয়োজন করল এ কথাটা আমাকে কে বুঝিয়ে দেবে?

আত্মহত্যা করে সবিতা আমাকে সবই বুঝিয়ে দিয়ে গেল, এই একটা তুচ্ছ গোপনতার মোহ সে কাটাতে পারল না কেন?

সবিতাকে আমি সবদিক দিয়েই চিনেছিলাম। সে কি খেতে ভালবাসে, কোন্ গয়না, কি রঙেব শাড়ী তার পছন্দ, কি কথা বললে সে খুশী হয়, কোন্ স্তরে সে অনায়াসে উদার হয়ে থাকে, এ সবই আমাব জানা ছিল। সংসারে কার প্রতি তার কতটুকু মমতা আমি তার হিসাব রাখতাম। অলস কল্পনার মুহূর্তগুলি ছাড়া ওর স্বামিপ্রেমের গভীরতাও আমি নির্ভুলভাবে পরিমাপ করতে পেরেছি। সবিতা ছিল আমার অতি জানা অতি চেনা বৌ।

কাল ওর সম্বন্ধে যে বিষয়ে আমার জ্ঞান ছিল না কিন্তু সন্দেহ ছিল, আজ সবিতা আত্মহত্যা করে সে বিষয়েও আমাকে পরিপূর্ণ জ্ঞান দিয়েছে। সন্দেহ আমার মিথ্যা নয়, এই সত্য প্রকাশ কবে যেতে গলায় সবিতা দড়ি দিয়েছে বলে আমার দুঃখ নেই। কিন্তু দড়িটা হুকে সে আটকাল কি করে?

সিঁড়ি

একতলার উত্তরপ্রান্ত থেকে দোতলা আর তিনতলায় মধ্যস্থতা অতিক্রম ক'রে সিঁড়িটা তেতলার খোলা ছাদে গিয়ে পৌঁচেছে। এই সিঁড়ি বেয়ে খোলা ছাদে পৌঁছানোর জন্যে সাধারণ নিয়মে চৌষট্টিবার একটি পায়ের জোরে মাধ্যাকর্ষণের বিরোধিতা করতে হয়। তবে সাধারণ নিয়ম সকলের জন্য নয়। এমন মানুষও জগতে আছে যারা সিঁড়ি দিয়ে ওপরে ওঠবার সময় দুটো তিনটে ধাপ একেবারে ডিঙিয়ে যায়। এরা মানুষ হয়েও ঠিক মানুষ নয়,—মহামানব। মহামানব এইজন্যে যে এ জগতে মহামানবী নেই, কারণ মেয়েরা কোনদিন দুটো তিনটে ধাপ ডিঙিয়ে ওপরে ওঠে না। ক্ষমতাও নেই, বাধাও আছে।

চৌষট্টি ধাপের সিঁড়িটাকে ঢাকা দেবার ছাদটুকুর উপরে পাতলা দেয়াল আর টিনের চালের একটি চিলেকুঠি আছে এ বাড়িতে। পথ থেকে বাড়ির ভিটেয় ওঠবার জন্য আর একতলার বারান্দা থেকে উঠানে নামবার জন্য এ বাড়িতে ধাপের ব্যবস্থা মোটে একটি করে, কিন্তু চিলেকুঠিতে ওঠা-নামার জন্য ধাপ আছে দুটি, তাই এও একটা সিঁড়ি। দুটি একের সমষ্টি যখন দুই এবং ধাপের সমষ্টি মাত্রেই সিঁড়ি, চিলেকুঠিটিকে সিঁড়ি থাকার গৌরব না দিয়ে উপায় নেই।

চৌষট্টি ধাপের সিঁড়িটিকে বাড়ির ছায়াই শীতল করে রাখে, চিলেকুঠির সিঁড়ি কিন্তু চিলেকুঠির ছায়া পায় শেষ-বেলায়, গ্রীষ্মকালেও সূর্য যখন নিস্তেজ। মেঘলা দিন বাদ দিয়ে শীতের দুমাস পরেও দুপুরবেলা চিলেকুঠিটি হয়ে থাকে শীতার্ত মানুষের স্বর্গ আর সিঁড়িটা হয়ে থাকে আগুন। শীতগ্রীষ্ম নির্বিশেষে যে শীতার্ত, তারও পায়ের পাতা পুড়িয়ে দেয়।

ডান পায়ের চেয়ে ইতির বাঁ পা-টি লম্বায় প্রায় এক ইঞ্চি ছোট। হ্রস্ব পাখানি প্রথম ধাপে নামিয়েই সে তুলে নেয়। ব্যাপারটা মানবকে ভাল করে বুঝিয়ে দেওয়ার জন্য দাঁতের ফাঁকে সজোরে শব্দ করে, 'ইস্!'

মানব বলে, 'গরম বুঝি?'

ইতি বলে, 'আগুন হয়ে আছে।'

ঘরে কুঁজোয় জল ছিল, একতলা থেকে মানবের নিজের বয়ে আনা জল। কুঁজো কাত করে মানব সিঁড়িতে জল ঢেলে দেয়। যতক্ষণ সে জল ঢালতে থাকে ইতি কথা বলে না, সবটুকু জল মানব ঢেলে দেয় কিনা দেখবার জন্যে চুপ করে থাকে। কুঁজো খালি হয়ে গেলে মানবের হাত চেপে ধরে বলে, 'সব জল ঢেলে দিলে? একটু খেতাম আমি, তেষ্টা পেয়েছে।'

'এতক্ষণ খাওনি কেন?'

'এতক্ষণ কি মনেছিল? জল দেখে খেয়াল হল।'

মানব একটু হাসে। চল্লিশ বছরের পুরনো মুখখানায় সাতদিনের দাড়ি-গোঁপ জমেছে, বাঁ দিকের গালটি কবে যেন চিরে সেলাই করে দেওয়া হয়েছিল। ঘাম মুছে মুছে মাজা বাসনের মত কপাল চিক্‌চিক্ করছে। তামাকের ধোঁয়ায় ঠোঁট দুটি কালো। দাঁতে আর মুখে বেহিসেবী পান খাওয়ার ইতি-চিহ্ন। শান্ত নির্মল হাসিটুকু তাই আরও অপূর্ব মনে হয়,—ইতির মুখও সলজ্জ হাসিতে ভরে যায়, ব্রণের ছোট ছোট গর্ত-ভরা দুটি গালেই টোল পড়ে সৃষ্টি হয় দুটি বড় গহ্বরের।

মানব বলে, 'চলো নিচে যাই। তুমি জল খাবে আমি কুঁজোটা ভরে নিয়ে আসব।'

ইতি বলে, 'তোমার তেষ্টা পায়নি?'

মানব বলে, 'পাবে পাবে, ভাবছ কেন?'

ধাপ দুটি ভাসিয়ে কুঁজোর জল ছাদে তিনটি ধারায় ভাগ হয়ে গিয়েছিল, নালীর কাছাকাছি একসঙ্গে মিলে এতক্ষণে নালী দিয়ে নিচে ঝরে পড়তে আরম্ভ করেছে। সমস্ত ছাদে শুকনো শেওলা, আর কয়েকটি দুপুরের রোদ পেলেই আলগা হয়ে উঠে আসবে, আর সন্ধ্যার পর মানবের পায়চারিতে গুঁড়ো হয়ে যাবে। কুঁজো হাতে এক ধাপ নেমেই বোধ হয় আগামী সন্ধ্যায় নিজের পায়চারি করার দৃশ্যটা কল্পনায় ভেসে ওঠে মানবের, মুখ ফিরিয়ে সে জিজ্ঞাসা করে, 'সন্ধ্যার সময় আসবে একবার?'

'না এলে রাগ করবে?'

'রাগ? আর কি তোমার ওপর রাগ করতে পারি? এবার থেকে অভিমান করব।'

'তাহলে আসব না।'

মানব খুশী হয়ে বলে, 'সেই ভাল। আজ একা একা তারা গুণে অভিমান করব, কাল তুমি এসে আমার অভিমান ভাঙাবে। আমার এমন ছেলেমানুষি করতে ইচ্ছে করছে ইতি! কি রকম যে লাগছে আমার কি বলব!'

'আমারও।'

দৃষ্টির একটু গভীরতা এসেছে বইকি মানবের, মনটা ত অন্ততঃ শান্ত হয়েছে। দুজনেই যখন ছাদে নেমেছে, সে হঠাৎ ব্যাকুলভাবে জিজ্ঞাসা করল, 'তোমার কষ্ট হচ্ছে না ত ইতি?'

'না গো, না। কিসের কষ্ট?'

সন্ধ্যার পর না এসে ইতি তাকে অভিমান করবার সুযোগ দেবে, পরামর্শ হয়েছে এই। এখনই যেন মানবের অভিমান হয়, মুখখানা গম্ভীর করে সে বলে, 'তোমার চেয়ে আমি অনেক বড় কিনা, তাই বলছি।'

'আমিই বা কি এমন আকাশের পরী!'

অভিমান গাঢ় হয়, মানবের চোখ পর্যন্ত যেন ছল্‌ছল্ করে।

'আকাশের পরী হলে তুমি আমার দিকে তাকিয়েও দেখতে না ত?'

'কি ছেলেমানুষ তুমি!'

আকাশে রোদ, ছাদ গরম। আবার মানবের মুখ হাসিতে ভরে যায়, ইতির কাঁধে মুখ রেখে কথা বলতে গিয়ে কিছু না বলাই সে ভাল মনে করে। কথা বলার চেয়ে কঠিন হাসি হেসে ইতিকে তাই হাসির জবাব দিতে হয়। এ কি আশ্চর্য যে নিচে নামবার কথা ভুলে যাওয়ার মত ভঙ্গীতে দুজনে কয়েক মুহূর্তের জন্যও দাঁড়িয়ে থাকতে পারে? পায়ের তলার ছাদটুকু ছাড়া আর সব যেন অনাবশ্যক হয়ে গেছে। অনেক উঁচুতে এই ছাদ,—দামী একটা হাউই পৃথিবী ছেড়ে যত উঁচুতে উঠতে পারে হয়তো তত উঁচুতে নয়, কিন্তু কে আর সে আপেক্ষিক তত্ত্ব প্রমাণ করতে বসবে দামী হাউই ছেড়ে? আশেপাশের বাড়িগুলি ত এত উঁচু নয়, এ বাড়ির মত ইট বের করা নয় ব'লে কেবল দেখতে সুন্দর। কিন্তু সেটুকুও এ বাড়ির ছাদে যারা দাঁড়িয়ে থাকে তাদেরই ভাল লাগে, চোখ মেললেই সমগ্রভাবে চোখে পড়ে। তাছাড়া পাওয়া যায় আচ্ছন্ন, অভিভূত হওয়ার একটা অতিরিক্ত ক্ষমতা।

'ইস্!'

এবার মানবের চমক লাগে।

'গরম বুঝি ?'

'আগুন হয়ে আছে।'

মানব আপসোস করে বলে, 'তোমাকে আজ খালি কষ্ট দিচ্ছি।'

'দিচ্ছই ত। খালি খালি কষ্ট দেওয়ার কথা বলছ।'

চৌষট্টি ধাপের সিঁড়ির ছায়াতে নেমে যাওয়ামাত্র দুজনে যেন আশ্চর্য হয়ে পরস্পরের মুখের দিকে তাকায়। মানব বলে, 'সিঁড়িটা ত বেশ ঠাণ্ডা।'

ইতি সান্ত্বনা দিয়ে বলে, 'গরম থেকে এলে কিনা। এতক্ষণ কিন্তু বুঝতেই পারিনি তোমার ঘরটা কি গরম।'

ধীরে ধীরে ইতি নামতে থাকে, প্রতি মুহূর্তে এলিয়ে পড়তে চাওয়ার মত অলস অনিচ্ছুক পদে। সিঁড়ির মুখের কাছে তাপ ও আলো মেশার ফলে ছায়া একটু কম শীতল, কম ম্লান। প্রত্যেক ধাপ নামার সঙ্গে যেন বুঝতে পারা যায় ছায়া গাঢ় হচ্ছে, শীতলতা বাড়ছে। কিন্তু এই গরমে কোন ছায়াই এমন শীতল হতে পারে না যে একটু আরাম দেওয়ার বেশী কিছু দিতে পারবে, ইতি কিন্তু একবার শিউরে ওঠে। জ্বরের রোগীর গায়ে কেউ যেন হঠাৎ বরফের ছেঁকা দিয়েছে।

তেতলার বারান্দায় বছরখানেকের ছেলে কোলে একটি মেয়ে দাঁড়িয়ে ছিল। ছেলেটি চুষছিল চুষিকাঠি আর মেয়েটি চুষছিল ছেলেটির গোটাতিনেক আঙুল। সিঁড়ির মাঝামাঝি বাঁকের ধাপটি একটু প্রশস্ত, সেখানে দাঁড়িয়ে ইতি শিহরণটুকু সামলায়, তারপর ফিরে যাওয়ার উপক্রম করে, কিন্তু উপক্রম করেই ক্ষান্ত হয়। ছুটে পালানোর এই আকস্মিক প্রেরণার জন্তই বোধ হয় মুখখানা একটু অপ্রসন্ন ও ক্লিষ্ট হয়ে ওঠে, ততক্ষণে মানবও এদিকে ভদ্রতা করে ফেলেছে।

'মায়ে-পোয়ে কি হচ্ছে ?'

মেয়েটি মাথায় কাপড় তুলে দেয়, মুখ থেকে ছেলের আঙুল খসে পড়ে। অনাবশ্যক নীরবতার সঙ্গে খানিকক্ষণ ইতির দিকে চেয়ে থেকে বলে, 'এমনি দাঁড়িয়ে আছি।'

'নরেন আজ কখন আপিস চলে গেল, জানতেও পারিনি।'

'উনি ভোরবেলা বেরিয়ে গেছেন, আমার বোনের বাড়ি হয়ে আপিস যাবেন। আজ ধীরেসুস্থে রান্নাবান্না করেছি, একেবারে রাঁধবই না ভেবেছিলাম, হঠাৎ

আমার জ্বাওর এসে পড়ল কিনা, তাই রেঁধেছি। রেঁধেবেড়ে না খাওয়ালে নিন্দে করত ত? গিয়ে বলত, ভাইকে ত পর করেইছি, বাড়িতে এলে একবেলা খেতেও বলি না,—এইমাত্র চলে গেল। কেন এসেছিল জানেন? টাকা চাইতে! এদিকে আমার নিন্দে ছাড়া মুখে কথা নেই, দাদাকে বাড়ি না পেয়ে আমার কাছে দিব্যি দশটা টাকা চেয়ে বসল। আমি বললাম আমি টাকা কোথায় পাব, দাদার কাছ থেকে নেবেন।—তুই ছাতে কি করছিলি ইতি?'

ইতি বলে, 'বাড়ি ভাড়া দিতে গিয়েছিলাম। মা বললে, ভাড়ার টাকাটা দিয়ে আয় ত ইতি, সেই জন্য।'

ছেলের ভার ডান হাত হতে বাঁ হাতে গ্রহণ করে আবার মেয়েটি অনাবশ্যক নীরবতার সঙ্গে ইতির দিকে খানিকক্ষণ চেয়ে থাকে, তারপর হঠাৎ একটা ভুলে-যাওয়া কথা মনে পড়বার ভঙ্গীতে বলে, 'ও, হ্যাঁ—আমাদের ভাড়ার টাকাটাও ত দেওয়া হয়নি। কি করেই বা দেব, কাল ত মোটে মাইনে পেলেন। আজ দিতে বলে গেছেন। একটু দাঁড়ান, টাকাটা এনে দিই, কেমন? খোকাকে একটু ধরবি ভাই ইতি?'

ইতির কোলে ছেলে দিয়ে আঁচলে বাঁধা চাবির গোছায় বারকয়েক ঝনাৎ শব্দ করে তুলে ঘরের ভিতরে মেয়েটি বাক্স খোলে। গোটা দুই বাক্স মোটে তার সম্পত্তি কিন্তু চাবির গোছায় চাবি যেন আঁটে না, আঁচল ছিঁড়ে পড়তে চায়। বাক্স খোলা আর বন্ধ করতেও কত যে অনাবশ্যক শব্দের সে সৃষ্টি করে বলবার নয়।

মানব নিচু গলায় ইতিকে জিজ্ঞাসা করে, 'তোমাদের ভাড়া দিতে এসেছিলে নাকি?'

ইতি বলে, 'না। ওর কাছে একটা কৈফিয়ত দিতে হবে ত?'

ইতিকে খোকা অনেকদিন থেকে চেনে, প্রায় আজন্ম। কিন্তু ইতি কোনদিন তার হাতের আঙুল মুখে পুরে চোষে না বলেই বোধ হয় ইতির কোলে থাকতে তার ভাল লাগে না। চুষিকাঠিটা প্রথমে নিচে পড়ে যায়, এদিক-ওদিক চেয়ে খোকা মুখ বাঁকায়, তারপর মানব তার গালে একটা টোকা দেওয়ামাত্র সে কাঁদতে আরম্ভ করে।

বাক্সে চাবি দিতে দিতে মেয়েটি আনন্দে গদ্‌গদ হ'য়ে বলে, 'আসছি রে আসছি, দুষ্টু কোথাকার! একমিনিট আমায় ছেড়ে থাকতে পারবি না, আচ্ছা ছেলে হয়েছিস্ ত তুই?'

ভাড়ার টাকা, স্বামীর লিখে রাখা রসিদ আর এক কলম কালি নিয়ে খোকার মা বারান্দায় আসে, মানবকে টাকা গুণে দিয়ে রসিদে তার সই নেয়, তারপর ছেলেকে কোলে করে বলে, 'এত টাকা ভাড়া ত পান, কি করেন টাকা দিয়ে? সমস্ত বাড়িটা ভাড়া দিয়ে এই গরমে একা একা চিলে-ঘরে কি করে থাকেন আপনি! আমি হলে ত পারতাম না।'

মানব ভাড়ার টাকা কোমরে গুঁজে বলে, 'না পেরে উপায় কি, খোকার বাবার মত আমি ত চাকরি করি না।'

খোকার মা চোখ বড় বড় করে বলে, 'আপনার আবার চাকরি! একমাসে আপনি যা স্বদ পান, ওঁর মাইনের তা ক'গুণ কে জানে! একটু শুইগে' খোকাকে নিয়ে, ঘুমিয়ে পড়ে ত তোকে ডাকব, ইতি। পাখীটার ঠোঁট আর পা ছুটো ভাল হচ্ছে না একটু দেখিয়ে দিস্। ক'টা করে ঘর বুনতে বলেছিলি ভুলে গেছি ভাই, যা তুষ্টুমি করে খোকা!'

মানব বলে, 'আরেকজন তুষ্টুমি করে না?'

'করে না?'—ফিক্ করে হেসে ফেলে পাক দিয়ে ঘুরেই খোকার মা ঘরের ভিতরে চলে যায়। কুঁজোটা তুলে নিয়ে মানব সিঁড়ির এক ধাপ নেমে দাঁড়ায়। মুখ ফিরিয়ে বলে, 'এসো, দাঁড়িয়ে রইলে কেন?'

ইতি নীরবে আসে। সমতল বারান্দায় ছোট বড পা নিয়ে চলার ভঙ্গীটি তার বেশ। অন্য সব মেয়ে যেন শুধু চলে। ইতি একটা অজানা ছন্দে তুলে তুলে চলে। কোলে ছেলে নেই ইতির, আঁচলে নেই চাবির ভার, তবু বুকে পিঠে কাঁখে ছেলে যেন আছে তার অনেকগুলি, আঁচলে বাঁধা আছে সে যত ভার বইতে পারে না তার চেয়ে বেশী ভারী চাবির গোছা।

সিঁড়ি বেয়ে নামতে নামতে মানব বলে, 'তোমাদের পাঁচ মাসের ভাড়া বাকী আছে।'

'হ্যাঁ।'

মানব রসিকতা করে বলে, 'অন্য কোন ভাড়াটে হলে কবে তুলে দিতাম।'

'হ্যাঁ।'

'রাগ হল নাকি, ভাড়ার কথা বললাম বলে?'

'না না, রাগ কিসের?'

সিঁড়ি বেয়ে তেতলায় নামার শিথিল এলায়িত ভঙ্গী এখন দোতলায় নামার

সময় স্খলিতপদে নামার ভঙ্গীতে দাঁড়িয়ে গেছে। নামাও যেন কম পরিশ্রমের কাজ নয়।

মানব মুখ ভার করে বলে, 'অত হিসেব করে কথা বলা আমার আসে না। যা মনে আসে বলে ফেলি। কি এমন বললাম যে তোমার মুখ ভার হয়ে গেল?'

ইতি একটু হাসে। হাসলে মুখের ভার হাল্কা হয়।

'মুখ আবার ভার হল কোথায়? কি ছেলেমানুষ তুমি! তোমার কথায় কি আর মুখ ভার করেছি, মুখ ভার করেছি তেতলার ওই লক্ষ্মীছাড়ীর কথায়। খোকার বাবা ত এদিকে মাইনে পায় তেষট্টি টাকা, অহঙ্কারে যেন ফেটে পড়ছে!'

সুতরাং মানবও হাসে। ইতির কথায় স্ত্রী-চরিত্রের একটা স্থূল দিক ফুটে উঠেছে আর নিজের সূক্ষ্ম বুদ্ধি দিয়ে সেটা ধরতে পেরেছে বলে গর্ব আর আমোদ অনুভব করে। ইতিকে নাড়া দিয়ে স্ত্রী-চরিত্রের আরও দুটো দিক আবিষ্কারের আশায় বলে, 'কেন, নরেনের বৌ বেশ লোক।'

'বেশ না ছাই। সুখে আছে তাই, আমার মত পোড়াকপাল ত নয়।'

'তোমার পোড়াকপাল নাকি?'

দুজনেই থমকে দাঁড়ায়। ইতি পিছনে হেলে যায় সাপের ফণা ধরার মত। বলে, 'কি বললে?'

মানব গম্ভীর হয়ে বলে, 'তোমার পোড়াকপাল বলছ, আমার জন্য ত?'

সাপের ফোঁস করার মতই ইতি সজোরে নিঃশ্বাস ছাড়ে, কিন্তু ছোবল মারার বদলে বয়স্কা নারীর চিরন্তন ক্ষমা করা আর প্রশ্রয় দেওয়ার ভঙ্গীতে বলে, 'তোমার সঙ্গে আর পারলাম না। মা বাবা ভাই বোনেদের কথা ভেবে ওকথা বলেছি, কি কষ্টে আছে সবাই বল ত? নইলে, আমি ত আজ রাজরাণী। অবিশ্যি, দেখতে শুনতে রাজরাণী নই, তোমার জন্যে রাজরাণী।'

তেতলায় মানুষ আছে, দোতলায় মানুষ আছে, সিঁড়িতে আর কেউ নেই—তবু ইতি জোর করে গলা একেবারে খাদে নামিয়ে দেয়। বলে, 'তুমি আমার রাজা।'

দুজনে দোতলায় নামামাত্র উপরের যে ঘরটিতে খোকাকে নিয়ে খোকার মা শুতে গেছে ঠিক তার নিচের ঘর থেকে বার হয়ে আসে মাঝবয়সী একটি মহিলা। মহিলাটি এত মোটা যে পদক্ষেপে মেঝে না কাঁপলেও দুমদাম শব্দ হয়। তবে

এখন পা ফেলার শব্দটা তার একটু জোরালো, হয়ত একটু বেশী জোরেই সে এখন পা ফেলেছে।

'কোথায় ছিলি ইতি ?'

'তেতলায় ছিলাম খোকার মার কাছে।'

'ছাই ছিলি, তিনবার ওপরে নিচে তোকে খুঁজে এসেছি।'

'তখন হয়ত চিলে-ঘরে গেছলাম। মা বললে, ভাড়ার টাকাটা দিয়ে আয় ত ইতি, সেইজন্য। এতক্ষণ ত খোকার মার সঙ্গে গল্প করছিলাম, জিগ্যেস্ করে আয় খোকার মাকে। খোকার মার সঙ্গে গল্প করছিলাম না মানববাবু ?'

মানব বলে, 'করছিলে বইকি।'

ইতি আবার জিজ্ঞাসা করে, 'আপনি বললেন না কুঁজোয় জল ফুরিয়ে গেছে ? আমি বললাম না, চলুন নিচে গিয়ে কুঁজোতে জল ভরে দিচ্ছি ?'

মানব মাথা নেড়ে সায় দেয়।

মোটা মেয়েটির রঙ খুব ফরসা! এতক্ষণ মুখখানা তার লাল হয়েছিল, এবার ধীরে ধীরে লালচে ভাবটা কমে যেতে আরম্ভ করে। খানিকক্ষণ চুপচাপ দাঁড়িয়ে থেকে আরো জোরে দুমদাম পা ফেলে সে ঘরে গিয়ে ঢোকে, দরজা বন্ধ করে দড়াম করে খিল তুলে দেয়।

পরক্ষণে খিল খুলে আবার বের হয়ে আসে।

'তুই মর ইতি, মর তুই, গোল্লায় যা! পা না তোর খোঁড়া ? খোঁড়া পায়ে তুই না সিঁড়ি ভাঙতে পারিস না ? সিঁড়ি ভাঙতে পারিস না ত, যমের বাড়ি যাস্ না কেন তুই ?'

মানব বলে, 'সুধা, আজ হাসপাঁতালে যাওনি ?'

সুধা বলে, 'দেখতে পাচ্ছ না, যাইনি ?'

মানব আবার বলে, 'আজ ডিউটি নেই বুঝি ?'

সুধা হঠাৎ কাঁদোকাঁদো হয়ে বলে, 'ডিউটি থাক বা না থাক, তোমার কি ?'

মানব শান্তভাবে বলে, 'না, এমনি বলছি। ভাড়ার টাকা দেবে নাকি আজ কিছু ?'

সুধা স্তব্ধ হয়ে যায়। চোখের চারদিকের অতিরিক্ত মাংস ফেলে ছোট ছোট চোখ দুটিকে বড় করবার চেষ্টা করে।

'ভাড়া চাইচ ? ভাড়া!'

মানব একটু মৃদু হেসে বলে, 'তুমিই ত বলেছিলে আজ কিছু দেবে।'

'এখনও মাইনে পাই নি।'

'বেশ, মাইনে পেলে দিও। নগেনকে ফিরে আসবার জন্যে খুব বিজ্ঞাপন দিচ্ছ, না সুধা ?'

সুধা মুখ সাদা করে বলে, 'কে বলে বিজ্ঞাপন দিচ্ছি ?'

'কাগজে দেখলাম। বেশ বিজ্ঞাপন দিয়েছ, ছেলেমেয়েদের নিয়ে একা আর কতকাল চালাব, আমার জন্যে না হোক ওদের কথা ভেবে ফিরে এসো। ইতি, তোমার সুধা। তোমার বিজ্ঞাপন যদি চোখে পড়ে সুধা, যেখানে থাক নগেন ছুটে আসবে।'

সুধা আর কথা বলে না, আবার ঘরে ঢুকে দরজা বন্ধ করে দেয়। এবার তার পদক্ষেপের শব্দও হয় কোমল, দরজা বন্ধ করার শব্দও হয় মৃদু।

সিঁড়ি দিয়ে নামতে আরম্ভ ক'রে ইতি বলে, 'সিঁড়ি যেন আর ফুরোতে চায় না।'

'কষ্ট হচ্ছে ?'

'থাক, আর দরদ দেখিয়ে কাজ নেই।—সুধাদির ক'মাসের ভাড়া বাকী আছে ?'

'ক'মাস আবার, দু'এক মাস। কি করবে বল বেচারী, চারটি ছেলেমেয়ে নিয়ে চারদিক অন্ধকার দেখছে। নার্সগিরিতে কি পয়সা আছে ?'

'তুমি দেও না কেন ?'

'আমি কেন দেব ? আমার সঙ্গে কি সম্পর্ক ? আর দু'মাস দেখব, ভাড়া যদি না মিটোয়, পষ্ট বলে দেব বিনাভাড়ায় যে-বাড়িতে থাকতে পাবে সেখানে থাকোগে, আমার এখানে ওসব চলবে না।'

সিঁড়ি বেয়ে দোতলায় নামার স্খলিত ভঙ্গী ইতির এবার নিজের হঠাৎ মুচড়িয়ে ভেঙ্গে পড়বার ভঙ্গীতে পরিণত হয়ে গেছে। কিন্তু এদিকে সিঁড়িও ফুরিয়ে আসছে, প্রাণপণ চেষ্টায় মানবের বাহুমূলে আস্তে একটি চড় মেরে মৃদু হেসে সে তাই বলে, 'কি দুষ্টুই তুমি ছিলে !'

তেতলায় খোকার মা খোকাকে যেমন করে দুষ্টু বলেছিল, ঠিক তেমনি করে বলে। তারপর আচমকা জিজ্ঞাসা করে, 'কই দিলে না ?'

মানব বলে, 'কি ?'

'মা যে দশ টাকা ধার চেয়েছে ? ভাড়ার টাকা ত পেলে, তাই থেকে দাও না ?'

মানব মৃদু হেসে কোমরের গোঁজা টাকা বার করে ইতিকে দশটা টাকা দেয়। ইতি ঘাড় গুঁজে নামতে থাকে।

একতলার বারান্দায় নেমে দেখা যায়ঃ বারান্দায় মাতুরে বসে দেয়ালে ঠেস দিয়ে ইতির মা ঘুমুচ্ছে, পাশে পড়ে আছে বছর তিনেকের একটা উলঙ্গ ছেলে, সর্বাঙ্গে তার অনেকগুলি পাঁচড়া। বারান্দার অপর প্রান্তে এঁটো বাসন পড়ে আছে। ছেলেটার পাঁচড়ার রস ভাল না লাগায় থেকে থেকে পাঁচড়া ত্যাগ করে কয়েকটা মাছি উড়ে যাচ্ছে এঁটো বাসনে, আর উচ্ছিষ্ট ভাল না লাগায় থেকে থেকে কয়েকটা মাছি এঁটো বাসন ত্যাগ করে উড়ে এসে বসছে ছেলেটার পাঁচড়ায়।

ইতির মার ঘুম ঠিক ঘুম নয়, চোখ বুজে থাকা। মটকা মেরে নয়, শ্রান্তিতে আর দুর্বলতায়।

চোখ মেলে ইতির মা বলে, 'ইতি এলি ?'

বলে মানবের মুখের দিকে চেয়ে ইতির মা বলে, 'সকাল বেলা এক কুঁজো জল নিয়ে গেলেন, ফুরিয়ে গেছে ?—ইতি, যা ত মা, কুঁজোয় জল ভরে দিয়ে আয়। ওসব কি পুরুষ মানুষের কাজ !'

মানব বলে, 'সিঁড়ি ভাঙতে ইতির কষ্ট হয়, আমি নিয়ে যেতে পারব।'

ইতির মা একথা শুনতে পায় না। মেয়ের পাদমূলে চোখ রেখে বলে, 'তোর গায়ে রক্ত কিসের লো ইতি ?'

ইতি নিশ্চিন্তভাবে বলল, 'পাঁচড়া চুলকে ফেলেছি।'

মানব বলে, 'তোমার পাঁচড়া হয়েছে ইতি ?'

প্রশ্ন শোনবামাত্র ইতি বিনা-ভূমিকায় ক্ষেপে যায়। আর্তনাদ করার মত বলতে আরম্ভ করে, 'হ্যাঁ হয়েছে, একশ'টা হয়েছে। কি করবে তুমি ? ঘেন্না করবে ? করগে যাও, কে তোমার ঘেন্নাকে কেয়ার করে ? দেখছ না ভাই-এর গায়ে পাঁচড়া, জাননা ভাইকে আমি কোলে নিই ? পাঁচড়া হবে না ত কি হবে আমার ?'

তাড়াতাড়ি কুঁজোটা নামিয়ে রাখতে সেটা গড়িয়ে উঠোনে পড়ে ভেঙে যায়। মানব সেদিকে চেয়েও দেখে না।

'ঘরে যাও ইতি, সুধাকে পাঠিয়ে দিচ্ছি।'

বলে একেবারে তিন চারটা ধাপ ডিঙিয়ে মহামানবের মত মানব উপরে উঠতে আরম্ভ করে।

মেজ মেয়ে সুমিত্রার বিবাহ আগামী শ্রাবণে। বড় মেয়ে সুচিত্রা আধ-বোবা, আধ-কালা, আধ-পাগল।

তাহা সত্বেও পাত্র খুঁজিতে হয়। জোটে না, তবু খুঁজিতে হয়। শেষে না কাঁদিয়া মেয়ে দেওয়া যায় এমন একটি সম্বন্ধ মামার চেষ্টায় প্রায় স্থির হইয়া আসে এবং একদিন বেলা ১০টায় পাত্রপক্ষ সদলে মেয়ে দেখিতে শুভাগমন করেন।

তারপর যাহা ঘটে তাহা যেমন অচিন্তনীয় তেমনি বীভৎস। অর্ধনগ্ন অবস্থায় উঠানে গড়াগড়ি দিয়া সুচিত্রা চীৎকার করিয়া কাঁদে। মরিয়া গেলেও দুবার বিবাহ সে কিছুতেই করিবে না, এই কথা সকলকে বুঝাইয়া দিবার চেষ্টায় পাগল মেয়েটার যেন প্রাণ বাহির হইয়া যাওয়ার উপক্রম হয়।

যাঁহারা মেয়ে দেখিতে আসিয়াছিলেন খানিকক্ষণ মজা দেখিয়া মুচকি হাসিয়া তাঁহারা প্রস্থান করেন। উপস্থিত সকলের মুখে মেঘ ঘনাইয়া আসে। কাহারো মুখে কথা ফোটে না, কেহ কাহারো মুখের দিকে চাহিতে পারে না। খানিক আগেই ত সুচিত্রার অনাবৃত দেহটা সকলের চোখে পড়িয়াছে। মেয়েটার অস্তিত্বে ফাঁক আছে, কিন্তু অঙ্গের কোথাও ফাঁকি নাই। ওর সম্বন্ধে এ যেন একটা নূতন চেতনা নিয়া জাগিয়া ওঠা।

সুলতা ননদকে শান্ত ও সংযত করিয়া দিতেছিল, প্রশ্নকামী মামাশ্বশুরের নৈকট্য পরিহার করিয়া সে এদিকে সরিয়া আসিল। সুমিত্রাকে চুপি চুপি বলিল, 'ওকে মিথ্যে জ্বালাতন করা, মেজ ঠাকুরঝি।'

এদিকে মুখখানা ভয়ানক গম্ভীর করিয়া মামা অতিকষ্টে সুচিত্রাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'দুবার বিয়ে কি রে চিত্রা? তোর আবার বিয়ে হল কবে?'

চোখ মুছিতে মুছিতে করুণ সুরে সুচিত্রা বলিল 'হয়েছে মামা। ও রোজগার করে না বলে তোমরা আবার আমার বিয়ে দেবে?'

'সে কে রে? কার কথা বলছিস্?'

সুচিত্রা নীরবে মাথা নাড়িল।

'কে রোজগার করে না?' মামা আবার জিজ্ঞাসা করিলেন। কিন্তু বহু

জিজ্ঞাসাবাদেও সুচিত্রার অক্ষম স্বামীর পরিচয় জানা গেল না। সে বলিবে না। স্বামী তাহাকে বলিতে বারণ করিয়া দিয়াছে।

শেষ পর্যন্ত মামা হাল ছাড়িয়া দিলেন। একে কুমারী মেয়ে তায় আবার পাগল, ইহার মনের কথা বাহির করিবার মত বুদ্ধি তাঁর মত অবিবাহিত লোকের নাই। একটা বিড়ি বাহির করিয়া তিনি নীরবে ধূমপান করিতে লাগিলেন। অত চেষ্টা-যত্নে যোগাড় করা সম্বন্ধ ফাঁসিয়া যাওয়ায় তাঁহার দুঃখের অবধি ছিল না।

আহা, এই পাগল মেয়েটাকে তিনি কত ভালবাসেন! তারই মায়ের পেটের বোনকে তিনদিন যন্ত্রণা দিয়া যমের দক্ষিণ দুয়ারের কাছাকাছি লইয়া গিয়া এ মেয়ে পৃথিবীতে আসিয়াছিল। ইহার বিবাহ দিতে পারিলে তার কত সুখ হইত শুধু ভগবানই তাহা জানেন।

ও বাড়ির যাদব মেয়ে দেখানো ব্যাপারে সহায়তা করিতে আসিয়াছিলেন, সুচিত্রার নগ্নতা চোখে পড়ামাত্র তার দৃষ্টি নিজের বাড়ির কার্নিশে উঠিয়া গিয়াছিল, এতক্ষণে চোখ নামাইয়া তিনি চারিদিকে চাহিয়া দেখিলেন। সুলতার কাছে আগাইয়া গিয়া বলিলেন, 'এ নিশ্চয় পাগলামি, ছোট বৌ।'

সুলতা মৃদুস্বরে বলিল, 'তাছাড়া কি?'

কাঁচা-পাকা দাড়ির মধ্যে অঙ্গুলি চালনা আরম্ভ করিয়া যাদব চিন্তিতভাবে মাথা নাড়িতে লাগিলেন। সুলতার কথায় যথেষ্ট আশ্বস্ত হইলেও জীবনের সঞ্চিত অভিজ্ঞতা তাহাকে যেন বিচলিত করিয়া তুলিয়াছে। বিশ্বাস করেন না কিন্তু এ রহস্য যেন তিনি চিনেন।

সরমা পাথরের মূর্তির মত স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইয়া ছিলেন। সুলতার সঙ্গে যাদবকে কথা কহিতে দেখিয়া তার যেন চেতনা হইল। বৌকে কাছে ডাকিয়া বলিলেন, 'চিত্রা এসব কি বলছে ছোট বৌ? তুমি কিছু জান?'

এ বাড়ির সকলকেই সুচিত্রা পরিহার করিয়া চলে, কিন্তু কি কারণে বলা কঠিন। সুলতার সঙ্গে তার ভাব আছে। এ বাড়িতে সুলতার দুপুরগুলিই বিনিদ্র। সাত মাসের ভ্রূণের ভারে তাহার পদক্ষেপ মন্থর, কিন্তু সারাটি দুপুর সে এ-ঘর ও-ঘর করিয়া বেড়ায়। চঞ্চল সে নয়, কিন্তু চুপচাপ বসিয়া থাকিতে তরুণী বধূটির যেন দারুণ অস্বস্তি।

সুচিত্রার গোপন পরিণয়ের সংবাদ যদি কাহারো জানা থাকে, তবে সুলতার থাকাই সম্ভব। কিন্তু সুলতা কিছুই জানে না।

শাশুড়ীর প্রশ্নের জবাবে সে মৃদুস্বরে বলিল, 'জানিনে মা! ও বাড়ির পঞ্চু ছাড়া ঠাকুরঝি ত কারও সঙ্গে কথা কয় না।'

শুনিয়া সরমা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলিলেন। পঞ্চু ছেলে মানুষ, স্কুলে পড়ে। সরমার ছোট ছেলেটি বাঁচিয়া থাকিলে অত বড়ই হইত এতদিনে। সুচিত্রার বিকৃত মনে এই ভাইটির জন্য কেমন করিয়া একটা আশ্চর্য প্রখর মমতা জন্মিয়াছিল, খুব সম্ভব সে ভালবাসাই এখন পাশের বাড়ির গম্ভীর প্রকৃতি ছেলেটির উপর পড়িয়াছে; পাগল মেয়ের অন্ধ উগ্র ভালবাসা। প্রকাশটি বিচিত্র। পাঁচুর স্কুল বন্ধ থাকার দিনটির প্রতীক্ষায় সুচিত্রা ছটফট করে, অন্যদিন তার কাছে পাঁচুর বেশীক্ষণ থাকা নিষেধ, তাড়াতাড়ি লেখাপড়া শিখিয়া পাঁচু মানুষ হোক্ সুচিত্রার এই আগ্রহ একেবারে নিষ্ঠুর। ছুটির দিন দুপুরটা পাঁচু তার কাছে থাকে। সকালে পঞ্চুর পড়া চাই, বেশ মনোযোগ দিয়া পড়া চাই, সুচিত্রার মাথার দিব্যি।

খাওয়াদাওয়ার পর এগারটা কি বারটার সময় সলজ্জভাবে পঞ্চু আসিয়া দাঁড়ানমাত্র তাহাকে ভিতরে নিয়া গিয়া সুচিত্রা ঘরে দুয়ার দেয়। পাঁচটা অবধি ছেলেটিকে লইয়া হাসিয়া-কাঁদিয়া সোহাগ করিয়াও তার যেন তৃপ্তি হয় না।

ভাঙা ভাঙা কথা তাহার এমনিই দুর্বোধ্য, পঞ্চুকে সোহাগ করিবার সময় তাহা এত বেশী জড়াইয়া যায় যে বাহির হইতে শুনিলে মানে বুঝা যায় না। কিন্তু সুরটা এমন করুণ যে চোখে জল আনিয়া দেয়।

যাদবের বড় ছেলে সতীশ ম্লানমুখে সরমার মুখের দিকে চাহিয়া ছিল, সরমাকে চোখ মুছিতে দেখিয়া সে আর আত্মসম্বরণ করিতে পারিল না।

'মিছামিছি কেন কাঁদছেন মাসীমা? ওর কথার কি কোন দাম আছে?'

সতীশের চোখ ছলছল করিতে লাগিল। সরমার চোখে-মুখে ব্যথা আরও ঘনীভূত হইয়া আসিল। সতীশের সহানুভূতি তার সহ্য হয় না। বুকের মধ্যে কেমন করে। সতীশ আবার বলিল, 'আপনার হার্ট দুর্বল, এরকম অধীর হবেন না মাসীমা।'

সরমা শ্বাস টানিয়া বলিলেন, 'আমার বুক ধড়ফড় করছে সতীশ।'

সতীশ ধমকাইয়া উঠিল, 'বুক ধড়ফড় করছে! এরা দেখছি আপনাকে বাঁচতেই দেবে না মাসীমা। চলুন, আপনি একটু শুয়ে থাকবেন।'

'এইখানে একটু বসি, সতীশ।'

'সে হবে না মাসীমা, আপনাকে শুতে হবে!' সতীশ ঘরে ঢুকিয়া মাদুর ও

বালিশ আনিয়া বিছাইয়া দিল। সরমা ম্লানভাবে একটু হাসিলেন। মমতায় ছেলেটা পাগল। ওর চোখের দিকে তাকাইতেও যেন ভয় করে।

হেমন্ত ছোট ছেলে, সুলতার স্বামী। ঝড়ের মত বাড়িতে ঢুকিয়া সে বলিল, 'ব্যাটাদের আচ্ছা করে গালাগালি দিয়ে এলাম, মামা। পাগল মেয়ে দেখতে এসে পাগলামি দেখে হাসবে, এ কি ইয়ার্কি নাকি ?'

সুলতা ঘোমটা একটু টানিয়া দিল, লজ্জায় নয়, মুখের ভাব গোপন করিবার জন্য। সুমিত্রা হাসিয়া বলিল, 'হঁ্যা দাদা, রাস্তায় ভিড় জমেছিল ? গালাগালি শুনে পথের লোক প্রাণভরে খুব হেসেছিল ?'

অযথা পরিমাণে হাসিতে হাসিতে মাথা নাড়িয়া হেমন্ত বলিল, 'না, হাসবে কেন ?'

সুলতা তীব্র চাপা গলায় সুমিত্রাকে বলিল, 'বল না, মেজো ঠাকুরঝি, ওঁর ভঙ্গী দেখে আমাদের সকলের হাসি পাচ্ছে, পথের লোক হাসি চেপে রাখবে কোন্ দুঃখে।'

'ও বাবা! ও কথা বলি আর বুড়ো বয়সে পিট্টি খেয়ে মরি আর কি! বলতে হয় তুমি বল।' বলিয়া সুমিত্রা মুখ বাঁকাইল। সুমিত্রার বিবাহ হয় নাই। তার বিবাহ্ আগামী শ্রাবণে।

সুলতা মৃদুস্বরে বলিল, 'বলার অধিকার আমারি পুরো বটে।'

যাদব আনমনে সুলতার নিকটে সরিয়া আসিয়াছিলেন। সুলতার কথাগুলি তিনি শুনিতে পাইলেন। হেমন্তকে তাঁর কিছু বলিতে সাহস হয় না, কিন্তু সুলতার ইচ্ছা তার ভীরুতার চেয়ে বড়ো। মুখখানা যথাসম্ভব গম্ভীর করিয়া হেমন্তকে উদ্দেশ করিয়া তিনি বলিলেন, 'এ দুর্বুদ্ধি আবার তোমার মাথায় চাপল কেন হেমন্ত ? রাস্তায় দাঁড়িয়ে ভদ্রলোককে গাল দেবার বয়স তোমার পার হয়ে গেছে বাপু।'

এক মুহূর্তে ক্রুদ্ধ হইয়া উদ্ধতভাবে হেমন্ত জবাব দিল, 'তাই যদি গিয়ে থাকে, আপনার উপদেশ শোনবার বয়সও বোধ হয় আমার পার হয়ে গেছে কাকা।'

'ও আচ্ছা।' বলিয়া যাদব মুখ ফিরাইয়া নিলেন। দেখিতে পাইলেন সুলতা অনভ্যস্ত দ্রুতপদে ঘরের দিকে চলিতে আরম্ভ করিয়াছে। নিজের দাড়িকে যাদব জোরে মুচড়াইয়া দিলেন। ভাবিলেন, একালের মেয়েরা সেকালের মেয়ের মতই

আছে, কিন্তু ছেলেগুলি হইয়াছে উদ্ধত, দুর্বিনীত, পাষণ্ড। ইহাদের ধরিয়া চাবকানো উচিত। ইহাদের মৃত্যু হইলে পৃথিবীর মঙ্গল।

যাদবের বুকের মধ্যে তীক্ষ্ন ঘা লাগিল। স্নলতার খুব শুভাকাঙ্ক্ষী ত তিনি! দাড়ি আর তিনি মুচড়াইলেন না, হঠাৎ রাগের বশে যাহা ভাবিয়া বসিয়াছেন মনে মনে তাহারি জন্য অনুতাপ করিতে লাগিলেন।

*　*　*　*　*　*

ও বাড়ির ছাদের কার্নিশে একটা চিল আসিয়া বসিয়াছে। পিঠ তাহার রোদে পুড়িয়া গেল, বুকে কিন্তু নিজের দেহেরই ছায়া।

এ বাড়ির ছাদে চিলেকুঠির ছায়ায় বসিয়া হেমন্ত আকাশে ঘুড়ি উড়াইতেছে। ঘরের জানালা দিয়া একটা সুদূর সাদা মেঘের গায়ে দুর্লক্ষ্য কালো বিন্দুর মত স্বামীর ঘুড়িটা স্নলতার চোখে পড়িল।

তাহার মুখ ম্লান হইয়া গেল। আজ সে বাপের বাড়ি যাইবে, আজিকার দিনেই ছাদে গিয়া হেমন্ত ঘুড়ি উড়াইতে বসিয়াছে এ জন্য নয়, স্বামীর এই ছেলেমানুষির পরিচয়ে তাহার চিন্তা যে জীবনের সীমা পার হইয়া স্বর্গীয় পিতার নিকট উপস্থিত হইল, ইহার আতঙ্কে। এখন এভাবে বাবার কথা ভাবিতে আরম্ভ করিলে বিকাল পর্যন্ত তার সময় কাটিবে কি করিয়া?

বাবাকে স্নলতা বড় ভালবাসিত। সতরো বছর বয়স পর্যন্ত পিতার স্নেহের মূল্যে নিজের সমস্ত জীবনটা সে বিলাইয়া দিয়াছে, গাঢ় সুমিষ্ট মধুর তলে তার যেন আকণ্ঠ সমাধি। তুলিয়া আনা সত্বেও মধুপাত্রে নিমজ্জিত মক্ষিকার মত এখনো সে মধুর বন্ধন সর্বাঙ্গে জড়াইয়া আছে। এবং তারি ফলে অনড় অচল স্থবির তাহার জীবন, অচেনা অনাত্মীয় মানুষের মধ্যে তাই তার একা বাঁচিয়া থাকা।

বাবাকে মনে পড়িলে এই বৃন্তচ্যুতির অনুভূতি স্নলতার অসহ্য হইয়া উঠে। মনে হয়, জীবনে পাড়ি জমাইবার জন্য ছোট একটা ডিঙিতে তাহাকে তুলিয়া দিয়া জাহাজ নিয়া পিতা তাহার চিরদিনের জন্য নাগালের বাহিরে চলিয়া গিয়াছেন,—এ ডিঙি সামনেও আগায় না ডুবিতেও চায় না, এ পারের তীরের কাছে অল্প ঢেউয়ে টলমল করে। বাস্তবিক, জীবন এখানে এমন অগভীর যে খেয়া-ডিঙি চড়ার বালিতে ঠেকিয়া গিয়াছে বলিয়াই স্নলতা সন্দেহ করে।

হেমন্তর অপরাধ নাই, তার প্রকৃতিই ওই রকম। সে যেন বয়স্ক শিশু, দায়িত্বজ্ঞানহীন নির্বোধ। ওর জন্য কতদিন লজ্জায় স্নলতার মাথা কাটা গিয়াছে

তার হিসাব নাই। বাড়ির সকলে যখন গম্ভীর মুখে একটা গুরুতর সাংসারিক সমস্যা নিয়া আলোচনা করে, পরামর্শ দিবার জন্য ও বাড়ির যাদবকে পর্যন্ত ডাকিয়া আনা হয়, মাঝে মাঝে কি অদ্ভুত হাস্যকর মন্তব্যই হেমন্ত করিয়া বসে! সুমতি পর্যন্ত দাদার বয়সটা অগ্রাহ্য করিয়া বলে, 'আবোল-তাবোল কি বকছ দাদা?'

হেমন্তর রাগ আছে ষোল আনা।

বলে, 'তোর কি রে বেয়াদব মেয়ে।'

তখন গুরুজনের মধ্যে কেউ ভয়ে ভয়ে বলেন, 'আত্মীয়স্বজনের সুখদুঃখের কথা অমনভাবে তুচ্ছ করতে নেই হেমন্ত!'

'বয়ে গেল।'

'বয়ে গেল? বয়ে গেল কি রে! দাদা থাকে বিদেশে, তুই ত এখন সব দেখবি শুনবি! তোর ওপরে ত সব ভাব।'

কোণ-ঠাসা হইয়া হেমন্ত একটু মুখ বাঁকায় মাত্র, কোন জবাব দেয় না।

আড়ালে সুলতার গা রাগে রিরি করে। ছেলের মত যাকে শাসন করিতে ইচ্ছা হয়, তার স্বামিত্বের লজ্জা কোথায় লুকাইবে সে ভাবিয়া পায় না।

এ লজ্জা চিরদিনের। সিঁদুর যদি মুছিয়া না যায়, পাকা চুলেতে এ কলঙ্ক ঢাকা পড়িবে না। শিশু তার কর্তা, শিশু তার ভর্তা, শিশুর সে অঙ্কশায়িনী।

সুলতা বাক্স গোছানর অসমাপ্ত কাজে ব্যাপৃত হইবার চেষ্টা করিল। দুখানা কাপড় গুছাইয়া রাখিতেই সে ক্লান্ত হইয়া পড়িল। হাত গুটাইয়া সে চুপচাপ বসিয়া রহিল।

এমনি সময় আসিয়া দাঁড়াইল পঞ্চু।

কি বলিতে গিয়া লাজুক ছেলেটি চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। সুলতা বলিল, 'কি ভাই?'

'আপনি আজ চলে যাবেন?'

'যাব। স্কুল পালিয়ে তুমি বুঝি আমায় তাই দেখতে এলে?'

পঞ্চু অস্বীকার করিয়া বলিল, 'না।'

'না কি ভাই?'

'ক্লাসে থাকতে ভাল লাগে না তাই চলে এলাম।'

সুলতা খুশী হইয়া বলিল, 'অন্য ছেলে হলে বলত, হ্যাঁ তোমাকে দেখতে

এলাম। ছেলের দল থেকে তুমি বড় তফাত হয়ে গিয়েছ ভাই। কিন্তু ঠাকুরঝির জন্য স্কুল কামাই করলে, আমার জন্য পার না?'

সুচিত্রার স্নেহের মর্যাদা রাখা যেন অপরাধ এমনিভাবে পঙ্কু হাসিবার চেষ্টা করিল। সুলতা সহসা গম্ভীর হইয়া বলিল, 'তোমার হাসি দিন দিন শুকিয়ে যাচ্ছে, মুখে যেন জ্যোতি নেই। খেলাধুলা কর না বুঝি? অল্প বয়সে এত বড়ো হয়ে গেলে, বেশী বয়সে বাঁচবে কি করে পঙ্কু?'

সরমা কতকগুলি কারুকার্যখচিত কাঁথা সেলাই করিয়া দিয়াছিলেন, সেগুলি ভাঁজ করিয়া ট্রাঙ্কে ভরিয়া সুলতা আবার বলিল, 'এই বয়সে তুমি বুড়ো হয়ে গেছ, আর বুড়ো বয়সে ও কত ছেলেমানুষ, জানালা দিয়ে একবার তাকিয়ে দেখো ভাই। আমি আজ চলে যাব, ঘুড়ি দিয়ে উনি তাই মেঘ শিকার করছেন।'

'আপনি বারণ করেন না কেন?'

'বারণ করলে কে শুনছে?'

'আপনার বারণ শোনে না!'

বৌ বারণ করিলে কথা শোনে না এরকম মানুষ যে পৃথিবীতে থাকিতে পারে পঙ্কুর এ ধারণা ছিল না। কথা না রাখিলে বৌ কাঁদে, বৌয়ের কান্না হেমন্ত সয় কি করিয়া?

'আপনি খুব কাঁদেন না কেন?'

'ওমা, কাঁদব কি জন্য?'

পঙ্কু আরও অবাক্ হইয়া গেল। ব্যাপারটা সে ঠিক বুঝিতে পারিতেছে না! এমন সময় সুচিত্রাকে আসিতে দেখা গেল। সুলতা বলিল, 'তোমার দিদি আসছে পঙ্কু।'

ঘরে পা দিয়া কথাটা কানে যাইতেই সুচিত্রা চটিয়া উঠিল।

'গেঁয়ো মেয়ের মত কি ঠাট্টাই যে তুমি কর বৌদি! অন্য ননদ হলে গালে ঠোনা মারত। ছি ছি, ও কথা বলতে আছে?'

সুলতা ভয়ে ভয়ে বলিল 'আর বলবনা ঠাকুরঝি।'

সুচিত্রা এ কথা শুনিতে পাইল না। হঠাৎ তার মনে একটা নূতন খেয়াল জাগিয়াছে। মুখের উপর হইতে রুক্ষ চুলের রাশি সরাইয়া একাগ্রদৃষ্টিতে সে সুলতার সিঁথির দিকে চাহিয়া রহিল। সে দৃষ্টি দেখিয়া সুলতা দারুণ অস্বস্তি বোধ করিতে লাগিল।

'অমন করে চেয়ে কি দেখছ ঠাকুরঝি ?'

সুচিত্রার যেন চমক ভাঙিল। লজ্জা ও বেদনায় অপরূপ মুখভঙ্গী করিয়া সে বলিল, 'আজ পর্যন্ত এ ত আমার মনেই পড়েনি বৌদি! দেখেছ মেয়েমানুষের মন ? কি লজ্জা, মাগো।'

পঞ্চুকে বলিল, 'আমার ঘরে গিয়ে একটু বসগে যাও ত। আমি এখনি আসছি।'

অত্যন্ত নির্বোধের মত মুখ করিয়া পঞ্চু সরিয়া গেল।

সুলতার পাশে বসিয়া নালিশের সুরে সুচিত্রা বলিল, 'তুমিও ত এতদিন মনে করে দাওনি বৌদি ?'

'কি মনে করে দিইনি ভাই!'

নিজের সিঁথি নির্দেশ করিয়া সুচিত্রা বলিল, 'সিঁদুর পরার কথা। দেখ দিকি, এই অমঙ্গলের ধ্বজা উড়িয়ে, এয়োস্ত্রী মানুষ আমি সকলের সামনে বা'র হয়েছি। তোমাদের কি চোখ নেই ?'

সুলতা তাহার সিঁথি আবিষ্কার করিতে পারিল না, এলোমেলো চুলের নিচে চাপা পড়িয়া গিয়াছে। অস্তিত্বহীন কাল্পনিক স্বামীর মত এও যেন পাগল মেয়েটার কৌতুক।

'দাও বৌদি আমায় সিঁদুর পরিয়ে দাও।'

'আজ থাক ঠাকুরঝি, ভালো দিন দেখে পরো।'

'না, আজকেই দাও। হাতে নোয়া নেই, শাঁখা নেই, একটু সিঁদুরও পরব না ? এমন করলে ও আমায় ত্যাগ করবে। সারা গায়ে এত অমঙ্গলের চিহ্ন কি কেউ সইতে পারে ?'

আগে চুল আঁচড়ে বেঁধে দিই, তারপর সিঁদুর পরবে। গা ধুয়ে শুদ্ধ হয়ে সিঁদুর পরতে হয় ঠাকুরঝি।'

সুলতাও যেন পাগল। কুমারী মেয়ের কপালে খানিকটা লাল গুঁড়া লাগাইতে তার আপত্তির অন্ত নাই। এ বিষয়ে তার মনে উদারতার একান্ত অভাব। এয়োতির চিহ্ন নিয়া ছেলেখেলা সে ভালবাসে না।

সুচিত্রা অধীর হইয়া বলিল, 'আমার অত সময় নেই বৌদি এখনি পরিয়ে দাও, বেশী বাহাদুরি তোমার না করলেও চলবে।'

না দিয়া উপায় নাই। সুলতা সিঁদুরের কৌটা খুলিয়া আনিল। টিপ পরাইয়া

দিতে গিয়া তাহার মনে হইল ইহার এই অর্থহীন খেয়ালটা সত্য ভাবিয়া না নিলে আর কোনমতে চলিবে না। হিসাব করিয়া দেখিলে বেশ বুঝা যায় তার চেয়ে এই স্বামিহীনা মেয়েটা স্বামিভাগ্যে কম ভাগ্যবতী নয়। শূন্যকে ভালবাসিয়া ইহার নালিশ নাই, বেদনা নাই, একেবারে মশগুল হইয়া আছে। জাগিয়া থাকার সময় নিজের স্বামিপ্রেমে নিজেই মুগ্ধ হইয়া থাকে, ঘুমাইয়া স্বামীর স্বপ্ন দেখে। এ ব্যাপারটা সুলতার বড় রহস্যজনক মনে হয়। পাগলের জাগ্রত অবস্থাটাই স্বপ্ন, স্বপ্নের অবস্থাটা কেমন ভাবিতেও পারা যায় না।

সিঁদুর পরিয়া সুচিত্রা সুলতাকে প্রণাম করিল। এক পা পিছাইয়া গিয়া সুলতা বলিল, 'বেঁচে থাক ভাই, স্বামী-সোহাগিনী হও।'

দেখিতে দেখিতে সুচিত্রার চোখে জল আসিয়া পড়িল।

'সেই আশীর্বাদই কর বৌদি। ও ত্যাগ করবে বলে আমার আজকাল এমন ভয় করে।'

'ত্যাগ করবে কেন ?'

সুচিত্রা ভারী লজ্জা পাইল। এদিক-ওদিক চাহিয়া ফিসফিস করিয়া বলিল, 'ছেলেমেয়ে হল না যে ? ও বলে, নাইবা হল ছেলেমেয়ে, চাকরি করে আমি তোমায় ছেলে কিনে দেব। তাতে কিন্তু ভরসা পাই না বৌদি।'

সুলতার নিঃশ্বাস যেন আটকাইয়া আসিল।

'চাকরি করে তোমায় ছেলে কিনে এনে দেবে বলেছে ?'

'বলেছে। কিন্তু তবু আমার ভয় করে। কেনা ছেলেকে কেউ ভালবাসতে পারে ?'

সুচিত্রা নিজের মনে মাথা চালিতে লাগিল। চোখ তুলিয়া সুলতা দেখিতে পাইল দরজার কাছে পঙ্কু চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া আছে। সে যেন অকূলে কূল পাইল। উঠিয়া কাছে গিয়া মিনতি করিয়া বলিল, 'পঙ্কু ভাই, ওকে তুমি ডেকে নিয়ে যাও। ও আমাকে পাগল করে দেবে।'

পঙ্কু রুক্ষস্বরে বলিল, 'কেন ? ও ত আপনার কোন ক্ষতি করেনি ?'

'কি বলছ পঙ্কু ?'

'আপনার বড় হিংসা।'

বলিয়া সুলতার উপর রাগ করিয়াই যেন কড়া সুরে পঙ্কু সুচিত্রাকে ডাকিল, 'এখানে বসে হচ্ছে কি ? চলে এসো।'

'যাই।'

একান্ত অনুগতভাবে সুচিত্রা তাহার সঙ্গে চলিয়া গেল। সুলতা বিস্ময়ে হতবাক্ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। হিংসাও তাহার একটু হইল বইকি। কচি লঙ্কা চিবাইতে ঝাল যত না লাগে, তেতো লাগে তার চেয়ে ঢের বেশী। পনরো বছরের একটি অপরিপক্ক ছেলের ধমকে তার বুকের মধ্যে তেমনি অল্প অল্প জ্বালা করিতে লাগিল, সমস্ত মন তিক্ত ও বিরক্ত হইয়া উঠিল। হোক না ছেলেমানুষ, পুরুষ ত বটে—কেউটের বাচ্চা। মায়ের কোলে ওরা বিষাক্ত হইয়া উঠে। নইলে তার উপরে চোখ রাঙাইবার আত্মবিস্মৃতি মুখচোরা লাজুক ছেলেটার কেমন করিয়া হইল ?

সুলতা মনে মনে প্রতিজ্ঞা করিল, বাপের বাড়ি হইতে ফিরিয়া আসিয়া পঙ্কুর সঙ্গে কথা বলিবে না।

ঘরে আর থাকিতে ইচ্ছা হইল না। নিজের যাত্রার আয়োজন নিজের হাতে করা যে কি কষ্টকর সুলতা এতক্ষণে তাহা ভাল করিয়া বুঝিতে পারিয়াছে।

ও বাড়ি যাওয়ার জন্য সিঁড়ি দিয়া সুলতা নিচে নামিল। বারান্দায় দাঁড়াইয়াছিল সতীশ ও সুমিত্রা। সুমিত্রার দাঁড়ানোর ভঙ্গীটা ভাল নয়।

প্রথমে সুমিত্রা ভয়ানক চমকিয়া উঠিল। তারপর পরম ঔদ্ধত্যের সঙ্গে অকম্পিত হস্তে একটি একটি করিয়া ব্লাউজের বোতাম লাগাইল। কোন দিকে না চাহিয়া সে উপরে চলিয়া গেল। সতীশ মাথা নিচু করিয়া বলিল, 'মাসীমা কেমন আছেন জানতে এসেছিলাম বৌদি।'

'মা ভালই আছেন।'

এ কথা অবান্তর। এ প্রশ্নোত্তরের মানে আছে, সঙ্গতি নাই।

সতীশ একটু ইতস্তত: করিয়া কৈফিয়ত দিল।

ছেলেবেলা আমি সুমিত্রার বুকে একটা ফোড়া কাটিয়ে দিয়েছিলাম। ও অজ্ঞান হয়ে পড়েছিল। সেই দাগটা আজ আমায় দেখিয়েছিল।

'কেন ?'

'দাগটা যেন ভুলে না যাই।'

'এমন ! এ কি তাহলে আপনার উচিত হচ্ছে ঠাকুরপো ?'

সতীশ বিবর্ণ হইয়া বলিল, 'কি করব বলুন ? আমি নিরুপায়। আমার মনের কি যেন একটা অসুখ আছে বৌদি। সুমিত্রাকে আমার মেয়ের মত মনে হয়।'

'মেয়ের মত মনে হয়! আপনার মাথা খারাপ নাকি?'

সতীশ অপরাধীর মত হাসিল।

'কি জানি, হওয়া আশ্চর্য নয়। কিন্তু মেয়ে মনে করলেই সুমিত্রাকে আমি খুব সুন্দরী দেখি, আর কিছু মনে করতে গেলে, ও কদর্য কুৎসিত হয়ে যায়। ও বড় রোগা আর বড় ছেলেমানুষ।'

'সবাই বলে সুমিত্রার মত সুন্দরী মেয়ে দেখা যায় না। ওর মার চেয়েও সুমিত্রা সুন্দরী হয়েছে।'

সতীশ একটু ভাবিয়া বলিল, 'আমার মনে হয় সবাই ভুল বলে বৌদি। মাসীমা যখন প্রথম এখানে আসেন, আমার বয়স ছিল নয় কি দশ। সেই বয়সে আমি যে অবাক্ হয়ে ওর দিকে চেয়ে থাকতাম এখনো মনে আছে। সারাদিন ওর আশেপাশে ঘুরতাম।'

সুলতা বলিল, 'তা সত্যি। মাকে এখনো জগদ্ধাত্রীর মত দেখায়। মোটা হয়ে পড়েছেন, নইলে—'

সতীশ বাধা দিয়া বলিল, 'ওইটুকু মোটা না হলে ওকে মানাত না বৌদি।'

'তা হয়ত মানাত না, কিন্তু বয়স আন্দাজে সুমিত্রা ত রোগা নয়। দিব্যি ছিপছিপে গড়ন।'

সতীশ হাসিয়া বলিল, 'ননদ কিনা, ওর সবই আপনার ভাল লাগে। কিরকম হাবলা দেখলেন ত? বার বার বললাম, দাগের কথা আমার মনে আছে সুমিত্রা, দেখাবার কোন দরকার নেই, কথা শুনল না।' বলিয়া সতীশ গম্ভীর হইয়া গেল, ওষ্ঠের প্রান্ত ঈষৎ কুঞ্চিত করিয়া বলিল, 'বাপের জন্য সুমিত্রা দেখতে খারাপ হয়েছে।'

'তিনি বুঝি দেখতে ভাল ছিলেন না?'

সতীশ সজোরে মাথা নাড়িল, 'বিশ্রী। নাক বোঁচা, চোখ ছোট, রং কালো —দেখে আমার হাসি পেত। আপিস থেকে এলে কেন যে ছুটে কাছে যেতেন ভেবে আমি অবাক্ হয়ে যেতাম। একদিন কি মজা হয়েছিল শুনুন—'

বিবর্ণ মুখে সুলতা শুনিল। হেমন্তের সঙ্গে সতীশ উঠানে ক্রিকেট খেলিতেছিল। আপিস ফেরত হেমন্তের বাবা বারান্দায় বসিয়া জিরাইতেছিলেন, তাঁহাকে বাতাস করিতেছিলেন সরমা। হঠাৎ বল লাগিয়া হেমন্তের বাবার ঠোঁট কাটিয়া একেবারে রক্তারক্তি ব্যাপার।

রুদ্ধ-নিঃশ্বাসে সুলতা জিজ্ঞাসা করিল, 'ইচ্ছে করে মেরেছিলেন নাকি ?'

সতীশ উদাসভাবে বলিল, 'কি জানি, মনে নেই। কিন্তু মরে যাবেন ভয়ে সারাদিন বুকের মধ্যে কেমন করেছিল, বেশ মনে আছে।'

'ভয়ে ?'

প্রশ্ন শুনিয়া সতীশ চটিয়া উঠিল, 'তবে কি ? কি বলতে চান শুনি ? ভয়ে নয় ত কিসে বুক কেঁপেছিল ?'

'আমি কিছুই বলতে চাই না, ঠাকুরপো।'

সতীশ কথঞ্চিৎ ঠাণ্ডা হইয়া বলিল, 'মাসীমা সেজন্য আমায় কিন্তু শাস্তি দিতে ছাড়েন নি, কান মলে দিয়েছিলেন। মনে পড়লে এখনো সেজন্য কান লাল হয়ে ওঠে ; মাসীমার ওপর অভিমান করতে ইচ্ছা হয়।'

সুলতা আর দাঁড়াইয়া থাকিতে পারিল না। যে সব কথা তাহার মনে হইতে লাগিল, সতীশের সামনে দাঁড়াইয়া ভাবিতে গেলে সে মূর্ছিতা হইয়া পড়িবে।

দ্রুতপদে সে উঠান পার হইয়া গেল।

মনোরমার কাছে পৌঁছিবার পূর্বে দেখা হইল যাদবের সঙ্গে।

সুলতার কুঞ্চিত ভ্রূ-দুটি সরল হইয়া উঠিল, মুখের ক্লিষ্টভাব মিলাইয়া গেল। তার মনে হইল, আজ সারাদিন সকল কাজের ফাঁকে সকল দুশ্চিন্তার আড়ালে ইহার সঙ্গই সে কামনা করিয়াছে। যে শূন্যতা সারাদিন তাহাকে আজ পীড়ন করিয়াছে, ইহার সহিত কথা কহিবার সুযোগ পাওয়ামাত্র তাহা ভরাট হইয়া গেল।

'আপনার অম্বল হয়েছে শুনলাম, এখন কমেছে ?'

যাদবের স্বাস্থ্য সম্বন্ধীয় এই প্রশ্ন তাহার হাঁপ ছাড়ার মত শোনাইল। তাহা লক্ষ্য না করিয়াই যাদব বলিলেন, 'অম্বল কমেছে। তুমি বুঝি মনোর খবর নিতে এলে ছোট বউ ? ওর কান্নাও আজ কমেছে।'

'এ সুখবর কাকা। মনো বড় বেশী কাঁদত।'

যাদব বলিলেন, 'ওটা দুর্বল মনের লক্ষণ। মনের জোর না থাকলে আনন্দ যেমন পঙ্গু হয়, শোক দুঃখের তেমনি হয় বাড়াবাড়ি। একমাসের ছেলের মরণ ছোঁয়াচে নয়, ও যে কেঁদে কেঁদে মরতে বসেছে সে রোগ ওর নিজের। ওর মনে

আত্মনির্যাতনের প্রবৃত্তি আছে, মরণের প্রেরণা আছে। ছেলে মরার উপলক্ষটা ও কামনা করেছিল কিনা কে জানে।'

মেয়ের মর্মান্তিক বেদনা সম্বন্ধে যাদবের এই ভয়ানক মন্তব্যে সুলতা প্রীতিবোধ করিল। মেয়ের কান্নাকাটিতে যাদবের বিরক্তি যেন তারই ব্যক্তিগত লাভ। তবু অবিশ্বাসের ভান করিয়া মৃদু হাসির সঙ্গে সে বলিল, 'কি যে বলেন তার ঠিক নেই। অমন কামনা কেউ করে?'

'করে না? তুমি কিছুই জান না ছোট-বৌ।' যাদব একপ্রকার অদ্ভুত হাসি হাসলেন। মনে হইল, তাহার বাক্‌সংযম আজ একেবারেই মুছিয়া গিয়াছে। জীবনের সর্বাপেক্ষা নিভৃত সর্বাপেক্ষা বীভৎস সত্যের সঙ্গে পরিচয় করাইয়া তরুণী বধূটিকে তিনি আজ ভীতা করিয়া তুলিতে চান।

বলিলেন, 'জীবনের এদিকটা তোমার কাছে অন্ধকার ছোট-বৌ। বৈধব্যের রোমান্সের জন্য সব মেয়েই যে মনে মনে স্বামীর মৃত্যু কামনা করে এটা বিশ্বাস করা তোমার পক্ষে কঠিন।'

সুলতার অভিজ্ঞতা কম নয়। চোখ নামাইয়া সংক্ষেপে সে শুধু বলিল, 'কঠিন নয়, বোধ হয় কষ্টকর।'

তার চোখ দিয়া দু'ফোঁটা জল গড়াইয়া পড়িল। যাদব তাহা দেখিতে পাইলেন। তাঁহার আঙুলগুলি কাঁপিতে আরম্ভ করিল। হঠাৎ তিনি কাঁচা-পাকা দাড়ির মধ্যে অঙ্গুলি চালনা করিতে আরম্ভ করিলেন।

দেখিয়া সুলতার মনে হইল আত্মসংযমের এই অতুলনীয় প্রসঙ্গের সঙ্গে তার যেন জন্মজন্মান্তরের পরিচয়। একটা অবাস্তব কল্পনায় নিজের জীবনকে রূপকের রূপ দিয়া যাদবের পায়ে বিদায়ের প্রণামটা এখনি সারিয়া নিবার জন্য তার মন উন্মুখ হইয়া উঠিল। আকাশ-গঙ্গার মত শূন্য বাহিয়া ঝরিতে ঝরিতে এমনি একটি প্রাচীন মহাকালের জটায় একটি সুদীর্ঘ অবিচ্ছিন্ন বিশ্রামের কয়েক মুহূর্তব্যাপী সংক্ষিপ্ত ক্ষুদ্র অভিনয়।

যাদব বলিলেন, 'মনোর সঙ্গে দেখা করে এসো। আমি আমার ঘরে রইলাম।'

মনোরমার সংবাদ কিছুই অসাধারণ নয়। কাঁদিতে গিয়া আজ চোখ এত জ্বালা করিয়াছে যে বারবার কলের জলে চোখ ধুইয়া সে চুপচাপ বিছানায় বসিয়াছিল।

কয়েকদিনের শোকেই শীর্ণ বিবর্ণ হইয়া গিয়াছে। স্বাভাবিক স্বরে কথা বলিবার চেষ্টা আজই বোধ হয় তাহার প্রথম।

'বুকটা শুকিয়ে কাঠ হয়ে গেছে ভাই। এত জল খেয়েছি তা বলবার নয়, তবু তেষ্টা মিটছে না। এমন ঘুমেও ধরেছে আজ, সারাদিন কেবল ঢুলেছি।'

সুলতা সায় দিয়া বলিল, 'শরীরের ওপরে অত্যাচার ত কম হয়নি।'

'না, তা হয়নি।' মনোরমা একটা রঙীন উলের টুপি হাতে তুলিয়া নিল। উদাসভাবে বলিল, 'কিন্তু তাছাড়া আমার বাঁচবার উপায় ছিল না ভাই। বুক ফেটে মরে যেতাম। খোকা ত শুধু আমার ছেলে হয়ে আসেনি; ওর মধ্যে আমি বন্ধু পেয়েছিলাম, সাথী পেয়েছিলাম, প্রেমিক পেয়েছিলাম। বিয়ের পর উনি যেমন নিরাশ্রয় প্রেম নিয়ে ভয়ে বিস্ময়ে আমার দিকে তাকিয়ে থাকতেন, খোকা তেমনিভাবে তাকাতে শিখেছিল। খোকা কাঁদলে আমার মনে হত আমাকে জয় করবার চেষ্টায় উনি আবার মুখর হয়ে উঠেছেন। খোকার হাত গালে ঠেকলে ওঁর প্রথম দিনের স্পর্শ আমার মনে পড়ে যেত, রোমাঞ্চ হয়ে আমার সমস্ত শরীর ঘুমিয়ে পড়ত ভাই।'

সুলতা নীরবে শুনিয়া গেল। তাহার মনে হইল এমনিভাবেই সকলে নিজের আনন্দ ও বেদনাকে স্বতন্ত্র ও মৌলিক মনে করিয়া থাকে বটে। সে ছাড়া আর কোন নারী যে কোন কালে সন্তানকে স্বামীর প্রতিনিধি করিয়া ভালবাসার অরাজক রাজ্যে শৃঙ্খলা আনিবার চেষ্টা করিয়াছে মনোরমা তাহা ভাবিতেও পারে না।

প্রথম পুত্রের মৃত্যু যে স্বামিপুত্র দুজনকে এক সঙ্গে হারানোর মত অসহ্য, পৃথিবীতে মনোরমাই তাহা প্রথম জানিল।

শোক দুঃখের আগাগোড়ায় এ বেদনা তাই চিরস্থায়ী। ত্রিশ বছর পরে স্বামীর যৌবনকালের ফটো দেখিয়া মনোরমার মনের ভিতর হুহু করিয়া উঠিবে, মনে হইবে, এমনি চোখ, এমনি মুখ, এমনি অতুল অতৃপ্ত হাসি নিয়া যে আজ তাহার নিজস্ব হইয়া থাকিত, সে গেল কোথায়?

পুত্রবধূর মধ্যে পুনর্জন্ম নিতে সে কেন পারিল না, হায় ভগবান!

সুলতার চমক ভাঙিল। বালিশে মুখ গুঁজিয়া মনোরমা আবার কাঁদিতে আরম্ভ করিয়াছে।

যাদবের কাছে শেষ বিদায় নেওয়া হয় নাই। এ কান্নার ছোঁয়াচ মনে

লাগাইতে সুলতা সাহস পাইল না। এক পা এক পা করিয়া সে ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল।

যাদব বলিলেন, 'কাল থেকে দুর্ভাবনা শুরু হবে ছোট-বৌ।'

'আমি চলে যাব বলে?'

যাদব বিচলিতভাবে বলিলেন, 'আমার বাড়ি যদি তোমার বাড়ি হ'ত! তিন কাল অশান্তিতে কাটল, শেষের এই মহাকালটাও কি আমার তেমনি অশান্তিতে কাটবে? জীবনে একবার জট পাকালে আর ইতি নেই, ক্ষমা নেই।'

শেষবেলায় আজ জোর বাতাস উঠিয়াছে। যাদবের দাড়িতে চাঞ্চল্য দেখা দেয়, একটা ক্যালেণ্ডার পাখীর পাখার মত দেওয়ালে ঝাপ্টা মারে। সুলতার চোখ মিটমিট করিতে থাকে। যাদবের কোলে ন্যাকড়া জড়ানো যে ঝাপসা শিশুটি হাত পা নাড়িয়া খেলা করে, একেবারে অন্তর্হিত হইয়া যাইবে আশঙ্কায় সুলতা ভাল করিয়া তাকাইতে পারে না।

যাদব আবার বলিলেন, 'বাপের বাড়ি যেতে তোমার খুব ইচ্ছা করে ছোট-বৌ?'

'খুব! একটুও করে না।'

বাপ নাই, বাপের বাড়ি যাওয়ার ইচ্ছা তার হইবে কেন? না গিয়া উপায় নাই তাই যাওয়া। সরমা আর তাহাকে এখানে রাখিবেন না। এ সময়ে এ বয়সে নাকি স্বামীর কাছে থাকিতে নাই।

'তবে তোমায় একটা জিনিস দেখাই বাছা।'—বলিয়া পকেট হইতে যাদব ছোট একটি ফটো বাহির করিয়া সুলতার হাতে দিলেন।

এখানে ওখানে পোকায় কাটিয়া দিয়াছে, লম্বালম্বি পাশাপাশি অজস্র আঁচড় পড়িয়াছে, কিন্তু এ যে একটি তরুণী বধূর ফটো তাহা সহজেই বুঝিতে পারা যায়।

সুলতা ভাল করিয়া ঘুরাইয়া ফিরাইয়া দেখিল। সাড়ে তিন হাত মানুষকে তিন ইঞ্চি করিয়া ফেলা হইয়াছে, ম্লান আলোছায়ার সামঞ্জস্যেই রক্তমাংসের পরিচয়, তবু সুলতার দৃষ্টি ভারী হইয়া উঠিল, এলোমেলো নিঃশ্বাস পড়িল।

'আমার প্রথম স্ত্রীর ছবি ছোট-বৌ। মরবার কয়েক মাস আগে নিজেই তুলেছিলাম। ভাল ওঠেনি।'

'আপনার দু' বিয়ে!'

যাদব হাসিলেন।

'মনোর মা জানেন ?'

'জানেন বইকি ! খুব ভাল করেই জানেন।'

সুলতা বুকের মধ্যে কেমন ভার বোধ করিতেছিল ! চাপা গলায় সে বলিল, 'খুব ভাল করে জানেন কেন ?'

'হাঁ। শান্তি বেঁচে থাকলে আজ মনোর মার চেয়ে বুড়ো হয়ে যেত, কিন্তু মরে গিয়ে সে আমার মনে নতুন-বৌ হয়েই বেঁচে আছে। এ কি মনোর মা টের পায় না বাছা ! এই সেদিন আমায় কবিত্ব করে বলছিল, মরে যাওয়ার পর মানুষের বয়স আর বাড়ে না এ বড় আশ্চর্য গো, এ বড় অন্যায়।'

সুলতা সন্দিগ্ধভাবে বলিল, 'কবিত্ব করে নয়।'

'না। তাহলে নিজের কথায় নিজেই ও আঁতকে উঠত। তেইশ বছরের অভিজ্ঞতা।'

যাদব খানিকক্ষণ নীরব হইয়া রহিলেন। সুলতার মনে হইল, কাঁচা-পাকা গোঁফদাড়ির আড়ালে ঠোঁট দুটি কাঁপিতেছে।

একটা অস্বাভাবিক উত্তেজনা তাহার মাথার মধ্যে দপ্‌দপ করিতে লাগিল। পাশে গিয়া বসা যায় না ? দাড়ি ফাঁক করিয়া দেখা যায় না ঠোঁট দুটি কাঁপিতেছে কিনা ? প্রাচীন যন্ত্রে আত্মার বাণী এমন ক্ষীণ মুমূর্ষু কেন ভাবিয়া সুলতার কান্না আসিবাব উপক্রম হইল।

যাদব বলিলেন, 'মনোর মার সংসারের বাইরে আমার স্থান ছোট-বৌ। শান্তির সঙ্গে সুখদুঃখের সম্পর্ক যেখানে শেষ হয়েছিল সেইখানে। মনোর মা আমার নাগাল পায় না। আমি তেইশ বছর পিছিয়ে পড়েছি। ওর কি সহজ দুঃখ জীবনে !'

সুলতা তাহা জানে। মাসের পর মাস কাটিয়া যায়, দিনে যে কতবার এ বাড়িতে আসে ঠিক নাই, কিন্তু মনোর মার দেখা মেলে কদাচিৎ। নিজের সংসারের কোনখানে যে তিনি নিজেকে গোপন করিয়া রাখেন খুঁজিয়া বাহির করিতে হয়।

একশ' আট রুদ্রাক্ষের মালা নিয়া তিনি কেবল জপই করেন সারাদিন—একান্তে।

একশ' সাতটি রুদ্রাক্ষের পর প্রথমটি আবার ফিরিয়া আসে, গ্রহে গ্রহে পা দিয়া সমস্ত বিশ্ব ঘুরিয়া আসিয়া তিনি বোধ হয় বিশ্বদেবতাকেই প্রণাম করেন।

সহজ বিশ্বদেবতা নন, সেই আদিম প্রেমিক, পৃথিবী যখন মাটির ঢেলা, মানুষ যখন খেলার পুতুল, তখন যে সহস্রশীর্ষ বিরাট পুরুষকেই একমাত্র ভালবাসিতে পারা যায়।

স্থলতার মুখের বিবর্ণতা নিরীক্ষণ করিয়া যাদব বলিলেন, 'বিদায় নিতে এসেছিলে সেকথা তোমার বোধ হয় স্মরণ নেই ছোট-বৌ।' নির্বোধের মত মুখ করিয়া স্থলতা বলিল, 'না সত্যি ভুলে গিয়েছিলাম। কিন্তু বেলা আর নেই। শাশুড়ী হয়ত ওদিকে রাগ করবেন।'

স্থলতা নীরবে উঠিয়া দাঁড়াইয়া প্রস্থানের উদ্যোগ করিল। দরজার কাছে পৌছিলে পিছন হইতে যাদব বলিলেন, 'সাবধানে থেকো ছোট-বৌ, শরীরের যত্ন নিও।'

বলিয়া ঘন ঘন দাড়ির মধ্যে আঙুল চালাইতে আরম্ভ করিলেন।

বারান্দায় পা দিয়া স্থলতা দেখিতে পাইল রুদ্রাক্ষের মালা হাতে মনোর মা চিত্রার্পিতের ন্যায় এক পাশে দাঁড়াইয়া আছেন। ঈষৎ স্থূল দেহে গরদের সজ্জা, চওড়া করিয়া সিঁদুর পরিতে পরিতে সিঁথি রক্তাক্ত টাকের মত প্রশস্ত হইয়া উঠিয়াছে।

স্থলতা তাহাকে প্রণাম করিল।

আঙুলের ডগায় তাহার চিবুকের স্পর্শ আনিয়া চুম্বন করিয়া মনোর মা বলিলেন, 'ব্যাটা কোলে ভালয় ভালয় ফিরে এস মা।'

সকলে ভিড় করিয়া বিদায় দেয়।

পঞ্চু মড়ার মত হাসে, স্থচিত্রা সকলের পিছনে আড়াল খুঁজিয়া নেয়। সরমার মুখের দিকে চাহিয়া সতীশের চোখে পলক পড়ে না। স্থমিত্রা উদাসভাবে পথের গ্যাসের আলোটার দিকে চাহিয়া থাকে। হেমন্ত সকলের অগোচরে কি একটা ইশারা করে, লজ্জার ভান করিয়া স্থলতা মুখ ফিরাইয়া নেয়। ওঠা-নামার সময় সাবধানতা অবলম্বনের জন্য যাদব স্থলতার দাদাকে নানাবিধ উপদেশ দেন। গাড়িতে বসিয়া স্থলতা অনুপস্থিত মনোরমা ও তাহার মার কথা ভাবে।

হলুদ পোড়া

সে বছর কার্তিক মাসের মাঝামাঝি তিনদিন আগে-পরে গাঁয়ে. দু'দুটো খুন হয়ে গেল। একজন মাঝ বয়সী জোয়ান মদ্দ পুরুষ এবং ষোল সতরো বছরের একটি রোগা ভীরু মেয়ে।

গাঁয়ের দক্ষিণে ঘোষেদের মজা পুকুরের ধারে একটা মরা গজারি গাছ বহুকাল থেকে দাঁড়িয়ে আছে। স্থানটি ফাঁকা, বনজঙ্গলের আবরু নেই। কাছাকাছি শুধু কয়েকটা কলাগাছ। ওই গজারি গাছটার নিচে একদিন বলাই চক্রবর্তীকে মরে পড়ে থাকতে দেখা গেল। মাথাটা আটচির হয়ে ফেটে গেছে, খুব সম্ভব অনেকগুলি লাঠির আঘাতে।

চারিদিকে হইচই পড়ে গেল বটে, কিন্তু লোকে খুব বিস্মিত হল না। বলাই চক্রবর্তীর এই রকম অপমৃত্যুই আশেপাশের দশটা গাঁয়ের লোক প্রত্যাশা করেছিল, অনেকে কামনাও করছিল। অন্যপক্ষে শুভ্রা মেয়েটির খুন হওয়া নিয়ে হইচই হল কম, কিন্তু মানুষের বিস্ময় ও কৌতূহলের সীমা রইল না। গেরস্তঘরের সাধারণ ঘরোয়া মেয়ে, গাঁয়ের লোকের চোখের সামনে আর দশটি মেয়ের মত বড় হয়েছে, বিয়ের পর শ্বশুর বাড়ি গেছে এবং মাসখানেক আগে যথারীতি বাপের বাড়ি ফিরে এসেছে ছেলে বিয়োবার জন্য। পাশের বাড়ির মেয়েরা পর্যন্ত কোনদিন কল্পনা করার ছুতো পায়নি যে মেয়েটার জীবনে খাপছাড়া কিছু লুকানো ছিল, এমন ভয়াবহ পরিণামের নাটকীয় উপাদান সঞ্চিত হয়েছিল! গাঁয়ে সব শেষের সাঁঝের বাতিটি বোধ হয় যখন সবে জ্বালা হয়েছে, তখন বাড়ির পিছনে ডোবার ঘাটে শুভ্রার মত মেয়েকে কে বা কারা যে কেন গলা টিপে মেরে রেখে যাবে ভেবে উঠতে না পেরে গাঁ-সুদ্ধ লোক যেন হতভম্ব হয়ে রইল।

বছর দেড়েক মেয়েটা শ্বশুর বাড়ি ছিল, গাঁয়ের লোকের চোখের আড়ালে। সেখানে কি এই ভয়ানক অঘটনের ভূমিকা গড়ে উঠেছিল?

দুটো খুনের মধ্যে কি কোন যোগাযোগ আছে? বিশ ত্রিশ বছরের মধ্যে গাঁয়ের কেউ তেমনভাবে জখম পর্যন্ত হয়নি, যখন হল পর পর একেবারে খুন হয়ে গেল দুটো! তার একটি পুরুষ, অপরটি যুবতী নারী। দুটি খুনের মধ্যে একটা

সম্পর্ক আবিষ্কার করার জন্য প্রাণ সকলের ছটফট করে। কিন্তু বলাই চক্রবর্তী শুভ্রাকে কবে শুধু চোখের দেখা দেখেছিল তাও গাঁয়ের কেউ মনে করতে পারে না। একটুখানি বাস্তব সত্যের খাদের অভাবে নানা জনের কল্পনা ও অনুমানগুলি গুজব হয়ে উঠতে উঠতে মুষড়ে যায়।

বলাই চক্রবর্তীর সম্পত্তি পেল তার ভাইপো নবীন। চল্লিশ টাকার চাকরি ছেড়ে শহর থেকে সপরিবারে গাঁয়ে এসে ক্রমাগত কোঁচার খুঁটে চশমার কাঁচ মুছতে মুছতে সে পাড়ার লোককে বলতে লাগল, 'পঞ্চাশ টাকা রিওয়ার্ড ঘোষণা করেছি। কাকাকে যারা অমন মার মেরেছে তাদের যদি ফাঁসিকাঠে ঝুলোতে না পারি—'

চশমার কাঁচের বদলে মাঝে মাঝে কোঁচার খুঁটে সে নিজের চোখও মুছতে লাগল।

ঠিক একুশ দিন গাঁয়ে বাস করার পর নবীনের স্ত্রী দামিনী সন্ধ্যাবেলা লণ্ঠন হাতে রান্নাঘর থেকে উঠান পার হয়ে শোবার ঘরে যাচ্ছে, কোথা থেকে অতি মৃদু একটু দমকা বাতাস বাড়ির পুব কোণের তেঁতুল গাছের পাতাকে নাড়া দিয়ে তার গায়ে এসে লাগল। দামিনীর হাতের লণ্ঠন ছিটকে গিয়ে পড়ল দক্ষিণের ঘরের দাওয়ায়, উঠানে আছড়ে পড়ে হাত পা ছুঁড়তে ছুঁড়তে দামিনীর দাঁতে দাঁত লেগে গেল। দালানের আনাচে-কানাচে ঝড়ো হাওয়া যেমন গুমরে গুমরে কাঁদে, দামিনী আওয়াজ করতে লাগল সেই রকম।

শুভ্রার দাদা ধীরেন স্থানীয় স্কুলে মাষ্টারি করে। গাঁয়ে সেই একমাত্র ডাক্তার পাস-না-করা। ফিজিক্সে অনার্স নিয়ে বি-এস-সি পাশ করে সাত বছর গাঁয়ের স্কুলে জিওগ্রাফি পড়াচ্ছে। প্রথম দিকে প্রবল উৎসাহের সঙ্গে সাতচল্লিশখানা বই নিয়ে লাইব্রেরী, সাতজন ছেলেকে নিয়ে তরুণ-সমিতি, বই পড়ে পড়ে সাধারণ রোগে বিনামূল্যে ডাক্তারি, এইসব আরম্ভ করেছিল। গেঁয়ো একটি মেয়েকে বিয়ে করে দু'বছরে চারটি ছেলে-মেয়ের জন্ম হওয়ায় এখন অনেকটা ঝিমিয়ে গেছে। লাইব্রেরীর বই-এর সংখ্যা তিনশ'তে উঠে থেমে গেছে, তার নিজের সম্পত্তি হিসাবে বইয়ের আলমারি তার বাড়িতেই তালাবদ্ধ হয়ে থাকে, চাঁদা কেউ দেয় না, তবে দু'চারজন পড়া-বই আর একবার পড়ার জন্য মাঝে মাঝে চেয়ে নিয়ে যায়। বছরে দু'তিনবার তরুণ-সমিতির মিটিং হয়। চার আনা আট আনা ফি নিয়ে এখন সে ডাক্তারি করে, ওষুধও বিক্রী করে।

ধীরেনকে যখন ডেকে আনা হল, কলসী কলসী জল ঢেলে দামিনীর মূর্ছা ভাঙা হয়েছে। কিন্তু সে তাকাচ্ছে অর্থহীন দৃষ্টিতে, আপন মনে হাসছে আর কাঁদছে এবং যারা তাকে ধরে রেখেছিল, তাদের আঁচড়ে কামড়ে পালিয়ে যাবার চেষ্টা করছে।

ধীরেন গম্ভীর চিন্তিত মুখে বলল, 'শা'পুরের কৈলাস ডাক্তারকে একবার ডাকা দরকার। আমি চিকিৎসা করতে পারি, তবে কি জানেন, আমি ত পাস করা ডাক্তার নই, দায়িত্ব নিতে ভরসা হচ্ছে না।

বুড়ো পঙ্কজ ঘোষাল বলাই চক্রবর্তীর অনুগ্রহে বহুকাল সপরিবারে পরিপুষ্ট হয়েছিলেন, তিনি বললেন, 'ডাক্তার? ডাক্তার কি হবে! তুমি আমার কথা শোন বাবা নবীন, কুঞ্জকে অবিলম্বে ডেকে পাঠাও।'

গাঁয়ের যারা ভিড় করেছিল, তারা প্রায় সকলেই বুড়ো ঘোষালের কথায় সায় দিল।

নবীন জিজ্ঞেস করল, 'কুঞ্জ কত নেয়?'

ধীরেন বলল, 'ছি, ওসব দুর্বুদ্ধি কোরো না নবীন। আমি বলছি তোমায়, এটা অসুখ, অন্য কিছু নয়। লেখাপড়া শিখেছ, জ্ঞান বুদ্ধি আছে, তুমিও কি বলে কুঞ্জকে চিকিৎসার জন্য ডেকে পাঠাবে?'

নবীন আমতা আমতা করে বলল, 'এসব খাপছাড়া অসুখে ওদের চিকিৎসাই ভাল ফল দেয় ভাই।'

বয়সে নবীন তিনচার বছরের বড়, কিন্তু এককালে দু'জনে একসঙ্গে স্কুলে একই ক্লাসে পাশাপাশি বসে লেখাপড়া করত। বোধ হয় সেই খাতিরেই কৈলাস ডাক্তার ও কুঞ্জ মাঝি দু'জনকে আনতেই নবীন লোক পাঠিয়ে দিল।

কুঞ্জই আগে এল। লোক পৌঁছবার আগেই সে খবর পেয়েছিল চক্রবর্তীদের বৌকে অন্ধকারের অশরীরী শক্তি আয়ত্ত করেছে। কুঞ্জ নামকরা গুণী। তার গুণপনা দেখবার লোভে আরও অনেকে এসে ভিড় বাড়িয়ে দিল।

'ভর-সাঁঝে ভর করেছেন, সহজে ছাড়বেন না।'

ওই বলে সকলকে ভয় দেখিয়ে সঙ্গে সঙ্গে আবার অভয় দিয়ে কুঞ্জ বলল, 'তবে ছাড়তে হবেই শেষ তক। কুঞ্জ মাঝির সঙ্গে ত চালাকি চলবে না।'

ঘরের দাওয়া থেকে সকলকে উঠানে নামিয়ে দেওয়া হল। বিড়বিড় করে মন্ত্র পড়তে পড়তে কুঞ্জ দাওয়ায় জল ছিটিয়ে দিল। দামিনীর এলো চুল শক্ত করে বেঁধে

দেওয়া হল দাওয়ার একটা খুঁটির সঙ্গে, দামিনীর না রইল বসবার উপায়, না রইল পালাবার ক্ষমতা। তাকে আর কারো ধরে রাখবার প্রয়োজন রইল না। নড়তে গিয়ে চুলে টান লাগায় দামিনী আর্তনাদ করে উঠতে লাগল।

কুঞ্জ টিটকারি দিয়ে দিয়ে বলতে লাগল, 'রও, বাছাধন রও। এখনি হয়েছে কি! মজাটি টের পাওয়াচ্ছি তোমায়!'

ধীরেন প্রথম দিকে চুপ করেছিল। বাধা দিয়ে লাভ নেই। গাঁয়ের লোক কথা শোনে না, বিরক্ত হয়। এবার সে আর ধৈর্য ধরতে পারল না।

'তুমি কি পাগল হয়ে গেছ, নবীন?'

'তুমি চুপ কর, ভাই।'

উঠানে ত্রিশ পঁয়ত্রিশ জন পুরুষ ও নারী এবং গোটা পাঁচেক লণ্ঠন জড়ো হয়েছে। মেয়েদের সংখ্যা খুব কম, যারা এসেছে বয়সও তাদের বেশী। কম বয়সী মেয়েরা আসতে সাহস পায়নি, অনুমতিও পায়নি। যদি ছোঁয়াচ লাগে, নজর লাগে, অপরাধ হয়! মন্ত্রমুগ্ধের মত এতগুলি মেয়ে-পুরুষ দাওয়ার দিকে তাকিয়ে ঘেঁষাঘেঁষি করে দাঁড়িয়ে থাকে, এই দুর্লভ রোমাঞ্চ থেকে তাদের বঞ্চিত করার ক্ষমতা নবীনের নেই। দাওয়াটি যেন ষ্টেজ, সেখানে যেন মানুষের জ্ঞানবুদ্ধির অতীত রহস্যকে সহজবোধ্য নাটকের রূপ দিয়ে অভিনয় করা হচ্ছে, ঘরের দুয়ারে কুঞ্জ যেন আমদানী করেছে জীবনের শেষ সীমানার ওপারের ম্যাজিক। এমন ঘরোয়া, এমন বাস্তব হয়ে উঠেছে দামিনীর মধ্যে অদেহী ভয়ংকরের এই ঘনিষ্ঠ আবির্ভাব! ভয় সকলে ভুলে গেছে। শুধু আছে তীব্র উত্তেজনা এবং কৌতূহল-ভরা পরম উপভোগ্য শিহরণ।

এক পা সামনে এগিয়ে, পাশে সরে, পিছু হটে, সামনে পিছনে দুলে দুলে কুঞ্জ দুর্বোধ্য মন্ত্র আওড়াতে থাকে। মালসাতে আগুন করে তাতে সে একটি দুটি শুকনো পাতা আর শিকড় পুড়তে দেয়, চামড়া পোড়ার মত একটা উৎকট গন্ধে চারিদিক ভরে যায়। দামিনীর আর্তনাদ ও ছটফটানি ধীরে ধীরে কমে আসছিল, এক সময়ে খুঁটিতে পিঠ ঠেকিয়ে কাঠ হয়ে দাঁড়িয়ে সে বোজা-বোজা চোখে কুঞ্জর দিকে তাকিয়ে নিস্পন্দ হয়ে রইল।

তখন একটা কাঁচা হলুদ পুড়িয়ে কুঞ্জ তার নাকের কাছে ধরল। দামিনীর ঢুলু-ঢুলু চোখ ধীরে ধীরে বিস্ফারিত হয়ে উঠল। সর্বাঙ্গে ঘন ঘন শিহরণ বয়ে যেতে লাগল।

'কে তুই? বল, তুই কে?'

'আমি শুভ্রা গো, শুভ্রা। আমায় মেরো না।'

'চাটুজ্যে বাড়ির শুভ্রা? যে খুন হয়েছে?'

'হ্যাঁ গো, হ্যাঁ। আমায় মেরো না।'

নবীন দাওয়ার একপাশে দাঁড়িয়েছিল, তার দিকে মুখ ফিরিয়ে কুঞ্জ বলল, 'ব্যাপার বুঝলেন কর্তা?'

উঠান থেকে চাপা গলায় বুড়ো ঘোষালের নির্দেশ এল, 'কে খুন করেছিল শুধোও না কুঞ্জ? ওহে কুঞ্জ, শুনছো? কে শুভ্রাকে খুন করেছিল, শুধিয়ে নাও চট্ করে।'

কুঞ্জকে কিছু জিজ্ঞেস করতে হল না, দামিনী নিজে থেকেই ফিসফিস করে জানিয়ে দিল, 'বলাই খুড়ো আমায় খুন করেছে।'

নানাভাবে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে অনেকবার তাকে প্রশ্ন করা হল, কিন্তু দামিনীর মুখ দিয়ে এ ছাড়া আর কোন জবাব বার হল না যে, সে শুভ্রা এবং বলাই তাকে খুন করেছে। তারপর একসময় তার মুখ বন্ধ হয়ে গেল, নাকে হলুদ পোড়া ধরেও আর তাকে কথা বলানো গেল না। কুঞ্জ অন্য একটি প্রক্রিয়ার আয়োজন করছিল, কিন্তু কৈলাস ডাক্তার এসে পড়ায় আর সুযোগ পেল না। কৈলাসের চেহারাটি জমকালো, প্রকাণ্ড শরীর, একমাথা কাঁচাপাকা চুল, মোটা ভুরু আর মুখময় খোঁচা খোঁচা গোঁফ দাড়ি। এসে দাঁড়িয়েই ষাঁড়ের মত গর্জন করতে করতে সে সকলকে গালাগালি দিতে আরম্ভ করল, কুঞ্জর আগুনের মালসা তার দিকেই লাথি মেরে ছুঁড়ে দিয়ে বলল, 'দাঁড়া হারামজাদা, তোকে ফাঁসিকাঠে ঝুলোচ্ছি। ওষুদ দিয়ে বৌমাকে আজ মেরে ফেলে থানায় তোর নামে রিপোর্ট দেব, তুই খুন করেছিস।'

কৈলাস খুঁটিতে বাঁধা চুল খুলে দামিনীকে ঘরে নিয়ে গিয়ে বলাই-এর দাদা-মশায়ের আমলের প্রকাণ্ড খাটের বিছানায় শুইয়ে দিল। প্যাঁট করে তার বাহুতে ছুঁচ ফুটিয়ে গায়ে ঢুকিয়ে দিল ঘুমের ওষুধ।

দামিনী কাতরভাবে বলল, 'আমায় মেরো না গো, মেরো না। আমি শুভ্রা। চাটুজ্যে বাড়ির শুভ্রা।'

কয়েক মিনিটের মধ্যে সে ঘুমিয়ে পড়ল।

দামিনীর মুখ দিয়ে শুভ্রা বলাই চক্রবর্তীর নাম করায় অনেক বিশ্বাসীর মনে যে ধাঁধার সৃষ্টি হয়েছিল, বুড়ো ঘোষালের ব্যাখ্যা শুনে সেটা কেটে গেল। শুভ্রার

তিনদিন আগে বলাই চক্রবর্তী মরে গিয়েছিল সন্দেহ নেই, কিন্তু শুধু জ্যান্ত মানুষ কি মানুষের গলা টিপে মারে? আর কিছু মারে না? শ্মশানে-মশানে দিনক্ষণ প্রভৃতির যোগাযোগ ঘটলে পথ-ভোলা পথিকের ঘাড় তবে মাঝে মাঝে মটকে দেয় কিসে!

ব্যাখ্যাটা দেওয়া উচিত ছিল কুঞ্জ গুণীর। বুড়ো ঘোষাল আগেই সকলকে শুনিয়ে দেওয়াতে জোর গলায় তাকে সমর্থন করেই নিজের মর্যাদা বাঁচানো ছাড়া তার উপায় রইল না। তবে কথাটাকে সে ঘুরিয়ে দিল একটু অন্যভাবে, যার ফলে অবিশ্বাসীর মনে পর্যন্ত খটকা বাঁধা সম্ভব হয়ে উঠল। বলাই চক্রবর্তীই শুভ্রাকে খুন করেছে বটে, কিন্তু সোজাসুজি নিজে নয়। কারণ, মরার এক বছরের মধ্যে সেটা কেউ পারে না, ওই সময়ের মধ্যে শ্রাদ্ধ-শান্তি না হলে তবেই সোজাসুজি মানুষের ক্ষতি করার ক্ষমতা জন্মায়। বলাই চক্রবর্তী একজনকে ভর করে তার মধ্যস্থতায় শুভ্রাকে খুন করেছে, তার রক্তমাংসের হাত দিয়ে।

না, যাকে সে ভর করেছিল তার কিছু মনে নেই। মনে কি থাকে!

এক রাত্রে অনেক কান ঘুরে পরদিন সকালে এই কথাগুলি ধীরেনের কানে গেল। অগ্রহায়ণের উজ্জ্বল মিঠে রোদ তখন চারিদিকে ছড়িয়ে আছে, বর্ষার পরিপুষ্ট গাছে আর আগাছার জঙ্গলে যেন পার্থিব জীবনের ছড়াছড়ি। বাড়ির পিছনে ডোবাটি কচুরিপানায় আচ্ছন্ন, গাঢ় সবুজ অসংখ্য রসালো পাতা, বর্ণনাতীত কোমল রঙের অপরূপ ফুল। তালগাছের গুঁড়ির ঘাড়টি কার্তিক মাসেও প্রায় জলে ডুবে ছিল, এখন জল কমে অর্ধেকের বেশী ভেসে উঠেছে। টুকরো বসিয়ে ধাপগুলি এবার ধীরেন বিশেষ করে শুভ্রার জন্য বানিয়ে দিয়েছিল, সাত মাসের গর্ভ নিয়ে ঘাটে উঠতে নামতে সে যাতে পা পিছলে আছাড় না খায়। পাড়ার মানুষ বাড়ি ব'য়ে গাঁয়ের গুজব শুনিয়ে গেল, আবেষ্টনীর প্রভাবে উদ্ভট কথাগুলি সঙ্গে সঙ্গে ধীরেনের মন থেকে বাতিল হয়ে গেল। ক্ষুব্ধ হবার অবসরও সে পেল না। ডোবার কোন্‌দিক থেকে কি ভাবে কে সেদিন সন্ধ্যায় ঘাটে এসেছিল, কেন এসেছিল, এই পুরনো ভাবনা সে ভাবছিল অনেকক্ষণ থেকে। তাই সে ভাবতে লাগল। একমাত্র এই ভাবনা তাকে অন্যমনস্ক করে দেয়। ক্ষোভ ও বিষাদের তার এত প্রাচুর্য এখন যে মাঝে মাঝে কিছুক্ষণের জন্য অন্যমনস্ক হতে না পারলে তার অসহ্য কষ্ট হয়। অন্য কোন বিষয়ে তার মন বসে না।

ভাতের থালা সামনে ধরে দিয়ে শান্তি বলল, 'আমার কিন্তু মনে হয় তাই হবে। নইলে—'

কটমট করে তাকিয়ে ধীরেন ধমক দিয়ে বলল, 'চুপ। যা খুশী মনে হোক তোমার, আমায় কিছু বলবে না। খর্পদার।'

স্কুলে যাওয়ার পথে যাদের সঙ্গে দেখা হল মুখে তারা কিছু বলল না, কিন্তু তাদের তাকানোর ভঙ্গী যেন আরও স্পষ্ট জিজ্ঞাসা হয়ে উঠল: কথাটা তুমি কি ভাবে নিয়েছ শুনি? পুরুতঠাকুর তাকে অনেকক্ষণ দাঁড় করিয়ে রেখে দোষমোচনের জন্য দরকারী ক্রিয়াকর্মের বিষয় আলোচনা করলেন, উপদেশ দিলেন, বিশেষ করে বলে দিলেন যে স্কুল থেকে ফিরবার সময় তার বাড়ি থেকে সে যেন তার নিজের ও বাড়ির সকলের ধারণের জন্য মাদুলি নিয়ে যায়। স্কুলে পা দেওয়ার পর থেকে ধীরেনের মনে হতে লাগল, সে যেন বাইরের কোন বিশিষ্ট অভ্যাগত স্কুল পরিদর্শন করতে এসেছে, তার সাত বছরের অভ্যস্ত অস্তিত্বকে আজ এক মুহূর্তের জন্য কেউ ভুলতে পারছে না।

প্রথম ঘণ্টাতেই ক্লাস ছিল। অর্ধেক ছেলে আড়ষ্ট হয়ে বসে আছে, বাকী অর্ধেক নিজেদের মধ্যে গুজগাজ ফিসফাস করছে। নিজেকে জীবন্ত ব্যাঙের মত মনে হচ্ছিল। বইয়ের পাতায় চোখ রেখে ধীরেন পড়াতে লাগল। চোখ তুলে ছেলেদের দিকে তাকাতে পারল না।

ঘণ্টা কাবার হতেই হেডমাস্টার ডেকে পাঠালেন।

'তুমি একমাসের ছুটি নাও ধীরেন।'

'এক মাসের ছুটি?'

'মথুরবাবু এইমাত্র বলে গেলেন। আজ থেকেই ছুটি পাবে, আজ আর তোমার পড়িয়ে কাজ নেই।'

মথুরবাবু স্কুলের সেক্রেটারী। মাইল খানেক পথ হাঁটলেই তার বাড়ি পাওয়া যায়। চলতে চলতে মাঝপথে ধীরেনের মাথাটা কেমন ঘুরে উঠল। ক'দিন থেকে হঠাৎ চেতনায় ঝাঁকি লেগে মাথাটা তার এই রকম ঘুরে উঠছে। চিন্তা ও অনুভূতির আকস্মিক পরিবর্তনের সঙ্গে এই ঝাঁকি লাগে। অথবা এমনি ঝাঁকি লেগে তার চিন্তা ও অনুভূতি বদলে যায়।

গাছতলায় কিছুক্ষণ বিশ্রাম করে সে বাড়ির দিকে পা বাড়াল। মথুরবাবু এখন হয়ত খেয়েদেয়ে বিশ্রাম করছেন, এখন তাঁকে বিরক্ত করা উচিত হবে না। স্কুল থেকে তাড়িয়ে দেওয়া হয়নি, এক মাসের ছুটি দেওয়া হয়েছে। এক মাসের মধ্যে মথুরবাবুর সঙ্গে দেখা করার অনেক সময় সে পাবে। আজ গিয়ে হাতে-পায়ে

না ধরাই ভাল। মথুরবাবু, যদি দয়া হয়, যদি তিনি বুঝতে পারেন যে তার বোন খুন হয়েছে বলে দামিনীর ঘোষণার ফলে তার বোনের কাল্পনিক কেলেঙ্কারি নিয়ে চারিদিকে হইচই হচ্ছে বলে তাকে দোষী করা উচিত নয়, তাহলে মুশকিল হতে পারে। ছুটি বাতিল করে কাল থেকে কাজে যাবার অনুমতি হয়ত তিনি দিয়ে বসবেন। এতক্ষণ খেয়াল হয়নি, এখন সে বুঝতে পেরেছে, নিয়মিতভাবে প্রতি-দিন স্কুলে ছেলেদের পড়ানোর ক্ষমতা তার নেই। মথুরবাবুর সামনে গিয়ে দাঁড়াতে লজ্জা হচ্ছে। চেনা মানুষের সঙ্গে দেখা হয়ে যাবার ভয়ে সে মাঠের পথ ধরে বাড়ি চলেছে। বাড়ি গিয়ে ঘরের মধ্যে লুকোতে হবে। দুর্বল শরীরটা বিছানায় লুটিয়ে দিয়ে ভারী মাথাটা বালিশে রাখতে হবে।

সারা দুপুর ঘরের মধ্যে শুয়ে বসে ছটফট করে কাটিয়ে শেষবেলায় ধীরেন উঠানে বেরিয়ে এল। মাজা বাসন হাতে নিয়ে শান্তি ঘাট থেকে উঠে আসছিল। ডোবার ধারে প্রকাণ্ড বাঁশ ঝাড়টার ছায়ায় মানুষের মত কি যেন একটা নড়াচড়া করছে।

ধীরেন আর্তনাদ করে উঠল, 'কে ওখানে ? কে ?'

শান্তির হাতের বাসন ঝনঝন শব্দে পড়ে গেল। উঠি-পড়ি করে কাছে ছুটে এসে ভয়ার্তকণ্ঠে সে জিজ্ঞাসা করল, 'কোথায় কে ? কোন্‌খানে ?'

বাঁশ ঝাড় থেকে চেনা গলার অওয়াজ এল !—'আমি মাস্টারবাবু। বাঁশ কাটছি।'

'কে তোকে বাঁশ কাটতে বলেছে ?'

শান্তি বলল, 'আমি বলেছি। ক্ষেন্তি পিসী বলল, নূতন একটা বাঁশ কেটে আগা মাথা একটু পুড়িয়ে ঘাটের পথে তাড়াতাড়ি ফেলে রাখতে। ভোরে উঠে সরিয়ে দেব, সন্ধ্যের আগে পেতে রাখব। তুমি যেন আবার ভুল করে বাঁশটা ডিঙিয়ে যেও না।'

সন্ধ্যার আগেই শান্তি আজকাল রাঁধাবাড়া আর ঘরকন্নার সব কাজ শেষ করে রাখে। অন্ধকার ঘনিয়ে আসার পর ধীরেনকে সঙ্গে না নিয়ে বড় ঘরের চৌকাট পার হয় না। ছেলেমেয়েদেরও ঘরের মধ্যে আটকে রাখে। সন্ধ্যা থেকে ঘরে বন্দী হয়ে ধীরেন আকাশ-পাতাল ভাবে আর মাঝে মাঝে সচেতন হয়ে ছেলে-মেয়েদের আলাপ শোনে।

'ছোটপিসী ভূত হয়েছে।'

'ভূত নয়, পেত্নী। ব্যাটাছেলে ভূত হয়।'

ঘরের মধ্যেও কারণে-অকারণে শান্তি ভয় পেয়ে আঁতকে ওঠে। কাল প্রথম রাত্রে একটা প্যাঁচার ডাক শুনে ধীরেনকে আঁকড়ে ধরে গোঙাতে গোঙাতে বমি করে ফেলেছিল।

বড় ঘরের দাওয়ার পুব প্রান্তে বসে তামাক টানতে টানতে দিনের আলো ম্লান হয়ে এল। এখানে বসে ডোবার ঘাট আর দু'ধারের বাঁশ ঝাড় ও জঙ্গল দেখা যায়। জঙ্গলের পর সেনেদের কলাবাগান। সেনেদের কাছারি ঘরের পাশ দিয়ে দূরে বোসেদের মজা পুকুরের তীরে মরা গজারি গাছটার ডগা চোখে পড়ে। অন্ধকার হবার আগেই কুয়াশায় প্রথমে গাছটা তারপর সেনেদের বাড়ি আবছা হয়ে ঢাকা পড়ে গেল।

'তুমি কি আর ঘাটের দিকে যাবে?' শান্তি জিজ্ঞেস করল।

'না।'

'তবে বাঁশটা পেতে দাও।'

'বাঁশ পাততে হবে না।'

শান্তি কয়েক মুহূর্ত চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল।

'তোমার চোখ লাল হয়েছে। টকটকে লাল।'

'হোক।'

'শোবার ঘর আর রান্নাঘরের ভিটের সঙ্গে দু'টি প্রান্ত ঠেকিয়ে শান্তি নিজেই বাঁশটা পেতে দিল। কাঁচা বাঁশের দু'প্রান্তের খানিকটা পুড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। অশরীরী কোন কিছু এ বাঁশ ডিঙোতে পারবে না। ঘাট থেকে শুভ্রা যদি বাড়ির উঠানে আসতে চায়, এই বাঁশ পর্যন্ত এসে ঠেকে যাবে।

আলো জ্বালার আগেই ছেলেমেয়েদের খাওয়া শেষ হল। সন্ধ্যাদীপ না জ্বেলে শান্তির নিজের খাওয়ার উপায় নেই, ভাল করে সন্ধ্যা হওয়ার আগেই সে তাড়াতাড়ি দীপ জ্বেলে ঘরে ঘরে দেখিয়ে শাঁখে ফুঁ দিল। দশ মিনিটের মধ্যে নিজে খেয়ে ধীরেনের ভাত বেড়ে ঢাকা দিয়ে রেখে, রান্নাঘরে তালা দিয়ে, কাপড় ছেড়ে ঘরে গিয়ে ঢুকল। বিকালে আজকাল সে মাছ রান্না করে না, এঁটোকাঁটা নাকি অশরীরী আত্মাকে আকর্ষণ করে। খাওয়ার হাঙ্গামা খুব সংক্ষেপে, সহজে এবং অল্প সময়ে সম্পন্ন হয়ে যায়।

'ঘরে আসবে না ?'

'না।'

তখনো আকাশ থেকে আলোর শেষ আভাসটুকু মুছে যায়নি। দু'তিনটি তারা দেখা দিয়েছে, আরও কয়েকটি দেখা দিতে দিতে আবার হারিয়ে যাচ্ছে। আর এক মিনিট কি দু'মিনিটের মধ্যে রাত্রি শুরু হয়ে যাবে। জীবিতের সঙ্গে মৃতের সংযোগ স্থাপনের সবচেয়ে প্রশস্ত সময় সন্ধ্যা! ভর-সন্ধ্যাবেলা শুভ্রা দামিনীকে আশ্রয় করেছিল। আজ সন্ধ্যা পার হলে রাত্রি আরম্ভ হয়ে গেলে চেষ্টা করেও শুভ্রা হয়ত তার সঙ্গে কথা বলতে পারবে না। আর দেরি না করে এখুনি শুভ্রাকে সুযোগ দেওয়া উচিত।

চোরের মত ভিটে থেকে নেমে বাঁশ ডিঙিয়ে ধীরেন পা টিপেটিপে ডোবার মাঠের দিকে এগিয়ে গেল।

অদ্ভুত বিকৃত গলার ডাক শুনে শান্তি লণ্ঠন হাতে ঘর থেকে বেরিয়ে এল। বাঁশের ওপারে দাঁড়িয়ে হিংস্র জন্তুর চাপা-গর্জনের মত গম্ভীর আওয়াজে ধীরেন তার নিজের নাম ধরে ডাকাডাকি করছে। গেঞ্জি আর কাপড়ে কাদা ও রক্ত মাখা। ঠোঁট থেকে চিবুক বেয়ে ফোঁটা ফোঁটা রক্ত গড়িয়ে পড়ছে।

'বাঁশটা সরিয়ে দাও।'

'ডিঙিয়ে এসো! বাঁশ ডিঙিয়ে চলে এসো! কি হয়েছে? পড়ে গেছ নাকি?'

'ডিঙোতে পারছি না। বাঁশ সরিয়ে দাও।'

বাঁশ ডিঙোতে পারছে না! মাটিতে শোয়ানো বাঁশ! শান্তির আর এতটুকু সন্দেহ রইল না। আকাশ-চেরা তীক্ষ্ণগলায় সে আর্তনাদের পর আর্তনাদ শুরু করে দিল।

তারপর প্রতিবেশী এল, পাড়ার লোক এল, গাঁয়ের লোক এল। কুঞ্জও এল। তিন চার কলস জল ঢেলে ধীরেনকে স্নান করিয়ে দাওয়ার খুঁটির সঙ্গে তাকে বেঁধে ফেলা হল। মন্ত্র পড়ে, জল ছিটিয়ে, মালসার আগুনে পাতা ও শিকড় পুড়িয়ে ঘণ্টা খানেকের চেষ্টায় ধীরেনকে কুঞ্জ নিঝুম করে ফেলল।

তারপর মালসার আগুনে কাঁচা হলুদ পুড়িয়ে ধীরেনের নাকের কাছে ধরে বজ্রকণ্ঠে সে জিজ্ঞাসা করল, 'কে তুই? বল তুই কে?'

ধীরেন বলল, 'আমি বলাই চক্রবর্তী! শুভ্রাকে আমি খুন করেছি।'

দ্রষ্টব্য খুব বেশী অসাধারণ নয়, কিন্তু কমলার দেখিবার ভঙ্গীতে মনে হয় এ যেন পৃথিবীর সর্বাপেক্ষা অপূর্ব দৃশ্য।

মাঠের দক্ষিণে একসারি নিষ্কম্প নারিকেল তরু, মাঠের মাঝখানে পাতা-ঝরা একটি পেয়ারা গাছ, উত্তরে আম বাগানের জমাট শ্যামলতা এবং ইহাকে বেষ্টন করিয়া অর্ধ-চক্রাকার ইট-বাঁধানো লাল পথ। পথের ধারে, ঘোষসাহেবের সাদা বাড়ির সামনে, টেলিগ্রাফ পোস্টে হৃষ্টপুষ্ট গাভীটি বাঁধা রহিয়াছে। রায়বাবুদের জমাদার কিষণ প্রত্যহ দুইবেলা গাভীটিকে আনিয়া ওই পোস্টে বাঁধিয়া ঘোষ-সাহেবের চাকরের সামনে খাঁটি দুধ দুহিয়া দিয়া যায়।

নিকটে বাছুরটি দাঁড়াইয়া আছে, নিষ্কম্প, নিশ্চল,—বীভৎস। দু'মাসের বাছুরটি মানুষের সীমাহীন লোভের প্রায়শ্চিত্ত করিতে পনরো দিন আগে মরিয়া গিয়াছিল, মানুষ তবু তাহাকে রেহাই দেয় নাই। চামড়া ছাড়াইয়া নিয়া ভিতরে খড় পুরিয়া কাঠের পায়ে সামনে দাঁড় করাইয়া প্রতিনিয়ত গাভীটিকে প্রতারণা করিতেছে।

নির্বোধ পশু মৃত্যু বোঝে না। ক্রমাগত চাটিয়া চাটিয়া সন্তানের নিথর অঙ্গে জীবনের সাড়া আনিবার চেষ্টা করে। এতদূরে জানালায় দাঁড়াইয়া তাহার গভীর কালো চোখের সকাতর চাহনি কমলা যেন স্পষ্ট দেখিতে পায়। তার চোখ জ্বালা করিতে থাকে, সর্বাঙ্গ থরথর করিয়া কাঁপিয়া ওঠে। ক্ষুব্ধ হৃদয়ে সে কিষণকে অভিশাপ দেয়, মানুষকে ঘৃণা করে।

তার মনে পড়ে ফুকা নামক প্রক্রিয়ার কথা, গরুর দুধ বাড়ানোর যে বীভৎস উপায়ের কথা কিছুদিন আগে সে শুনিয়াছে। কমলার মনে হয় মানুষ পারে না এমন কাজ নাই।

মাথা ঝিমঝিম করে কমলার।

কমলা এদিকের জানালায় সরিয়া আসে।

নিচে ফুলের বাগান, বাগানের শেষে ফল-বাগিচা। তাহার শেষ প্রান্তে বাদামী রঙের ঘর তিনখানা এ বাড়িরই পরিসীমার অন্তর্গত। গাছের ফাঁক দিয়া ঘর তিনখানির দিকে কমলা শূন্য দৃষ্টিতে চাহিয়া থাকে।

তার চোখ দিয়া দু'ফোঁটা জল গড়াইয়া পড়ে।

বারান্দায় জুতার শব্দ হয়।

স্বামীর পদশব্দ কমলা চেনে তবু সে যেন চমকাইয়া ওঠে। ছিটকাইয়া গিয়া সে দরজায় খিল তুলিয়া দেয়।

ছোট ছোট নিঃশ্বাসের দোলনে তার অপরিপুষ্ট স্তন দুটিতে দোলা লাগে। কমলা ব্লাউজের বোতাম লাগায় না। লোকের সামনে শুধু শাড়ির আঁচলটা গায়ে জড়ায়।

দরজায় টোকা দিয়া খানিকক্ষণ নীরবে অপেক্ষা করিয়া অনন্ত ম্লান মুখে ফিরিয়া যায়। ঘরের মাঝখানে শক্ত হইয়া দাঁড়াইয়া কমলা যতক্ষণ শোনা যায় কান পাতিয়া তাহার পদশব্দ শোনে।

তার চোখ ছলছল করে।

আজ কিন্তু অনন্ত ফিরিয়া গেল না। রুদ্ধ দরজায় করাঘাত করিয়া বলিল, আমার সাড়া পেয়ে দরজা বন্ধ করলে যে? মুখ দেখবে না?

খুলচি।

খিল খুলিতে কমলার অনাবশ্যক সময় লাগিল। হাতে সে দু'গাছা শাঁখা পরিয়াছে, খিল খুলিবার সময় সরু রুলির পাশে শাঁখা দু'টি কি চমৎকার মানাইয়াছে চোখে পড়ায় সে অবাক হইয়া গিয়াছিল।

অনন্তের বয়স ত্রিশ বত্রিশ, সুঠাম চেহারা। শরীর দেখিয়া স্বাস্থ্যের অভাব অনুমান করা যায়না, চোখ দু'টি কিন্তু তাহার সর্বদা ক্লান্ত, নিদ্রাতুর। যারা হাই-পাওয়ারের চশমা ব্যবহার করে, চশমা খুলিয়া রাখিলে তাদের চোখ যেমন ঢুলু ঢুলু দেখায়, তেমনি।

হাসিয়া বলিল, এ যেন আমার নিদ্রাপুরী কমলা। দুয়ার খুলেও খুলতে চায় না।

কমলা চুপ করিয়া রহিল।

কমলার মুখ দেখিয়া হাসি বন্ধ করিয়া অনন্ত বলিল, বিরক্ত করলাম?

না।

কিন্তু মুখ দেখে যে মনে হয় বিরক্তির সীমা নেই। মনে হয়—

কি মনে হয়?

অনন্ত একটু ভাবিয়া বলিল, মনে হয় এটা যেন জেলখানার সেল, আর তুমি

তার কয়েদী। তোমায় জেল দিয়েছে হাকিম, কিন্তু নিরপরাধ জেলারকে দেখে রাগে চোখ লাল করে ফেলেছ।

কমলা মৃদুস্বরে বলিল, রাগে নয়।

অনুরাগে ?

এই পরিহাসের জবাবে কমলা নীরব হইয়া রহিল। খাটের প্রান্তে বসিয়া তার আপাদমস্তক নিরীক্ষণ করিয়া অনন্ত বলিল, ভূষণের অন্তর্ধান, বসনের বিদ্রোহ! এ শাড়ি তোমায় কে এনে দিয়েছে শুনি ?

আমার কিন্তু খুব পছন্দ হয়েছে।

এনে দিয়েছে কে ?

আমি আনিয়েছি।

আমি এনে দিইনি।

কে এনে দিয়েছে শুনবে ? সুশীলবাবু।

অনন্তেব মুখ অন্ধকার হইয়া আসিল।

সুশীল ? ওকে বরখাস্ত করতে হবে।

মোটা একটা চুরুট ধরাইয়া অনন্ত গম্ভীরভাবে ধূমপান করিতে লাগিল।

কমলা বলিল, বরখাস্ত করতে হবে কেন ? আমার আদেশ পালন করেছে বলে ?

না। আমার আদেশ পালন কবেনি বলে।

কমলা ম্লান ভাবে হাসিল, ও! তবে বরখাস্ত কবতেই হবে।

ক্ষণকাল নীরব থাকিয়া অনন্ত বলিল, সুশীলের স্পর্ধা এত বেড়েছে কেন জান কমল ? ওব ছেলেকে তুমি অতিরিক্ত আদর কর বলে।

কমলা উদাসভাবে বলিল, হবে! কিন্তু এ স্পর্ধা নয়। এতে আমি ওঁর বিনয়ের লক্ষণই খুঁজে পাই। কৈফিয়ত সৃষ্টি করছ কেন ? দিও তুমি সুশীলবাবুকে বিদায় করে।

অনন্ত স্তব্ধ হইয়া রহিল। তাহার চুরুটের ধোঁয়া পাক খাইতে খাইতে উপরে উঠিতে লাগিল ; মন্থর গতি। এদের কলহও এমনি অলস, এমনি সংক্ষিপ্ত, এমনি ভীরু। কেহ রাগ করে না, ধৈর্য হারায় না, কড়া কথা বলে না। এই যে সামান্য একটু আলোচনা হইয়া গেল ইহা শুনিয়া বাহিরের লোকের পক্ষে কল্পনা করাও কঠিন যে, সুশীলকে বরখাস্ত করিতে না পারিলে অনন্ত বহুদিন ধরিয়া মনে মনে ক্ষুণ্ণ

হইয়া থাকিবে, পারিলে তাহার জের কমলা সহজে মিটিতে দেবে না। কিন্তু ইহাদের অভিজ্ঞতা এমনি প্রচুর যে ভবিষ্যতের এই অতিরিক্ত দুর্গতির সম্ভাবনায় সন্দেহ করিবার সুযোগও পায় না। সুশীল থাক বা যাক, আজ হইতে দু'জনের সম্পর্ক আরও বৈচিত্র্যহীন আরও নীরস হইয়া উঠিবে, কমলা চট পরিয়া থাকিলে অনন্ত তাহা দেখিতে পাইবে না, অনন্তের কোন কথার মৃদুতম প্রতিবাদ করিতেও কমলা ভুলিয়া যাইবে!

কমলার চোখ জলজল করিতে লাগিল। একি জীবন! আনন্দের অভাব শুধু নয়, নিরানন্দের প্রাচুর্য! অথচ কারণ খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। ভুল অনন্ত অনেক করিয়াছে এবং তাহার মধ্যে অনেকগুলি ভুল নিন্দনীয়, কিন্তু পরমাত্মীয়ের ত্রুটি-বিচ্যুতি ক্ষমা করিতে ত খুব বেশী উদারতার প্রয়োজন হয় না। কেন সে তা পারে না? তা ছাড়া এ ত ক্ষতি, নিজেকে অধিকতর বঞ্চিত করা।

চুরুটটা ছুঁড়িয়া ফেলিয়া অনন্ত বলিল, সময় সময় তোমার মুখের দিকে চেয়ে আমি লজ্জা পাই কমল।

সে ত আমারি লজ্জা।

তা বটে! কতদিন আমরা পরস্পরের কাছে লজ্জিত হয়ে আছি?

কমলা বলিল—মনে নেই।

মনে না থাকা আশ্চর্য কিন্তু অসঙ্গত নয়। অনন্ত আর কিছু বলিল না।

লঘুপদে ঘরে ঢুকিল মাধুরী। কোলে তার বছর দেড়েকের একটি রুগ্ন শিশু। শিশুটি ক্ষীণস্বরে কাঁদিতেছিল।

কমলার দিকে খোকাকে বাড়াইয়া দিয়া মাধুরী বলিল, গিয়ে থেকে কাঁদছে। বাপমার কাছে একঘণ্টা ছেলে থাকতে চায়না একি লজ্জা বলুন ত?

বলিয়া সে সকৌতুকে হাসিল। সে হাসিতে লজ্জার চিহ্নও ছিল না। কমলাই চোখ তুলিয়া তাহার দিকে চাহিতে পারিল না, খোকাকে কোলে নিয়া অপরাধীর মত বলিল, সুশীলবাবু কি বললেন?

মাধুরী হাসিল, কি আর বলবে? শখ মিটে বিরক্ত হয়ে উঠল। কথা ত শুনবে না! সকাল থেকে বলছি, কি হবে খোকাকে এনে? থাকবে তোমার কাছে খোকা? তা কেবলি বলতে লাগল, নিয়েই এসোনা একবার খোকাকে, দু'দিন যে ওকে আমি দেখিনি। অসুখ হলে ওর ন্যাকামি যেন বেড়ে যায়।

কমলা নীরবে জানালায় গিয়া দাঁড়াইল।

দাঁড়াইয়া থাকিবার কোন প্রয়োজন মাধুরীর ছিল না, কিন্তু কমলার পিঠে আঁচলে বাঁধা চাবির গোছার দিকে চাহিয়া সে দাঁড়াইয়াই রহিল। পরের কোলে গিয়াই ছেলে যে চুপ করিয়াছে এতে তার যেন কৌতুকের সীমা নাই। ছেলে পর হইয়া যাওয়ার আনন্দ যথাসাধ্য উপভোগ না করিয়া সে যেন এখান হইতে নড়িবে না।

অনন্ত স্তিমিত নেত্রে মাধুরীর দিকে চাহিয়া ছিল, দীর্ঘ রাত্রি জাগরণের পর তার যেন বড় ঘুম পাইয়াছে। হঠাৎ সে সোজা হইয়া বসিল। এমন জমজমাট সৌন্দর্য সে জীবনে কখনো ছাখে নাই, পাথরে খোদাই করা এমন অর্থহীন তীব্র হাসিও নয়। মাধুরীর চোখের পাতাটি যেন কাঁপে না, এক পায়ে ভর দিয়া দাঁড়ানোর ভঙ্গীতে অবসাদ আসে না, অনেক দিনের ইঁট-চাপা ঘাসের মত একমুহূর্তে সমস্ত মুখ অসুস্থ সাদা হইয়া ওঠে ;—প্রতিফলিত সূর্যালোকের মত তার সেই বর্ণহীন শুভ্ররূপ দুই চক্ষুকে পীড়ন করে।

কমলা অস্ফুটস্বরে খোকার উদ্যত কান্না সংযত করে, বারেকের জন্যও মুখ ফিরাইয়া তাকায় না।

কমলার দিকে চাহিয়া অনন্তের মাথার মধ্যে ঝিম্‌ঝিম্ করিতে লাগিল। পরের ছেলে কোলে নিয়া ও মুখ ফিরাইয়া তাকায় না কেন? কি ভাবে ও? সে যে সুশীলকে কেন বরখাস্ত করিতে চায় মনে মনে তারই একটা ভুল বিশ্লেষণ করিয়া চলিতেছে কি?

অনন্তের মনে হইল মাধুরী উপস্থিত না থাকিলে আজ সে কমলাকে না বলিয়া থাকিতে পারিত না, কোন্ নিগ্রহের একটানা আতঙ্কে তার দিনগুলি ভরিয়া উঠিয়াছে, পরের দিনের কি দুর্ভাবনায় অর্ধেক রাত্রি তার বিনিদ্র কাটিয়া যায়।

অনন্ত উঠিয়া দাঁড়াইল। কমলাকে কি বলিতে গিয়া হঠাৎ নীরবেই ঘর ছাড়িয়া চলিয়া গেল।

নিচে নামিয়া পিছনের মৃদু আহ্বানে অনন্ত চমকিয়া দাঁড়াইয়া পড়িল।

মাধুরী বলিল, আমি আজ নিজে সন্দেশ করেছি। খেয়ে দেখবেন কেমন হয়েছে?

অনন্ত বিবর্ণ মুখে বলিল, রোজ রোজ কষ্ট করে কেন তুমি এসব করতে যাও মাধুরী?

আমার কোন কষ্ট নেই। তবে আপনি যদি বিরক্ত হন—

তার চোখের সামনে কমলার দিকে চাহিয়া উদ্ধত হাসি হাসিবার পর এই সকরুণ বিনয় প্রকাশে অনন্তের মুখ আরও বিবর্ণ হইয়া গেল। বলিল, সুশীলের অসুখ শুনলাম—

সামান্য অসুখ। আমি কাছে থাকলে বিরক্ত হয়ে ওঠেন। সারাদিন আজ কবিতা লিখেছেন—

সামান্য কয়েকটি কথার কৈফিয়ত ও অনুনয়ের কি অপূর্ব সমন্বয়! অনন্ত যেন হতাশ হইয়া গেল,—কবিতা?

হ্যাঁ। লিখবার সময় ওকে দেখলে আমার এমন ভয় করে! চোখ রক্তবর্ণ, কপালে একটা শিরা দপদপ করছে—

জ্বরের জন্য বোধ হয়।

মাধুরী ম্লানভাবে হাসিল, হবে। কিন্তু আমার ভয় করে।—কোথায় বসবেন?

লাইব্রেরীতে।

অনন্ত চিন্তিত মুখে লাইব্রেরীতে গিয়া বসিল। একটা প্লেটে একটিমাত্র সন্দেশ আনিয়া কাগজপত্র সরাইয়া টেবিলে নামাইয়া রাখিয়া মাধুরী বলিল, করেছি বোধ হয় পঞ্চাশটা, খাবেন মোটে একটা।

বেশী খেলে তুমি খুশী হবে?

মাধুরী ম্লানমুখে বলিল, হ'তাম, বেশী খেলে যদি আপনার শরীর খারাপ হওয়ার ভয় না থাকত।

একটু একটু করিয়া ভাঙিয়া সন্দেশটা খাইয়া অনন্ত বলিল, জীবনটা দুর্বোধ্য হয়ে উঠেছে মাধুরী।

স্বাস্থ্য সম্বন্ধীয় কথা ওঠার পরেই জীবন সম্বন্ধে তার এই আকস্মিক মন্তব্যে মাধুরী একটু বিস্মিত হইল। মৃদুস্বরে বলিল, জীবন দুর্বোধ্য বইকি।

একচুমুক জল পান করিয়া অনন্ত বলিল, শুধু অসামঞ্জস্য, কেবল খাপছাড়া বিধান। উচিত অনুচিতে এতটুকু মিল নেই। প্রমাণ ছাখো, শরীরে স্বাস্থ্য নেই, তোমার তৈরী সন্দেশ একটার বেশী খেতে পারিনা, মনে শক্তি নেই, সামান্য উত্তেজনার সূত্রপাতে আতঙ্ক হয়। তবু ত জীবন আমার নিঃস্ব নয়।

নয়? মাধুরীর কণ্ঠস্বর যেন অনুযোগ করিল, আপনি ত উদাসীন, সন্ন্যাসী!

অনন্ত করুণভাবে হাসিয়া বলিল, উদাসীন নই, ভীরু; সন্ন্যাসী নই, দুর্বল।

ছেলেবেলা চোর-চোর খেলায় আমার ছিল বুড়ী ছুঁয়ে বিশ্রামের খেলা। আজও আমি তেমনি অশক্ত হয়ে আছি মাধুরী। নিজে চুরি হয়ে গেলেও ঠেকাবার ক্ষমতা আমার নেই। যে খেলা শক্তিমানের, আমার কি উচিত সে খেলায় যোগ দেওয়া ?

মাধুরীর সমস্ত মুখ আবার সাদা হইয়া গিয়াছিল, নতচোখে অস্ফুটস্বরে সে বলিল, জানিনে। কিন্তু দুর্বলের সঙ্গে ছাড়া যে খেলতে পারে না, সে তবে কি করবে ?

সে সকলের খেলা দেখবে, একটা মোটা বই টানিয়া নিয়া অনন্ত বলিল, হাল্কা মানুষ ভেসে উঠবে আকাশে। সেখান থেকে পৃথিবীর দিকে চেয়ে থাকবে। মর্ত্যের সুখদুঃখের সঙ্গে ওছাড়া তার আর সম্পর্ক কি ?

আকাশ ছোঁয়া কথা ! অনন্তের মুখের দিকে চাহিয়া মাধুরী চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। অনন্ত মোটা বইটার উপর ঝুঁকিয়া পড়িল।

অনেকক্ষণ পরে ভয়ে ভয়ে মাধুরী বলিল, আপনার ওষুধ আনব ? কিছু খেয়ে সেটা খেতে হয় ?

অনন্ত মুখ তুলিয়া বলিল, আনো। কিন্তু একটা কথা শুনে যাও। সুশীলকে বরখাস্ত করতে চেয়েছিলাম বলে কমলার সঙ্গে আজ আমার ঝগড়া হয়েছে।

আর ঝগড়া করবেন না।

বলিয়া মাধুরী ওষুধ আনিতে চলিয়া গেল।

ওষুধ খাইবার সময় অনন্তের মনে হইল একবার উপরে গিয়া গোপনে আর্শিতে দেখিয়া আসিবে তার চোখ দুটিও রক্তবর্ণ হইয়া উঠিয়াছে কিনা, কপালের একটা শিরা দপদপ করিতেছে কিনা। সেও কি আজ অসুস্থতার কবি নয় ?

প্রথম দিন কমলা খালি পায়ে কাঁকর বিছানো পথে হাঁটিতে পারে নাই। এখন কোনই অসুবিধা হয় না।

পথের দু'দিকে ফুলের চারাগুলি যেন ফুল-ফোটানোর প্রতিযোগিতা শুরু করিয়াছে। পটপট করিয়া কয়েকটা রক্তগোলাপ ছিঁড়িয়া কমলা খোকার হাতে দিল। ফুলগুলির দিকে হাত বাড়াইয়া খোকা অস্ফুট আবেদন জানাইয়াছিল বলিয়া নয়, ফুল ছিঁড়িতে আজকাল আর তার দ্বিধা হয় না।

সুশীলের ঘর তিনখানার পিছনে প্রকাণ্ড কৃষ্ণচূড়ার ডগায় পড়ন্ত রোদ বিবর্ণ সোনার রঙ মাখাইয়াছে। আকাশে মেঘ নাই কিন্তু কার্তিকের কুয়াশার ইঙ্গিতে শূন্য ভরাট। রোদের রঙ তা আংশিক আত্মসাৎ করিয়াছে।

তিনটি সিঁড়ি ভাঙ্গিলে একেবারে সুশীলের শয়নকক্ষে পৌছানো যায়। সুশীল শুষ্কমুখে বিছানায় বসিয়া—একটু নিঃশব্দ হাসি দিয়া সে কমলাকে অভ্যর্থনা করিল।

খোকাকে নিয়ে এলাম।

তা দেখতে পাচ্ছি। কিন্তু ওটাকে ফেলে এলেই ভাল করতেন। ওকে দেখলে জীবনে আমার যত ক্ষতি হয়ে গেছে সব একসঙ্গে মনে পড়ে।

কমলা চমকাইয়া উঠিল। জীবনে যার বোধহয় সবটাই ক্ষতি, জীবনের সমস্ত ক্ষতির কথা তার একসঙ্গে মনে পড়া কি ভয়ংকর!

সজল চোখে সে বলিল, আপনার কাছে মাপ চাইতেও আমার লজ্জা করে। জানেন, সব দেখেশুনে দিন দিন আমার স্নেহমমতা পর্যন্ত শুকিয়ে উঠছে। আপনার ছেলে আপনাকে ফিরিয়ে দিতে পারলে আমি বাঁচতাম।

খোকাকে সে বিছানায় নামাইয়া দিল। ক্ষীণ শিশুটি যেন ক্রমেই তার অপরাধের মত অসহ্য ভারী হইয়া উঠিতেছিল।

কমলা টুলটাতে বসিলে সুশীল বলিল, আপনাকে বলাই ভাল। খোকার জন্য আমার কোন নালিশ নেই।

কমলা সংশয়ভরে বলিল, কেন?

আপনার মধ্যে ও যে আমার আপন হয়ে রইল এই আমার পরম লাভ। না, কোন কিছুর জন্যেই আমার নালিশ নেই।

কমলা নীরব হইয়া রহিল। নালিশ নাই! বালিশের তলা হইতে একটি ক্ষুদ্র ছিটের জামার যে অংশটুকু বাহির হইয়া আছে সে যেন সেটা চেনে না, তাকে আসিতে দেখিয়া সুশীল যে জামাটি বালিশের নিচে লুকাইয়াছিল এ যেন সে অনুমান করিতে পারে না! কি ভাবে তাকে সুশীল? কমলার মনে হইল, এ তার শাস্তি। স্ত্রী-পুত্র বাঁচিয়া থাকিতে শূন্য ঘরে শূন্য মনে এর দিন কাটে, ঘরের বিশৃঙ্খলতায়, ঘরের দেয়ালে দেয়ালে, ওই মলিন শূন্য শয্যায় বিষাদের প্রলেপ পড়িয়াছে। এ ঘরে এ ভাবে বসিয়া থাকার বাড়া শাস্তি আর কি হইতে পারে মানুষের?

অপরাধই বা তার কম কি? কিছুই ত তার অজানা নাই। প্রতিকার প্রথম হইতেই সুশীলের আয়ত্তে ছিল! যেদিন খুশী ওই রঙ-চটা তোরঙ্গে

জামা কাপড় ভরিয়া স্ত্রীর হাত ধরিয়া বিদায় নিলে কে তার পথ আটকাইত? এ বিপদ এমনি শ্রীহীন এমনি ভয়ানক যে পলায়নে লজ্জা ছিল না। কিন্তু দিনের পর দিন পুঞ্জীভূত সর্বনাশকে সে নীরবে স্বীকার করিয়া নিয়াছে, আত্মরক্ষার চেষ্টামাত্র করে নাই। তা যে অকারণে নয় তার চেয়ে কে তা ভাল করিয়া জানে?

এলোচুলে মুখ প্রায় ঢাকিয়া গিয়াছিল, কমলা তাহা সরাইবার চেষ্টা করিল না। ঘোমটার মত কালো চুল তার মুখের লজ্জা ঢাকিয়া রাখুক।

চালে আগুন লাগার সুযোগে গৃহস্থের ঘরের ভিত্তিতে যে সিঁধ কাটিয়াছে এ ভাবেই তাহাকে লজ্জা গোপন করিতে হয়। কমলা তা জানে। অনেকদিন ধরিয়া অনেক রাত্রি জাগিয়া বাদামী রঙের তিনখানা ঘরে অনেক স্বপ্নের সংসার পাতিয়া এ বিষয়ে তার পুরাপুরি জ্ঞান জন্মিয়াছে।

ঘরের আলো আবছা হইয়া আসার সঙ্গে সুশীল কখন শুইয়া পড়িয়াছিল কমলা টের পায় নাই। মুখ তুলিয়া দেখিয়া তার বুকের মধ্যে কেমন করিয়া উঠিল। একটা অদ্ভুত ঘটনা ঘটিয়াছে। এতক্ষণ চুপচাপ বাপের কাছে থাকিয়া তার দুই বাহুর আবেষ্টনীতে খোকা ঘুমাইয়া পড়িয়াছে।

খোকা বুঝি ঘুমোলো?

সুশীল ক্লিষ্টস্বরে বলিল, হ্যাঁ। আমার গায়ের গরমে বোধহয় আরাম পেয়েছিল।

গায়ের গরম! জ্বর বাড়ল আপনার?

জবাবের প্রতীক্ষা না করিয়া কাছে গিয়া কমলা তার কপালে হাত রাখিল। জ্বর বাড়িয়াছে।

অসুস্থ শরীরে সারা দিন কেন কবিতা লিখলেন?

সুশীল মৃদুস্বরে বলিল, অসুখ শরীরে বিনা কাজে দিন যে কাটে না। আলোটা জ্বালুন ত, অন্ধকার হয়ে এল। তারপর খোকাকে নিয়ে যান। অসুস্থের সঙ্গ ওর পক্ষে স্বাস্থ্যকর নয়।

কমলার ইচ্ছা হইল জিজ্ঞাসা করে, অসুস্থের সঙ্গ কার পক্ষে স্বাস্থ্যকর। কিন্তু কণ্ঠস্বর কেমন শুনাইবে জানা না থাকায় কথা বলিতে সে সাহস পাইল না। আলোটা খুঁজিয়া নিয়া দেশলাই জ্বালিতে সে অনাবশ্যক দেরি করিয়া ফেলিল। একটু বদল না করিয়া মুখের ভাবটা সে সুশীলকে দেখাইতে চায় না। *

* হাত মকস্ করার সময় লেখা।

ফাঁদ

সুভদ্রার বাবা একটি নাম-করা যাত্রার দলে তবলা বাজাইত। সেই যাত্রার দলেই বার তের বছর বয়স পর্যন্ত সুভদ্রা কৃষ্ণ সাজিয়াছিল। কৃষ্ণ সাজিয়া গোপিনীদের পাকা পাকা কথা ও মিষ্টি মিষ্টি গান শোনানো বন্ধ করিতে করিতে সুভদ্রার বয়সটা একটু বেশী হইয়া গিয়াছিল। অভিনয় বন্ধ করিয়া বাড়ি পাঠানোর কথা তুলিলেই সুভদ্রা ক্ষেপিয়া যাইত। শেষ পর্যন্ত বাড়ি অবশ্য তাকে পাঠাইয়া দিতে হইল। বিবাহের আয়োজনও চলিতে লাগিল। ইতিমধ্যে কৃষ্ণ না সাজিয়াই একসঙ্গে পাড়ার তিনটি ছেলের সঙ্গে প্রেম আরম্ভ করায় কলঙ্কের আর সীমা রহিল না। আরেকজনের সঙ্গে সুভদ্রা তখন একদিন পলাইয়া গেল। পালানোর সময় কোন আপনজনের কাছে যাওয়ার ইচ্ছা অবশ্য তার ছিল না, কিন্তু পালানোর আগে যার সঙ্গ ছাড়া সে একটা দিন বাঁচিয়া থাকিতে পারিবে না ভাবিয়াছিল, দু'দিনের মধ্যে তাকে দেখিলেই তার সমস্ত শরীর রাগে সিরসির করিয়া উঠিতে লাগিল। সঙ্গীটিকে ছাড়িয়া সে তাই গিয়া হাজির হইল দূরের এক গ্রামে তার দিদির কাছে। সেখানে মিষ্টি মিষ্টি গান গাহিয়া সকলকে সে মুগ্ধ করিয়া দিল, আর একটু ভাব করিল ভগ্নীপতির সঙ্গে। সে খেলা ভগ্নীপতি বুঝিত না যে খেলায় শুধু পরস্পরের মন ভুলানো আর সব আছে কিন্তু ধরা দেওয়া নাই। একদিন তাই অসময়ে জোর করিয়া সুভদ্রাকে জড়াইয়া ধরায় সেটা দিদির চোখে পড়িয়া গেল।

কিছু দূরের একটি গ্রামে মহেন্দ্র নামে ভগ্নীপতির একজন অন্তরঙ্গ বন্ধুর সদ্য সদ্য বৌ মরিয়াছিল। তাড়াতাড়ি সে তার সঙ্গে সুভদ্রার বিবাহ দিয়া দিল।

মহেন্দ্রের সঙ্গে বড় ভাব হইয়া গেল সুভদ্রার। ভয়ানক বদমেজাজী মানুষ মহেন্দ্র, লম্বা চওড়া প্রকাণ্ড তার শরীর আর শরীরে ষাঁড়ের মত জোর। মেয়েমানুষ যে মোলায়েম জীব এটা বোধ হয় তার জানাই ছিল না। তার প্রচণ্ড ব্যক্তিত্ব, নিষ্ঠুর পৌরুষ, বীভৎস ভালবাসা আর বাস্তব দরদ যেন সাবান দিয়া আছড়াইয়া কাপড় কাচার মত সুভদ্রার মনের ছেলেমানুষী ময়লা সাফ করিয়া দিল। মনের আনন্দে সুভদ্রা বৌ হইয়া কাটাইয়া দিল কয়েকটা বছর।

তারপর আবার তার মনটা কেমন করিতে লাগিল একটা অজানা কিছুর জন্ম। মহেন্দ্রের আলিঙ্গনে শিহরণ জাগার বদলে দম আটকাইয়া আসিতে লাগিল। ধীরে ধীরে তার মনে হইতে লাগিল, রসিক নামে যে রোগা লম্বা ভীরু ছেলেটা মাঝে মাঝে আসে, তার কাছে কি মন কেমন করার ওষুধ আছে? সাধন বৈরাগী নামে যে রূপবান পুরুষটা তার মন ভুলানোর চেষ্টায় নাওয়া-খাওয়া ছাড়িয়াছে সে কি তাকে দিতে পারিবে সে যা চায়?

একদিন মাঝরাত্রে সুভদ্রা ধরা পড়িয়া গেল। রাশি রাশি মেঘে ঢাকা আকাশ হইতে বৃষ্টি পড়িতেছিল টিপি টিপি, মোলায়েম একটু ঠাণ্ডা পড়িয়াছিল। সারাদিনের গা-জ্বালানো গরমের পর, একেবারে অচেতন হইয়া ঘুমানো উচিত ছিল মহেন্দ্রের। আগের রাত্রে গরমে সিদ্ধ হইতে হইতেও সে মরার মত ঘুমাইতেছিল, সুভদ্রা কখন উঠিয়া গিয়া কখন বিছানায় ফিরিয়া আসিয়াছিল কিছুই টের পায় নাই। দু'চারটি রাত্রি বাদ দিয়া তার আগের আরও পাঁচ সাতটি রাত্রেও টের পায় নাই। আজ যে কেন তার ঘুম ভাঙিয়া গেল।

হয়ত জাগিয়াই ছিল, কে বলিতে পারে। একবার ঘুমাইলে মহেন্দ্রের ঘুম সহজে ভাঙে না। উঠিয়া যাওয়ার সময় সুভদ্রা আস্তে তার গায়ে একবার ঠেলাও দিয়াছিল। গায়ে ঠেলা দেওয়ায় যে জাগে নাই কয়েক মিনিট পরে আপনা হইতে তার ঘুম ত ভাঙিবার কথা নয়।

রসিক গায়ে জড়াইয়া আসিয়াছিল ছেঁড়া একটা সস্তা কম্বল। ভয় পাওয়ার অভ্যাস থাকিলে কম্বল জড়ানো সেই চেনা মানুষটিকে দেখিয়া সুভদ্রা হয়ত মূর্ছা যাইত। তার বদলে বর্ষা-বাদলের রাত্রে ভালবাসিয়া জ্বালাতন করিতে আসিয়াছে বলিয়া রসিকের হাত ধরিয়া হিড়হিড় করিয়া তাকে সে টানিয়া নিয়া গেল উঠানের দক্ষিণে, ধানের মরাইটার গা-ঘেঁষা ছোট আটচালার নিচে। আটচালার অর্ধেকটা ভরিয়া ছিল চ্যালানো আম কাঠে আর বাকী অর্ধেকটা ভরিয়া ছিল চাষের যন্ত্রপাতি আর ভাঙা গরুর গাড়ির চাকা হইতে আরম্ভ করিয়া দুমড়ানো কেনেস্তারা পর্যন্ত রকমারি জঞ্জালে। তার মধ্যে একটু স্থান করিয়া রসিকের গায়ের কম্বল বিছাইয়া তারা বসিয়াছিল।

তারপর রসিকের বুকে মাথা রাখিয়া ভর্ৎসনার সুরে সুভদ্রা সবে বলিয়াছে, 'আজ আবার কেন এলে শুনি মুখপোড়া?'

আর আবেগ ও আবেদনে কাঁদ কাঁদ গলায় রসিক সবে জবাব দিয়াছে, 'না এসে থাকতে পারলাম না, মাইরি বলছি—'

এমন সময় সেখানে মহেন্দ্র আসিয়া হাজির। দু'জনকেই মহেন্দ্র সম্ভবতঃ খুন করিয়া ফেলিত, কিন্তু নাগাল সে পাইল না একজনেরও। লম্বা রোগা বাইশ বছরের ছোকরা রসিক চোখের পলকে উধাও হইয়া গেল আর স্বভাব খারাপ হইলেও ঘরের বৌ এত রাত্রে ঘরেই থাকিবে জানিয়া মহেন্দ্র ছুটিয়া গেল রসিকের পিছনে। সেই অবসরে গোয়ালের পিছন দিয়া সুভদ্রা পালাইয়া গেল উল্টা দিকে।

সেদিকেও ঘুমন্ত গ্রাম ছিল অনেক দূর অবধি ছড়ানো, কুকুর ডাকিতেছিল এদিকে ওদিকে, দূরে শোনা যাইতেছিল চৌকিদারের হাঁক আর জমকালো ভেজা অন্ধকার ভরাট করিয়া খেয়ালের নাগাল ছাড়াইয়া উঠিয়াছিল ব্যাঙের গানের একটানা আওয়াজ। সোহাগী বৌ রঙীন শাড়ি পরিতে পায় বলিয়া আর রঙীন কাপড় অন্ধকারে সাদা কাপড়ের মত সহজে চোখে পড়ে না বলিয়া, নিজেকে সুভদ্রার মনে হইতেছিল ভাগ্যবতী।

গ্রামের শেষ বাড়িটি শুধু গোটা দুই ভাঙা ঘর, তারই একটিতে এত রাত্রে একজন গান গাহিতেছিল। চেনা চলতি গান, সুভদ্রার নিজের গান। দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া কিছুক্ষণ সে গান শুনিল। খণ্ডিতা রাধার মানভঞ্জনের জন্য তখন সে যে গানটি গাহিত ভাঙা মোটা গলায় ভুল সুরে কথা বদলাইয়া গাহিতেছে বটে অদৃশ্য গায়ক, কিন্তু আবেগ আছে লোকটার।

আবেগ-ভরা লোকগুলি বড় অধীর হয়। ভিজা শাড়িখানা গায়ে আঁটিয়া গিয়াছে, দেখিবামাত্র হয়ত সাপটাইয়া ধরিবে। ওভাবে কেউ সাপটাইয়া ধরিলে বড় খারাপ লাগে সুভদ্রার। গা বমি বমি করে, দম আটকাইয়া আসে, মনে হয় সে যেন হঠাৎ এগার বছরের মেয়ে হইয়া গেছে আর যাত্রা দলের সেই যুধিষ্ঠির শেষরাত্রে শ্রীকৃষ্ণের বেশধারী তাকে আসরের খানিক তফাতে একটা ছোট আটচালার নিচে ডাকিয়া নিয়া গিয়া এক হাতে তার মুখ চাপিয়া ধরিয়াছে আর আরেক হাতে তাকে বাঁধিয়া ফেলিয়াছে কাছি দিয়া বাঁধার মত।

কিন্তু উপায় ছিল না। এত রাত্রে কে আর তাকে খাতির করিবে। সুভদ্রাকে ভিতরে গিয়া দাঁড়াইতে হইল। সাধন বৈরাগী মূর্ছা গেল না, দু'চোখ বড় বড় করিয়া গানের বদলে একটা অদ্ভুত আওয়াজ করিতে লাগিল।

সুভদ্রা বলিল, 'আমি গো আমি।'

তখন সাধন বৈরাগী শান্ত হইল। কিন্তু আবার অশান্ত হইয়া উঠিল অল্পক্ষণের মধ্যেই, আনন্দ ও উত্তেজনায়।

প্রথমে সুভদ্রা ভাবিয়াছিল, রসিকের জন্য বোধ হয় একটু মন কেমন করিবে। একটু যেন পছন্দ হইয়াছিল রসিককে তার, দু'একদিন গভীর রাত্রে তার যেন মনেও হইয়াছিল, বেতালা বাঁশীর সুরে জানান দিয়া আজ কি রসিক আসিবে? ভাসা ভাসা একটু রসজ্ঞান ছিল রসিকের, দুপুর রাতের গোপন মিলনে মাঝে মাঝে একটু রসের সঞ্চারও যেন সে করিতে পারিত। কিন্তু বহুদিন ধরিয়া যে ভাবে তার মন কেমন করিয়া আসিয়াছে, এখনও তেমনিভাবে মন কেমন করিতে লাগিল বটে, সেটা রসিকের জন্য নয়। স্বামীর ঘরে ফেলিয়া আসা শাড়ি গয়নার মত রসিকও তুচ্ছ হইয়া গিয়াছে, এতটুকু আপসোসও সুভদ্রার নাই। রসিক বলিয়া কেউ কি কোনদিন তার মাথার চুলে হাত বুলাইয়া দিতে দিতে মৃদুস্বরে বর্ণনা করিত, আসিবার সময় কোন বাড়িতে নতুন বর ও বধূর ঘরে বেড়ার ফাঁকে উঁকি দিয়া একজনকে কি ভাবে আর একজনের পায়ে ধরিয়া সাধাসাধি করিতে দেখিয়া আসিয়াছে, আর শুনিতে শুনিতে তার মনে হইত সে যেন হাল্কা হইয়া গিয়াছে, মুক্তি পাইয়াছে, চাঁচের বেড়ায় ঘেরা চারকোণা জেলখানায় জোরালো দু'টি বাহুর বন্ধন যেন তার আর নাই।

মনটা সুভদ্রার খুঁতখুঁত করে, এরকম হওয়া উচিত ছিল না। রসিকও শেষ পর্যন্ত তাকে ফাঁকি দিল, এতটুকু স্থান দাবি করিতে পারিল না তার মনে।

সাধন বৈরাগীর চেহারাটি বড় সুন্দর। প্রথম দিন তাকে দেখিয়াই সুভদ্রা তীব্র বিদ্বেষ আর হিংসা অনুভব করিয়াছিল, মনে হইয়াছিল এই লোকটাই বুঝি জীবনযুদ্ধে তার সবচেয়ে বড় প্রতিযোগী। তারপর সাধনের অনেকদিনের প্রাণপাত সাধনার পুরস্কারস্বরূপ দূর হইতে একটু একটু ভাব করিয়া এতকাল তাকে শুধু সে যন্ত্রণাই দিয়া আসিয়াছে। এখন হঠাৎ একেবারে ধরা দিয়া, অনেক দূরের অচেনা এক শহরে অজানা মানুষের মধ্যে ছোট একটি টিনের ঘরে চব্বিশ ঘণ্টা একসঙ্গে বসবাস করিবার মত ভয়ানকভাবে ধরা দিয়া, সুভদ্রা দেখিল লোকটাকে সে যেরকম ভাবিয়াছিল সে মোটেই সেরকম নয়। বিদ্বেষ বা হিংসার কোন কারণ নাই, বরং রীতিমত অবজ্ঞা করা চলে। যে জোরালো আবেগ ও

উচ্ছ্বাসের আশঙ্কা সে করিয়াছিল সেটা জোয়ারের মত নয়, কলের ফোয়ারার মত। তাও আবার সে উৎসের ভাণ্ডারে সঞ্চয় বড় কম, কলটাও গিয়াছে বিগড়াইয়া, হঠাৎ প্রচণ্ড বিক্রমে উথলাইয়া উঠিয়া অল্পক্ষণের মধ্যেই ঝিমাইয়া পড়ে। শুধু চেহারার টানে অনেক মেয়ে আসিয়া তার রসটুকু শুষিয়া নিয়া গিয়াছে বুঝা যায়। আর রাখিয়া গিয়াছে অহংকার, স্বার্থপরতা তার পাগলামি, যে সব কোনদিন কোন মেয়ের কোন কাজেই লাগে না।

সুভদ্রা হতাশ হইয়া ভাবিল, তাইত।

সে রাত্রে ভিজা রঙীন শাড়িটি ছাড়িয়া সুভদ্রা সাধন বৈরাগীর গেরুয়া লুঙ্গি আর আলখাল্লা দিয়া নিজেকে ঢাকিয়াছিল। পরদিন পথে তার জন্য দু'সেট শাড়ি ও সেমিজ কিনিয়া গেরুয়া রঙে ছাপাইয়া নেওয়া হইয়াছিল। তখন দু'জনকে দেখিয়া মানুষের মনে হইয়াছিল, স্বর্গের কোন দেবতা বুঝি একটি অপ্সরাকে সেবাদাসী করিয়া মর্ত্যলোকে বেড়াইতে নামিয়া আসিয়াছেন।

এখানে ওখানে যে ক'টা দিন তারা ঘুরিয়া বেড়াইয়াছে, কত লোক সাগ্রহে তাদের সেবা ও ভোগের ব্যবস্থা করিয়া দিয়াছে, আশ্রয় দিয়াছে, প্রণামীও দিয়াছে। সুভদ্রার বড় ভাল লাগিয়াছিল সে জীবন। কোথায় যাইবে, কোথায় থাকিবে, কি খাইবে, কে জানে! পথ চলিতে আলস্য বোধ করিলে একটা গরুর গাড়িকে থামাইয়া উঠিয়া বসিলেই হইল। বাঁধানো বড় সড়কে একদিন দামী একটা মটর-গাড়ি দাঁড় করাইয়া দু'জনে উঠিয়া বসিয়াছিল, হাওয়ার বেগে চল্লিশ মাইল পথ পার হইয়া গিয়া পৌঁছিয়াছিল সদরে। ক্ষুধা পাইলে ময়রার দোকানে খাবার চাহিয়া খাইলেই হয়, মুদীর দোকানে চাল-ডাল চাহিয়া গাছতলায় রাঁধিলেই হয়, নয়ত গৃহস্থের বাড়ি গিয়া বলিলেই হয়, আমরা আসিয়াছি অন্ন দাও। পয়সা দরকার হইলে, দু'চার দশজনের কাছে চাহিলেই চলে। আশ্রয় ত আছে সর্বত্র, মুচির ভাঙা ঘরে নোংরা মেঝেতে সঙ্গের কম্বল বিছাইয়া চামড়ার গন্ধ নিঃশ্বাস নিতে নিতেও ঘুমানো যায়, ফুল ও চন্দনের গন্ধভরা মন্দিরের বাহিরে অতিথিশালায় জীবন্ত মানুষের ভেপসা গন্ধ নিঃশ্বাস নিতে নিতেও ঘুমানো যায়, চোর ডাকাত কি খুনির আস্তানা সে বিষয়ে মাথা না ঘামাইয়া আশ্রয় নেওয়া যায় বড়লোক গৃহস্থের বাড়িতে। গেরুয়াধারী নরনারীর ত সম্পদ কিছু থাকে না পুণ্য ছাড়া, যা থাকে তার উপরেও ত লোভ করা চলে না, কামনাও করা চলে না সুন্দরী সন্ন্যাসিনীকে। তাতে পাপ হয়, পাপ করিলে মানুষ নরকে যায়। এমন নির্ভর নিশ্চিন্ত বাধাবন্ধনহীন সহজ

সরল জীবনযাপনের সুযোগ থাকিতে মানুষ যে কেন দম আটকাইয়া পচিয়া মরে ঘরের মধ্যে!

কিন্তু সাধন বৈরাগী বলিয়াছে, 'উঁহু, এক জায়গায় স্থিতি হয়ে না বসলে কি চলে?'

সুভদ্রা যদি বলিত খুব চলে, সাধনকেও অবশ্য তা মানিয়া নিতে হইত। কিন্তু মনমরা বিরক্ত আর নিরুৎসাহ সঙ্গী যদি সারাদিন প্যানপ্যান করে কানের কাছে, আর মুখ ভার করিয়া থাকে চোখের সামনে, মুক্তিও কি মানুষের ভাল লাগে? এই শহরে তাই তারা নীড় বাঁধিয়াছে।

সুভদ্রা ভাবিয়াছে, আর যাই হোক, যা খুশী ত করা চলিবে এখানে, পরের কর্তালি, পরের ইচ্ছা অনিচ্ছা বিধি-নিষেধ ত তাকে ঘেরিয়া থাকিবে না।

ঘর বাঁধিলে রোজগারের ব্যবস্থা করা দরকার।

সাধন বৈরাগী বলিল, 'ভিক্ষে করা চলবে না কিন্তু।'

কোন রকমে দিন কাটানোর সঙ্গতি সাধন বৈরাগীর ছিল, তার মা রাখিয়া গিয়াছে। জীবনে সে প্রথম একতারা হাতে ভিক্ষা করিতে বাহির হইয়াছে সুভদ্রার জন্য। বাহির হইয়াছে অসময়ে, মানুষ যখন ভিখারীকে তাড়াইয়া দেয়। সুভদ্রা তাকে বঞ্চিত করে নাই, নিজেই ভিক্ষা দিতে আসিয়াছে, মুচকি হাসিয়া বলিয়াছে, 'একটা গান কর ত বৈরিগী ঠাকুর।'

সুভদ্রা তাই তামাশা করিয়া বলিল, 'কেন, ভিক্ষে ত তুমি করতে বৈরিগী ঠাকুর?'

অনেক তামাশাতেই সাধন বৈরাগী পুলকিত হইতে জানে না, এদিক দিয়া মানুষটা সে একটু ভোঁতা।

রোজগারের উপায়টা ঠিক করিল সুভদ্রা। বাড়ির সামনে রাস্তার ধারে যে হাততিনেক চওড়া বারান্দাটুকু আছে সেখানে দু'টি দোকান খোলা হইল, পান-বিড়ি আর তেলেভাজার দোকান। পানবিড়ির দোকানের ভার রহিল সাধনের, তেলেভাজার দোকানের ভার রহিল সুভদ্রার। বাড়িওয়ালা এবং বাড়ির আরও তিন ঘর ভাড়াটের কাছে চাওয়ামাত্র অনুমতি পাওয়া গেল।

দোকান খোলার আগের দিন সুভদ্রা বলিল, 'সবাইকে বলে এসো, আজ সন্ধ্যেবেলা কৃষ্ণলীলা গান গেয়ে শোনাব। দোকান যে খুলছি জানানো ত চাই সবাইকে?'

আসর করা হইয়াছিল উঠানে, সন্ধ্যাবেলা সেখানে মানুষ আর আঁটে না। কৃষ্ণলীলার অনেক গান সুভদ্রা জানিত, একাই সে তিনঘণ্টা আসর জমাইয়া রাখিল। অনেকদিন এ সব গান সে গায় নাই, একটু ভয় তার ছিল গানগুলি ঠিকভাবে গাহিতে পারিবে কিনা। কিন্তু আরম্ভ করা মাত্র আগের মতই গানের মোহ কখন যে তাকে মাতাল করিয়া পৃথিবী ভুলাইয়া দিল। এ বাড়ির একজন ভাড়াটে গিরীন সাউ চমৎকার বেহালা বাজায়, হারমোনিয়াম আর তবলা বাজানোর লোকও সেই সংগ্রহ করিয়া আনিয়াছিল। সুভদ্রা ভাবিয়াছিল, শুধু বসিয়া থাকিয়াই গানগুলি গাহিয়া যাইবে। কিন্তু প্রথম গানের অর্ধেকটাও বসিয়া বসিয়া গাওয়া চলিল না। রাধার কাছে যাওয়ার সময় পথে চন্দ্রাবলী তাকে ধরিয়া নিজের কুঞ্জে টানিয়া আনিয়াছে, রাধার জন্য মন আকুল হইয়া আছে কিন্তু বাহিরে সে চতুরালি করিতেছে চন্দ্রাবলীর সঙ্গে, উঠিয়া দাঁড়াইয়া ঘুরিয়া ফিরিয়া প্রত্যেকটি অঙ্গপ্রত্যঙ্গের সাহায্য ছাড়া এ কি প্রকাশ করা যায়? একটি হাঁটু পাতিয়া বসিয়া সামনে ঝুঁকিয়া পায়ে না ধরিলে কি খণ্ডিতা রাধার কাছে নিবেদন করা যায়, হৃদয়ে যার শুধু রাধার চিহ্ন আঁকা বাহিরের অঙ্গে তুচ্ছ নখচিহ্ন দেখিয়া তার উপর রাগ করা রাধার উচিত নয়?

গানের শেষে সুভদ্রা ঘরে গিয়া শুইয়া পড়িল। সাধন ঘরে গেল অনেক পরে। খোলা দরজার বাহিরে তখনও মানুষকে চলাফেরা করিতে দেখা যাইতেছে, কলরব শোনা যাইতেছে। সাধন ঘরে আসিবামাত্র সুভদ্রা বিছানা ছাড়িয়া উঠিয়া তার সামনে এক হাঁটু মাটিতে নামাইয়া সামনে ঝুঁকিয়া দু'হাতে তার পা ধরিয়া বলিতে লাগিল, 'সত্যি বলছি আমি, তুমি ছাড়া আমি কাউকে জানি না। কোন দিন কোন পর-পুরুষের দিকে আমি তাকাই নি—'

সাধন তার গালে টোকা দিয়া বলিল, 'সত্যি?'

সুভদ্রা কাতর হইয়া বলিল, 'কেন সন্দেহ করছ? রসিককে যে মাঝে মাঝে আসতে দিতাম তাও ত তোমার জন্যেই? মাইরি বলছি, যখন আর সইতে পারতাম না, মনে হত আর একটু'খন তোমায় না পেলে বুক ফেটে যাবে, শুধু তখন একটু সময়ের জন্যে—'

বিছানায় গিয়া এলাইয়া পড়িয়া বলিল, 'উঃ, মাগো! আমি আর বাঁচব না।'

বেহালা-বাদক গিরীন সাউ-এর বৌ কালিদাসী আসিয়া বলিল, 'খাবে না বষ্টুম দিদি? কি গানটাই গাইলে বষ্টুম দিদি!'

সুভদ্রা উঠিয়া খাইতে গেল এবং পেট ভরিয়াই খাইল। সে রাত্রে সাধনকে সে আর কাছে ঘেঁষিতে দিল না। কালিদাসী যে সম্মান করিয়া তাকে আজ প্রথম বঠুম দিদি বলিয়া ডাকিয়াছে তাতে তার মনে বড়ই আঘাত লাগিয়াছিল।

পরদিন সকালে এত খদ্দের আসিয়া জুটিল যে সাধনের দোকানের অল্প বিড়ি সিগারেট ফুরাইয়া গেল আধ ঘণ্টার মধ্যে, বেগুনী ফুলুরি ভাজিয়া সুভদ্রা অর্ধেক লোকের দাবি মিটাইয়া উঠিতে পারিল না। সকলেই সুভদ্রার গানের প্রশংসা করিতে চায়, বলিতে চায় যে বেগুনী ফুলুরির এমন স্বাদ ত জীবনে তারা পায় নাই। সংকীর্ণ বারান্দায় উবু হইয়া বসিয়া আর বারান্দার সামনে গোল হইয়া দাঁড়াইয়া সকলে যেন একটি বৈঠক বসাইয়া দিল। লোচন কুমোর প্রতিমা গড়িতে ওস্তাদ, একটি মাত্র বেগুনী খাইয়া যেন নেশা হইয়াছে এমনিভাবে সে আধঘণ্টা হাঁ করিয়া চাহিয়া রহিল সুভদ্রার দিকে।

সুভদ্রার আশ্চর্য মুখের ছাঁদ ও দেহের গড়ন দেখিয়া তার মনে ভাবের তরঙ্গ উঠিতে লাগিল।

একে সামনে রাখিয়া সে যদি প্রতিমা গড়িবার সুযোগ পাইত! সতীশ গোয়ালা ভাবিতে লাগিল, ইনি নিশ্চয় সাক্ষাৎ ভগবতী। বংশী হালদার সারাদিন মিউনিসিপ্যালিটির ট্যাক্স আদায় করিয়া ঘুরিয়া বেড়ায়, সুভদ্রার গেরুয়া বেশ যেন রোদে ঝলসানো শহরের সুরকির পথের মত চোখে তার ধাঁধা লাগাইয়া দিতে লাগিল। নটবর একজন বড়লোকের খানসামা, সে ভাবিতে লাগিল, সুভদ্রার সঙ্গে একবার যদি ঘনিষ্ঠতা করাইয়া দেওয়া যায়, কি খুশীই বাবু হইবেন। এই চারজন ছাড়া সকলেই কমবেশী কথা বলিতেছিল, দু'একজন কথা বলিবার চেষ্টায় ঢোঁক গিলিতেছিল।

'এবার আমি রাঁধতে যাই?' বলিয়া এক সময় সুভদ্রা ভিতরে চলিয়া গেল। আবার দোকান খুলিল একেবারে সেই বিকালে। একবেলাতেই দোকানদারিতে তার বিতৃষ্ণা জন্মিয়া গিয়াছে। লোকগুলি বড় ভোঁতা, বড় নীরস। বেগুনী ফুলুরি কিনিতে আসিয়া তাকে যেন সকলেই বাঁধিয়া ফেলিতে চায়, তার সাহচর্যে ভুলিয়া যাইতে চায় নিজেদের।

বিকালেও খদ্দের আসিল অনেক এবং দিন দিন খদ্দেরের সংখ্যা বাড়িতে লাগিল। তখন বেগুনী ফুলুরি ভাজিবার জন্য একজন লোক রাখিয়া দেওয়া হইল। সুভদ্রা

মাঝে মাঝে আসিয়া পাঁচ দশ মিনিট বারান্দায় বসিতে লাগিল আর নিজের হাতে বিক্রি করিতে লাগিল ভাজা জিনিসগুলি। বৈঠক তাই ভাঙিয়া গেল কিন্তু সেজন্য বিক্রী কমিল না। বেগুনী ফুলুরিও কম মুখরোচক জিনিস নয়।

বৈঠক না বসুক, লোচন, সতীশ, বংশী আর নটবর নিয়মিতভাবে আসে। কেউ সকালে, কেউ বিকালে। সুভদ্রা না থাকিলে গল্প করে সাধনের সঙ্গে, সুভদ্রা আসিলে দু'এক পয়সার বেগুনী কেনে আর দু'একটি কথা কয়।

নটবর একদিন তাকে বাবুদের বাড়ি গান গাহিবার বায়না দিয়া গেল। শুনিয়া লোচন বলিল, 'না, না, অমন কম্মোও কোরো না। ওর বাবু বড় খারাপ লোক।'

সতীশ এবং বংশীও সায় দিয়া বলিল, 'যেও না, বিপদ হবে।'

সুভদ্রা বলিল, 'বিপদ হবে? কিসের বিপদ?' তারপর হাসিয়া বলিল, 'বেশ ত, তোমরা তবে দশটা টাকা দাও আমায়, যাব না। তোমাদেরি না হয় গান শুনিয়ে দেব।'

পরদিন সত্যই তারা দশটা করিয়া টাকা নিয়া হাজির। দশটা করিয়া টাকা দেওয়া তাদের পক্ষে এমনিই সহজ নয়, প্রতিদানে কিছু পাওয়া যাইবে কিনা সন্দেহ থাকিলে সেটা আরও কঠিন হইয়া দাঁড়ায়। বুঝিয়া সুভদ্রা খুশী হইল বটে, মন কিন্তু তার ভিজিল না। এসব ফাঁকি সে জানে। সাতদিন একত্র বসবাস করিবার পর সে একটি টাকা বাজে খরচ করিলে এরা প্রত্যেকে তার সঙ্গে রীতিমত ঝগড়া করিবে। তা ছাড়া, এবেলা টাকাটা নিলে ওবেলা এরা একা পাওয়া মাত্র তার হাত ধরিয়া টানিবে। তার চেয়ে নটবরের বাবুর বাড়ি গান গাহিতে যাওয়া অনেক ভাল।

গান কিন্তু সেখানে জমিল না,—সুভদ্রার গান। আসরে ঝালর-বসানো তাকিয়ায় হেলান দিয়া উপস্থিত ছিল শুধু বাবুর কয়েকটি বন্ধু এবং তবলচি ও সেরাঙ্গীর কাছে সহজ অভ্যস্ত ভঙ্গীতে মেরুদণ্ড সিধা করিয়া বসিয়াছিল আরেক জন মানুষ। তার চোখে কাজল আর ছোট নূরটি লালচে রঙে রাঙানো। ধৈর্যের প্রতীকের মত সে স্থির হইয়া বসিয়াছিল, আর বাঁ হাতের আঙুলের সন্তর্পণ স্পর্শ ধীরে ধীরে বুলাইয়া দিতেছিল নূরে। সুভদ্রা প্রথম গানটি আরম্ভ করার পরেই বাবু আর তার বন্ধুদের মুখে মৃদু হাসি ফুটিয়া উঠিল, কিন্তু এ লোকটি চোখের একটি বাড়তি পলকও ফেলিল না। সুভদ্রা তিনটি গান গাহিবার

পর বাবু বলিল, 'এবার তুমি বিশ্রাম কর। ওস্তাদজী, আপনি এবার মেহেরবানি করুন তবে ?'

ওস্তাদ এবার একটু হাসিয়া মাথাটি সামনের দিকে সামান্য নিচু করিল। —'সোজা স্বরের একটা বাংলা গান গাই ?'

'বলেন কি ওস্তাদজী, আপনি বাংলা গান জানেন ?' সিগারেটের ধোঁয়া না ছাড়িয়াই সবিস্ময়ে কথাটা বলিয়া বাবুর এক বন্ধু কাসিতে লাগিল।

সুভদ্রা মৃদুস্বরে বলিল, 'জল খান, দু'ঢোক জল খেলেই সেরে যাবে।'

বন্ধুর কাসি থামিলে ওস্তাদ বলিল, 'জানি কিনা সে ত মালুম হবে শুনলে ?'

ঠুংরীতে হাফেজের বাংলা ভাবার্থ অনুবাদ। শুনিতে শুনিতে সুভদ্রার মনে হয়, ওস্তাদের অমন সুন্দর ফুলকাটা পাঞ্জাবির তিন চার জায়গা ছেঁড়া কেন ? আরও শুনিতে শুনিতে মনে হয় যে পাতলা পাঞ্জাবি, ছুঁচ-সুতায় সে কি ছেঁড়াগুলি রিফু করিয়া দিতে পারিবে ? গান শেষ হইলে তার মনে পড়ে, রিফুর কাজ সে জানে না, যাত্রার দলে যে ছেলেটি তার রাধা সাজিত সেই যেন কোথা হইতে খুব ভাল রিফুর কাজ শিখিয়াছিল।

ওস্তাদ সুভদ্রাকে জিজ্ঞাসা করিল, 'কেমন লাগল ?'

সুভদ্রা নির্বিবাদে বলিল, 'আরেকটা শুনি ?'

ওস্তাদের কয়েকটি গান শুনিয়া সকাল সকাল সুভদ্রা বাড়ি ফিরিয়া গেল। বেশ বুঝা গেল, তার গানও বাবুর পছন্দ হয় নাই, তাকেও পছন্দ হয় নাই।

পরদিন ঘোড়ার গাড়ি চাপিয়া ওস্তাদ সুভদ্রার বাড়ি আসিল। জিজ্ঞাসা করিল, 'সুভদ্রা গান শিখিবে কি, গান ? ভাল ভাল গান ?' সেই ফুলকাটা জামা পায়জামা পরিয়াই ওস্তাদ আজ আসিয়াছে, মাথায় শুধু আজ একটি জরি বসানো টুপি, আর চোখের কাজল আরও একটু স্পষ্ট। সুর্মা নয়, কাজল। কালিদাসীর ছেলের কাজল-পরা চোখের মতই আশ্চর্যরকম কচি কচি দেখাইতেছে ওস্তাদের চোখ।

দেখিয়াই সাধন একটা কুৎসিত প্রশ্ন করিল, 'নটবরের বাবু বুঝি গান শিখাইতে পাঠাইয়াছে ওস্তাদকে ?'

ওস্তাদ বলিল, 'তোবা তোবা, নটবরের বাবু আমার কে ?'

জগতে এমন বড়লোক কে আছে যে ওস্তাদকে মনিবের মত হুকুম দিবে ? বাবু ত শুধু তার সাকরেদ, ওস্তাদের বাড়িতে যে দু'চারজন গান শিখিতে আসে

তাদের সঙ্গে বাবুর তফাত এই যে, বাবু গাড়ি পাঠায় আর ওস্তাদ তার বাড়ি গিয়া গান শিখায়।

তারপর প্রতি সন্ধ্যায় সুভদ্রা ওস্তাদের কাছে গান শিখিতে লাগিল। কালিদাসী মুখ ভার করিয়া বলিল, 'মোছলমানের কাছে গান শিখছ বঊম দিদি?'

সুভদ্রা বলিল, 'মোছলমান-ই ভাল।'

কিন্তু গান শিখিতে ভাল লাগে না সুভদ্রার, কিছুই ভাল লাগে না। দোকানে নিয়মিত কেনা-বেচা চলিতেছে, ভিতরে নিয়মিত ঘরকন্না চলিয়াছে, নিজেই সে নিজের চারিদিকে সৃষ্টি করিতেছে নিয়মের ফাঁকি আর বন্ধন। যা-খুশী সে করিতে পারে, কিন্তু যা-খুশী করিবে কি? কি আছে যা-খুশী করার? পথে দাঁড়াইয়া উলঙ্গ হইয়া নাচিবে? শহরের পাশে যে নদী আছে তার স্রোতে ভাসিয়া যাইবে? না, বিষ খাইবে?

সাধনকে সে মিনতি করিয়া বলে, 'এখান থেকে পালাই চলো, এ্যাঁ? তেমনিভাবে ঘুরে ঘুরে বেড়াব দু'জনে, কি মজাটাই হবে!'

সাধন বলে, 'দূর পাগলি! ঘুরে বেড়ানোতে আবার মজা কি?'

তা ঠিক, ঘুরিয়া বেড়ানোতে হয়ত মজা লাগিবে না। সুভদ্রা এখন টের পাইয়াছে, সাধন বৈরাগীর সঙ্গে ক'দিন পথে পথে কাটানোর আসল মজাটা কি ছিল। কি সুখ ছিল সে ঘুরিয়া বেড়ানোর? কিছুই না। শুধু একটা উত্তেজনা ছিল, প্রতি মুহূর্তের উত্তেজনা, পর মুহূর্তে বুঝি কিছু ঘটিবে, জীবনে কিছু আবির্ভাব ঘটিবে কোন কিছুর। ক্ষণে ক্ষণে তখন সব বদলাইয়া যাইত, মাটির পথের পর আসিত সুরকির পথ, হাট বাজারের পরে আসিত মাঠ, তাড়িখানার পরে আসিত দেবমন্দির, এক জনের কুৎসিত মন্তব্যের পর আসিত আরেকজনের সভক্তি প্রণাম, মুচির ঘরের আশ্রয়ের পর আসিত বড়লোকের বাগানবাড়ির আশ্রয়। এই পরিবর্তন যেন প্রমাণের মতই আশা জাগাইয়া রাখিত, এ সমস্তের অতিরিক্ত আরও একটা নতুনত্ব নিশ্চয় আসিবে। সুভদ্রা কৃতার্থ হইয়া যাইবে, আর তার মন ছটফট করিবে না, উল্লাসে গদগদ হইয়া সেই নতুনত্বকে বরণ করিয়া বলিবে, 'এতদিন আসোনি যে বড়, আচ্ছা খামখেয়ালী নিষ্ঠুর মানুষ ত তুমি?'

মানুষ? সে নতুনত্ব কি তবে মানুষ সুভদ্রার? ফাঁপরে পড়িয়া সুভদ্রা এদিক ওদিক তাকায়। কত মানুষ চলিতেছে পথ দিয়া, সকলেই এক রকম, দেহকাণ্ডের

সঙ্গে দুটি হাত আর পা আঁটা, এবং উপরে একটা মাথা বসানো। কোন নতুনত্ব ত নাই এদের মধ্যে! এদের মধ্যে যাকেই সে বরণ করুক, মুখে হাত চাপা দিয়া সে শুধু তাকে জড়াইয়া ধরিবে। সে যা চায়, কি চায় তা অবশ্য সে জানে না, কিন্তু যা সে চায় মানুষের মূর্তি ধরিয়া আসিলে ত তার চলিবে না।

সুভদ্রার মনে তাই সন্দেহ জাগিয়াছে, সাধনের সঙ্গে ঘুরিয়া বেড়াইতে আর ভাল লাগিবে কিনা। জ্ঞান বাড়িয়াছে, প্রত্যাশার উত্তেজনাটুকু পর্যন্ত হয়ত এবার জুটিবে না।

কিন্তু ওস্তাদের সঙ্গে যদি নিরুদ্দেশ যাত্রা করে? কাছাকাছি গ্রাম আর শহরে ঘুরিয়া বেড়ানোর বদলে যদি আজ যায় দিল্লীতে আর কাল যায় বোম্বায়ে এবং তার পরদিন যায় দিল্লী বোম্বায়ের মত সাত সমুদ্র তের নদীর পারে আরও যে সব জায়গা আছে, যার নামও সে কোনদিন শোনে নাই?

ক'দিন পরে তাই গেল সুভদ্রা, তবে দিল্লী বা বোম্বায়ে নয়, সাত সমুদ্র তের নদীর পারের অন্য কোন জায়গাতেও নয়। সুভদ্রার অত পয়সা কই? ওস্তাদ গরীব মানুষ। তাই ক'দিন এখানে ওখানে ভাসিয়া বেড়াইয়া দু'জনে কলকাতা শহরে আসিয়া ঠেকিয়া গেল। তবে ওস্তাদ ভরসা দিয়া বলিল, তাতে কি আসে যায়? যেখানে খুশী যাওয়ার সাধ মনে থাক, যাওয়ার ব্যবস্থা করিতে যেখানে খুশী যতদিন খুশী দিন কাটিয়া যাক, একদিন ত তারা যাইবেই যাইবে। তার বেশী আর কি চাই মানুষের? যাওয়ার চেয়ে যাওয়ার আয়োজন ত তুচ্ছ নয়, মনটাই ত যায় মানুষের মাটির পৃথিবীর বুকে এখান হইতে ওখানে! নাই যদি যাওয়া হয় এখানকার ঘরবাড়ি যানবাহন লোকজন দেখার বদলে ওখানকার ঘরবাড়ি যানবাহন দেখিতে, এখানকার বালি পাথর সবুজ ঘাসে হাঁটার বদলে ওখানকার বালি পাথর সবুজ ঘাসে হাঁটিতে, একটা যাত্রা ত একদিন তাদের শুরু করিতেই হইবে, অজানা অচেনা দেশের উদ্দেশে সব যাত্রার চরম একটা যাত্রা?

তা বটে। সজোরে ওস্তাদকে জড়াইয়া ধরিয়া সুভদ্রা বলে, 'তবে তাই চলো ওস্তাদ, সেখানেই আমরা যাই। তুমি আমার গলাটা টিপে ধরো, আমি তোমার গলাটা টিপে ধরি।'

ওস্তাদ কি বলিতে যায়, বাঁ হাতটি আলগা করিয়া সুভদ্রা তার মুখে চাপা দেয়। দেহের ভারে মুসাফিরখানার ছেঁড়া নোংরা মাদুরের বিছানায় তাকে চিত করিয়া ফেলিয়া দেয় এবং তার পাশে লম্বা হইয়া শুইয়া পড়ে।

নরম কোমল হাতটি মুখ হইতে সরাইয়া স্ফূর্তির সঙ্গে ওস্তাদ বলে, 'বহুৎ আচ্ছা, মেয়াজান! কেয়াবাৎ!'

সুভদ্রা আবার তার মুখে হাত চাপা দেয়।

শেষরাত্রে ওস্তাদের ঘুম ভাঙিয়া গেল। তাদের দু'জনের বড় পুঁটুলিটি খুলিয়া সুভদ্রা তার শাড়ি-সেমিজের একটি ছোট পুঁটুলি করিতেছে।

মুখ ফিরাইয়া ওস্তাদকে চাহিয়া থাকিতে দেখিয়া সুভদ্রা বলিল, 'পালাচ্ছি ওস্তাদ। চুপিচুপি পালাচ্ছিলাম, তুমি জাগলে কেন?'

ওস্তাদ বাজে কথা কিছু বলিল না, ব্যস্ত হইল না। ধীরে ধীরে উঠিয়া বসিল।

'সেখানে ফিরে যাবে?'

'দূর! ফিরে গেলে সাধন বৈরাগী রক্ষা রাখবে আমার? যেদিকে দু'চোখ যায় চলে যাব।'

ওস্তাদ উৎসুক হইয়া বলিল, 'বেশ ত, চলো না আমিও সাথে যাই? পিছে পিছে যাব, খুশ হলে কাছে ডাকবে, নয়ত ডাকবে না?'

সুভদ্রা মাথা নাড়িয়া বলিল, 'উঁহু, এবাব একা পালাব ওস্তাদ। পুরুষকে সঙ্গে নেব না। পুরুষ জাতটাই বড় খারাপ।

ওস্তাদ মাথাটা সামনে একটু হেলাইয়া সায় দিল, মুখে কিছু বলিল না। বাঁ হাতে সন্তর্পণে নিজের ছোট লালচে নূবটিকে আদর করিতে লাগিল। একাই যাইতেছে বটে, তবে একা সে থাকিবে না, ওস্তাদ তা জানে। পুরুষমানুষ একা থাকিতে পারে না, ও ত মেয়েমানুষ। একজন কেউ আসিবেই, সুভদ্রা নিজেই যাকে জড়াইয়া ধরিবে, আর ছাড়িবে না। আর সেই একজন যদি কখনো আনমনে জড়াইয়া ধরিতে ভুলিয়া যায়, চোখে সুভদ্রার জল আসিবে, রাগে সে ফোঁসফোঁস করিতে থাকিবে।

সুভদ্রার পুঁটুলি বাঁধা হইলে ওস্তাদ একটি প্রস্তাব করিল। চুপি চুপি যখন পালানো গেল না, বাকী রাতটুকু বসিয়া গল্প করিলে হয় না, ভোরবেলা সুভদ্রা চলিয়া যাইবে? ভোর হইতে বেশী বাকী নাই।

'তুমি জ্বালালে ওস্তাদ।'

সুভদ্রা কাছে আসিয়া বসিল। গল্প তেমন জমিল না। একটিবার তাকে জড়াইয়া ধরার জন্য মনটা ওস্তাদের আকুপাকু করিতেছিল। টের পাইয়া সুভদ্রাও প্রতীক্ষা করিতেছিল, কখন ওস্তাদ একটু ভয়ে ভয়ে তার হাত ধরিয়া মৃদু সলজ্জ

হাসির সঙ্গে চোখে চোখে চাহিয়া নীরবে জড়াইয়া ধরিবার অনুমতি চাহিবে। বাহিরে ভোর হইয়া আসিল, রাস্তার আলো নিবিয়া গেল, ওস্তাদ কিন্তু কিছুই করিল না।

তখন সুভদ্রা নিজেই বলিল, 'একবারটি ভাবের খেলা খেলবে না ওস্তাদ? শেষ বারের মত?'

ওস্তাদ মাথা নাড়িয়া বলিল, 'না'।

বেশ বুঝা যায়, ধৈর্য আব সংযমের তলে চাপা পড়িয়া ভিতরের উত্তেজনা ওস্তাদকে থরথর করিয়া কাঁপাইয়া দিতেছে, দম আটকানো উদ্বেগে নিঃশ্বাস পড়িতেছে ছোট ছোট। ক'দিন কাজল পরা হয় নাই, তবু কাজলের একটু আভাস ওস্তাদের চোখে পাওয়া যায়। আশা, হতাশা, ঈর্ষা, উদারতা, রাগ, দুঃখ, অভিমান, ক্ষমা ও ত্যাগের ভাব মিশিয়া তার মুখে প্রলেপের মত মাখা হইয়া গিয়াছে, আর চোখ দুটি যেন পলকে পলকে বদল করিয়া ওই ভাবগুলি এক একটি বাছিয়া বাছিয়া স্পষ্ট করিয়া তুলিতেছে।

সুভদ্রা চিন্তিত হইয়া বলিল, 'তুমি সত্যি জ্বালালে ওস্তাদ। যাব না নাকি?' একটু ভাবিয়া সে আবার বলিল, 'না পালাই, তোমার সঙ্গেও আমার বনবে না।'

ওস্তাদের চোখের ঔৎসুক্য নিবিয়া গেল, আটকানো নিঃশ্বাস বাহির হইয়া আসিল। বাহিরের আলো আরেকটু স্পষ্ট হইয়াছে। সুভদ্রা চলিয়া গেল, ওস্তাদ আর একটি কথাও বলিল না। শেষ চেষ্টা কাজে লাগিল না, আর কি বলিবার আছে? এখন আপনা হইতে ফাঁদটি খসিয়া গিয়াছে ভাবিয়া খুশী হওয়ার চেষ্টা করা ছাড়া আর কিছুই করিবার নাই। কিন্তু সে চেষ্টা করিতে গিয়া ওস্তাদ দেখিল, ফাঁদ খসিয়া গেলেও ফাঁদে পড়া বেকুব প্রাণীর মতই ছটফট না করা অসম্ভব।

রাঘব মালাকর

[পুরাণে বলে একদা নর-রূপী ভগবান স্নানরতা গোপিনীদের বস্ত্র অপহরণ করে নিয়ে তাদের অন্তর পরীক্ষা করেছিলেন—বহুকাল পরে আবার তিনি…এবার অদৃশ্য থেকে তাঁর প্রতিনিধিদের দিয়ে, সমগ্র বাংলা দেশের নরনারীর বস্ত্র অপহরণ করে নিয়ে, কি পরীক্ষা করে দেখছেন, তা তিনিই জানেন…তবে দুঃশাসনকে জব্দ করে বস্ত্রহীনা হওয়ার নিদারুণ লজ্জা থেকে দ্রৌপদীকে তিনিই রক্ষা করেছিলেন, হে রাঘব মালাকর, জেলে বসে ফাটা কপালে মলম দিতে দিতে অন্ততঃ সেই কথা স্মরণ করে মনকে সান্ত্বনা দিও—আশা করি এই ছোট্ট কাহিনীটি পড়ার পর আপনিও ঠিক এই কথাই বলবেন।…]

রাঘব বাঁচবে কি মরবে ঠিক নেই। লাঠির ঘায়ে মাথাটা তার ফেটে চৌচির হয়ে গেছে।

ফুলবাড়ির চৌমাথা থেকে নামমাত্র পথটা মাঠ জলা বন-বাদাড়ের ভিতর দিয়ে দু'ক্রোশ তফাতে মালদিয়া গিয়েছে। এই দু'ক্রোশের মধ্যে গাঁ বলতে কিছু নেই, এখানে-ওখানে কতগুলি কুঁড়ে জড়ো করা বসতি আছে মাত্র। হাটবারের দিন কিছু লোক চলাচল করে পথ দিয়ে, অন্যদিন সন্ধ্যায় পথটা থাকে প্রায় জনহীন।

নির্জন হোক, পথটা নিরাপদ। গত কয়েক বছরের মধ্যে এ-পথে কোন পথিকের বিপদ ঘটেনি। বছর তিনেক আগে দিনদুপুরে একজনকে পাগলা শেয়ালে কামড়েছিল শোনা যায়। কেষ্টরামের পোড়া মাদুলী আর চুম্বকপাথরের চিকিৎসাতেও নাকি বাঁচেনি। সাপটাপ হয়ত কামড়েছে দু'একজনকে ইতি-মধ্যে, কুকুর হয়ত তেড়ে গেছে ঘেউঘেউ করে, গরু শিং নেড়েছে। কিন্তু বিশেষ কিছু কারো হয়নি, কারণ হলে সেটা মানুষের মনে থাকত। রাহাজানির দু'একটা রোমাঞ্চকর কাহিনী শোনা যায়, কিন্তু কবে যে সে ঘটনাগুলি ঘটেছিল কেউ বলতে পারে না, একেবারে ঘটেছিল কিনা তারও কোন প্রমাণ নেই। এ-পথের আশেপাশের বস্তি-গাঁগুলিতে যাদের বাস, চুরি-ডাকাতি তারা যদি করে, ধারে কাছে কখনো করে না। এ-পথের একলা পথিকের গায়ে হাত দেয়া দূরে থাক, তাকে ভয় দেখাবার ভরসা পর্যন্ত ওদের নেই। ওরকম কিছু ঘটলে

দায়ী হবে ওরাই। পুলিসও প্রমাণ খুঁজবে না, জমিদার কার্তিক চক্রবর্তীও নয় —দু'পক্ষের শাসনে থেঁতো হয়ে যাবে ওরা, পুড়ে ছাই হয়ে যাবে তাদের কুঁড়ে-গুলি, বাতিল হয়ে যাবে আশেপাশে বাস করার অনুমতি।

একবার সদরে টাকা নিয়ে যাচ্ছিল গোমস্তা রাধাচরণ, সঙ্গে ছিল দু'জন পাইক। জন সাতেক লোক তাদের মারধোর করে টাকা কেড়ে নিয়ে যায়। পরে তারা ধরা পড়ে জেলে গিয়েছিল, ফুলবাড়ির পাঁচজন আর মালদিয়ার দু'জন—পরে। দু'দিকের চাপে রাঘবের আর কাছাকাছি আরও তিন চারটে বস্তি গাঁয়ের মানুষেরা থেঁতো হয়ে যাবার পরে।

পথ থেকে হাঁক এলে এরা সাড়া দেয়। ভীরু লোক দাবি করলে সঙ্গে পৌঁছেও দিয়ে আসে এদিকে ফুলবাড়ি বা ওদিকে সড়কের মোড় পর্যন্ত। একলা ভীরু পথিকের ভালোমন্দের দাযিক ওরাই কিনা।

শেষ বেলায ফুলবাড়ি-মালদিয়া নামমাত্র পথ ধরে বোঁচকা মাথায় দু'জন লোক চলেছে মালদিয়ার দিকে। বেশভূষা বোঁচকার আকার, বয়স, আর গায়েব রঙ ছাড়া দু'জনের মধ্যে পার্থক্য বেশী নেই—অথাৎ, লম্বায় চওডায় দু'জনেই প্রায় সমান হবে। গায়ের জোরে কিনা বলা অসম্ভব, জোরের পরীক্ষা কখনো হয়নি। রাঘব মালাকরের কোমরে এক হাত একটি গামছা জড়ানো, জ্যাল-জেলে পুরনো গামছা। গৌতম দাসের পরনে প্রমাণসাইজ ঘরে-কাচা আধ-পুরনো মিলের ধুতি, গায়ে পুরনো ছিটের সার্ট, ঘাডের কাছে একটু ছিঁডেছে। পায়ে ক্যাম্বিসের জুতো। রাঘবের বোঁচকাটা বেশ বড়, গৌতমের বোঁচকা তার সিকির চেয়ে ছোট হবে। রাঘবের আছাঁটা চুলে পাক ধরেছে, গৌতমের ছাঁটা চুলেও তাই, তবে রাঘব পনরো বিশ বছরের বড হবে গৌতমের চেয়ে। রাঘব মিশকালো, গৌতম মেটে।

খানদশেক কুঁড়ের নামহীন গাঁয়ের কাছে এসে একটু হাঁপ ধরে রাঘবের। গতবারের চেয়ে এবারের বোঝাটা বেশী ভারী। দু'চার মিনিটের জন্য বোঝাটা একটু সে নামিয়ে রাখে।

গৌতম বলে, 'আবার নামালি? আজ তোর হয়েছে কি র‍্যা?'

'ডবল বোঝা ঘাড়ে চাপিয়ে বলছ?' আঙুল দিয়ে কপালের ঘাম চেঁচে এনে ঝেড়ে ফেলে রাঘব বলে, 'বাপ্স! কাপড়ের এত ওজন হয় জানতাম না বাপু! এত কাপড় জন্মে দেখিনি দোকান ছাড়া।'

গৌতম চোখ পাকিয়ে তাকিয়ে বলে, 'কাপড়? কাপড় কি রে ব্যাটা? বললাম না বস্তা নিয়ে যাচ্ছি? মথুর সা বস্তা চেয়েছে চাল চালানের জন্যে?'

'গতবার টের পেইছি বাবু, কাপড়।'

'হ্যাঁ, কাপড়! তোকে বলেছে। সদরে খাঁ খাঁ করছে লোকে কাপড়ের জন্যে, বিশ টাকা দিয়ে কাপড় পাচ্ছে না একখানা, আমি নিয়ে চলেছি মালদিয়া! ব্যাটার বুদ্ধি কত!'

রাঘবের হাসিটা বড় খারাপ লাগে গৌতমের।

'সদরেই ত বেচছো বাবু। গুদোম করেছ মালদিয়ায়। এ-পথে মাল আনছ মাসে দু'বার চারবার, পাঁচগড়ের পথে রোজ এদিক ওদিক চালান দিচ্ছ খানিক খানিক। মোরা বলি যে ঠাকুরবাবু পাঁচগড়ের পথে বাসে চেপে মালদিয়া যায় না কেনে, ফুলবাড়ি নেমে মজুরি দিয়ে মাল নিয়ে দু'কোশ হাঁটে? পাঁচগড়ের পথে ছোকরা বাবুরা পাহারা দেয়, তাই ত বিপদ।'

'কে বলেছে তোকে? কার কাছে শুনলি?' সভয় গর্জনে গৌতম জিজ্ঞেস করে।

'কে বলবে বাবু? আন্দাজ করিছি। মুখ্যু বলে কি এমন মুখ্যু মোরা?'

গৌতম চট্ করে একটা বিড়ি ধরায়। একটু ভাবে। রাঘব যে বলল, মোরা আন্দাজ করিছি, তার মানে কি এই যে জানাজানি হয়ে গেছে? মোরা কারা? রাঘব আর তার আত্মীয়বন্ধু ক'জন, না আরও অনেকে?

'তোকে চারটাকা মজুরি দি রঘু।'

'আজ্ঞে বাবু। তোমার দয়া।'

'তাই বুঝি বলে বেড়াচ্ছিস আমার কারবারের ব্যাপার দশজনকে? তোকে বিশ্বেস করলাম, তুই শেষে নিমকহারামি করলি রঘু?'

দশ কুঁড়ের গাঁ যেন জনহীন—কুকুর পর্যন্ত ডাকে না। পথের পাশে জলায় শালুক ফুটেছে অগুনতি—দু'মাস আগে পর্যন্ত এই শালুকের ফসল তুলে প্রাণ বাঁচিয়েছে এই বস্তি-গাঁগুলির স্ত্রী-পুরুষ—অবশ্য সবাই নয়। বুক ফুলিয়ে দাঁড়াতে গিয়ে প্রায় পিছনে হেলে যায় রাঘব, আবেগের ভারে ভারাক্রান্ত গলায় বলে, 'নিমকহারামি ঠাকুরবাবু? বলছ নিমকহারামি? হাটে সেদিন সভা করে স্বদেশীবাবুরা বললে, যে যা জানো থানায় বলবে। বলিছি থানায়? থানায়

মোরা বলতে যাইনি ঠাকুরবাবু ভালোমন্দ। যা বলি তাতেই গুঁতো। বলাবলি করেছি নিজেদের মধ্যে। তোমার তাতে কি?'

'নে নে মোট তোল।' গৌতম বলে খুশী হয়ে, 'চটিস কেন? আটআনা বেশী পাবি আজ, যা।'

রাঘব নিঃশব্দে বোঁচকা মাথায় তুলে নেয়, গৌতমের সাহায্যে। গৌতম তাকে ছেঁদো দর্শনের কথা শোনায়, যে কথা শুনিয়ে শুনিয়ে মেরে রাখা হয়েছে কোটি গৌতমকে বহুকাল ধরে: কি ভাবে ভালো থেকে মরলে লাভ, আর কি ভাবে খারাপ হয়ে বাঁচলে লোকসান। তেজী গলায় গৌতম কথা কয়। শুনে গলা বন্ধ হয়ে আসে রাঘবের। মন তার মাথা কুটে বলে, হায় কি করিছি, হায় কি করিছি!

পরের গাঁয়ে রাঘবের ঘর, ফুলবাড়ি আর মালদিয়ার প্রায় মাঝামাঝি। এটাকে মোটামুটি গাঁ বলা যায়। খানত্রিশেক ঘর আছে, আসল পথের সমান চওড়া পথ আছে গাঁ পর্যন্ত সাত আট রশি, নামও আছে গাঁয়ের—পত্তু। এইটুকু এসে রাঘব বোঁচকা নামিয়ে রাখে। আঙুল দিয়ে শুধু কপালের ঘাম ঝেড়ে ফেলে খ্যান্ত হয় না, বোঁচকার ওপর চেপে ব'সে বেশ আনন্দ অন্তরঙ্গতার সুরে বলে, 'একটা বিড়ি দেন গো ঠাকুররাবু!'

সাত আট রশি দূরে খানত্রিশেক ঘরের নামওয়ালা বস্তি-গাঁ, এটাও যেন খানিক আগের দশ-কুঁড়ে গাঁ-টার মতো নিঃশব্দ, জনহীন, মৃত। উলঙ্গ ছেলেমেয়ে পর্যন্ত ছুটে আসে না পয়সা ভিক্ষা করতে, পথ দিয়ে পথিক কেউ যাচ্ছে কি যাচ্ছে না তাতে যেন কিছু এসে যায় না তাদের। পত্তু গাঁয়ের দক্ষিণে ঘন জঙ্গল, নিচু জমিতে বছরে ছ'মাস বর্ষার জল জমে থাকলে শোভাহীন বর্ণহীন বীভৎস জলজ জঙ্গল জন্মে। ঝিল্লীর ডাকে সন্ধ্যার স্তব্ধতা, অন্ধকার রাত্রির ইঙ্গিত, এখনো সন্ধ্যা নামেনি। বাইরে সন্ধ্যা না নামলেও ঘরগুলির ভিতরে যে গাঢ় অন্ধকার ঘনিয়েছে রাঘব তা জানে! গৌতমও জানে! এ অঞ্চলেরই মানুষ ত সে। রাঘবকে ধমক দিতে গিয়ে হঠাৎ শিশুর কান্না কানে আসায় গৌতম চমকে উঠে থেমে যায়। কে যেন চাপা দিয়েছে শিশুটির মুখে। গা ছমছম করে গৌতমের। এই জলাজঙ্গল, কুঁড়ে পথ আর এই গামছা-পরা মানুষ এসব পুরনো সবকিছু যেন নতুন নতুন মনে হয়, গাঁয়ের শব্দহীন স্তব্ধতায়, মানুষের সাদৃশ্যে, শিশুর কান্নার মুখ-চাপায়, বোঁচকায় বসবার ভঙ্গীতে।

রাঘবকে সে বিড়ি দেয়। নিজে বিড়ি ধরাবার আগেই রাঘবকে দেয়। বলে, 'টেনে নিয়ে চটপট চল বাবা, পা চালিয়ে বাকী পথটা মেরে দি। খিদেয় পেট চোঁচোঁ কচ্ছে, মাইরি বলছি তোকে রঘু, কালীর দিব্যি। চ' যাই চটপট। পৌছে দিলে তুইও খালাস। ওখানে খাবি তুই আজ। জানিস, আমার ওখানে খাবি। খেয়েদেয়ে ফিরিস, নয় শুয়ে থাকবি।'

ঘাড় হেঁট করে রাঘব বসে থাকে বোঁচকায়, করুণ চোখের পলকে তাকিয়েই চোখ নামায়। ধরা-গলায় বলে, 'বাবুঠাকুর, এ কাপড় মোদের চাই।'

'কাপড় চাই? আচ্ছা, আচ্ছা দেবখন তোকে একখানা—' গৌতম ঢোঁক গেলে, 'একজোড়া কাপড়। নে দিকি নি, চল দিকি নি এবার। ওঠ।'

রাঘব উঠে দাঁড়িয়ে হুমড়ি খেয়ে পড়ে গৌতমের পায়ে, দু'হাতে দু'পা চেপে ধরে বলে, 'আজ চলাচলি নাই বাবুঠাকুর। কাপড়গুলো মোদের দিয়ে তুমি যাও গে। দানছত্তর করে যাও বাবুঠাকুর কাপড়গুলো। মোদের ঘরে মেয়ে-বৌ ন্যাংটো হয়ে আছে গো।'

গৌতমের ভয় করে। কিন্তু এদের সম্বন্ধে তার ভয় খুব অল্প, তাই মন তার ভয়ের সীমা পেরিয়ে যায়। ঝাঁকড়া চুল ধরে রাঘবকে টেনে তুলে গর্জন করে সে বলে, 'হারামজাদা! গাঁজাখোর! বজ্জাত! ওঠ বলছি! মোট তোল! নন্দবাবুকে বলে তোকে জেল খাটাব ছ'মাস। ভৈরববাবুকে বলে তোকে চালা কেটে তুলে দেব দেশ থেকে। মোট তোল, পা চালিয়ে চল।'

'মেয়েগুলো ন্যাংটো বাবুঠাকুর। মা-বুন ন্যাংটো, মেয়ে-বৌ ন্যাংটো—'

'ন্যাংটো ত ধরে ধরে…'

বলেই গৌতম অনুতাপ করে। এমন কুৎসিত কথা বলা উচিত হয়নি, রাঘবের মা-বোন মেয়ে-বৌকে এমন কদর্য গাল দেওয়া। দুটো মন-রাখা কি কি কথা ব'লে কাটিয়ে দেওয়া যায় এই ভীষণ কথাটা, গৌতম তাই মনে মনে স্থির করার চেষ্টা করে। বেশী নরম হলে ব্যাটা পেয়ে বসবে। বেশ লাগসই, জুতসই, ওজনসই কথা বলা চাই।

'কাপড় তবে রইলো বাবুঠাকুর।'

বলে রাঘব হাঁক দেয় গলা চড়িয়ে। মৃত পত্তুগাঁ যেন জীবন্ত প্রাণ পেয়ে কলরব করে ওঠে, কিলবিল করে বেরিয়ে আসে উলঙ্গপ্রায় স্ত্রী-পুরুষ। পত্তুতে এত লোক থাকে না, অন্য সব বস্তি-গাঁয়ের লোকেরাও আজ ওখানে এসে জড়ো

হয়েছিল। গৌতম প্রথমে হতভম্ব হয়ে যায়, তারপর উঠে দাঁড়িয়েই ছুটে পালাবার উপক্রম করে। রাঘব লাফিয়ে গিয়ে তার হাত ধরে।

'আর হয় না বাবুঠাকুর। বললাম দান করে দিয়ে যাও কাপড়গুনো, তা ত শুনলে না।'

'নে না কাপড়গুনো বাবা। সব কাপড় নে। আমায় ছেড়ে দে।'

'আর তা হয় না বাবুঠাকুর। দান দিয়ে যেতে সে ছিল ভিন্ন কথা। কাপড় লুট হল এখন, তোমায় ছেড়ে দিয়ে মরব মোবা ?'

উত্তেজিত মানুষগুলিকে রাঘব সংযত রাখে। তার ধমকে অন্য সকলের চেঁচামেচি বন্ধ হয়, কিন্তু ভয়াতুর কয়েকজনের আর্ত ও তীব্র প্রতিবাদ সে থামাতে পারে না। বুড়ো নরহরি কপাল চাপড়ে চেঁচায়, 'মারবি তুই, সবাইকে মারবি তুই রাঘব! পুলিস আসবে সবাইকে বেঁধে মারবে, ঘরে আগুন ধরিয়ে দেবে। ওরে বাবা রে, সব্বোনাশ করলে রাঘব।'

তুটি স্ত্রীলেক চেঁচিয়ে কান্না ধরে।

তিনজন মাঝবয়সী লোক চোখ পাকিয়ে বলে, 'মোরা এর-মধ্যি নাই, রাঘব।'

রাঘব বলে, 'নাই ত দেঁড়িয়ে রইছ কেনে? কাপডের ভাগ নিও না, যাও গা।'

কাপডের বোঁচকা আর গৌতমকে গাঁযের মধ্যে টেনে নিয়ে যাওয়া হয়। রাঘবের ঘরের দাওয়ায় বোঁচকা নামিয়ে বডদের মজলিস বসে, এবার কি করা উচিত আলোচনার জন্য। কি করা হবে না হবে সব ঠিক হযে আছে ক'দিন থেকে, গৌতমকে পুঁতে ফেলার জন্য জঙ্গলে গভীর গর্তও কেটে রাখা হয়েছে একটা, তবু একটু আলোচনা না করে তারা পারে না। কাপডগুলি তাড়াতাড়ি বিলি করে ফেলা দরকার, বাইবের যারা তারা ফিরে যাবে যে যার গাঁয়ে, এখানকার যারা তারা যাবে যার যার ঘরে। এত লোক বেশীক্ষণ জমায়েত হয়ে থাকা উচিত নয়, কে যাবে পথ দিয়ে, কার কি চোখে পডবে কে বলতে পারে। রাঘব থেকে থেকে গর্জন করে ওঠে, ধারালো দা উঁচু করে একদম চুপ হয়ে যেতে বলে সবাইকে—গোলমাল শুনে কেউ যদি ব্যাপার দেখতে আসে পথ থেকে? তাকেও ত পুঁততে হবে বাবুঠাকুরের সঙ্গে। একটা লোক নিখোঁজ হওয়া এক কথা। বেশী লোক নিখোঁজ হলে হাঙ্গামা হবে না?

'কথা যে কইবে সে কাপড় পাবে না।'

রাঘবের গর্জনের চেয়ে বলরামের এই ঘোষণায় কাজ হয় বেশী। সবাই চুপ হয়ে যায় একেবারে, যারা প্রতিবাদী ছিল তারা পর্যন্ত। বুড়ী পচার মা শুধু বিনিয়ে বিনিয়ে কাঁদতে থাকে।

গৌতমের কান্না, বিলাপ, অনুনয় বিনয়ের অন্ত ছিল না, রাঘব একবার দা'টা উঁচিয়ে ধরার পর সেও থেমে গিয়েছিল। এবার সে বিনিয়ে বিনিয়ে বলে, 'আমায় ছেড়ে দে বাবা তোরা। আমায় মেরে কি হবে তোদের? কাপড় পেয়েছিস, বামুনের ছেলেকে মেরে কেন মহাপাপ করবি? ছেড়ে দে আমায়।'

বলরাম বলে, 'কি করে ছাড়ি? ছাড়া পেলে তুমি গিয়ে ত পুলিস আনবে বাবুঠাকুর।'

গৌতম পৈতে ছুঁয়ে প্রতিজ্ঞা করে, বাপ-মার নামে আর দেব-দেবীর নামে দিব্যি গালে, পুলিসকে সে কিছু বলবে না।

'এ কথা কি মনে থাকবে বাবুঠাকুর?'

তখন হতাশ হয়ে প্রাণ বাঁচাবার শেষ চেষ্টা ক'রে গৌতম বলে, 'শোন বলি, পুলিসকে আমি বলতে পারি না। সাধ থাকলেও পারি না।'

'পার না?'

'না। বললে আমারি জেল হবে। এ কাপড় চোরাবাজারের মাল, পুলিস যখন শুধোবে কাপড় পেলাম কোত্থেকে, কি জবাব দেব বল? সত্যি বললে যার কাছ থেকে এনেছি তাকে ধরবে, আমাকে ধরবে, কারবার ত ফাঁক হয়ে যাবেই, জেল হয়ে যাবে আমাদের। চোরা মাল না হলে কি এ-পথে মাল নিয়ে আসি, তোরাই বুঝে ত্যাখ। পুলিস কেন, তোরা কাপড় লুটে নিয়েছিস, কারো কাছে বলবার উপায় আছে আমার?'

রাঘব বলে, 'তা বটে। এটা ত খেয়াল করিনি মোরা।' সকলে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে এতক্ষণে। বাবুঠাকুরকে চিরতরে নিশ্চিহ্ন না করে ফেলে তাদের উপায় ছিল না, কিন্তু জীবন্ত একটা মানুষকে এভাবে মারতে কি সায় দেয় মানুষের মন! বাবুঠাকুর নিজেই যখন চোর, তার চোরাই মাল কেড়ে নিলেও কি করতে পারবে বাবুঠাকুর? ওকে ছেড়ে দিলে তাদের কোন ভয় নেই।

বাঘব বলে, 'তবে তুমি যাও বাবুঠাকুর। আপরাধ নিও না।'

উঠে দাঁড়াতে গিয়ে গৌতম পড়ে যায়। কথা বলতে গিয়ে গলার আওয়াজ

বার হয় না। কাঠের মতো শুকনো গলায় ক'বার ঢোঁক গিলবার চেষ্টা করে সে কোনমতে বলে, 'জল। জল দে একটু।'

'মোদের ছোঁয়া জল যে বাবুঠাকুর।'

গৌতম মাথা হেলিয়ে সায় দিয়ে বলে, 'দে।'

জল খেয়েই সে পালায়।

পরদিন পুলিস আসে দল বেঁধে, বিকেলের দিকে। দলিলপত্র তৈরী করে আটঘাট বেঁধে সব সাজিয়ে গুছিয়ে নিতে এক বেলা সময় লাগে, নইলে সকালেই পুলিস আসত। নাথগঞ্জের গগন সা'র প্রকাশ্যে কাপড়ের দোকানও একটা আছে।

তিনদিন আগের তারিখে মালদিয়া গাঁয়ের জন্য কিছু কাপড় বরাদ্দ করিয়ে নিয়ে, গৌতম মুখোপাধ্যায়কে এজেন্ট নিযুক্ত করে, যথাশাস্ত্র খাতাপত্র রসিদ ইত্যাদি ঠিক করে ফেলায় পত্তু গাঁয়ে লুট-করা কাপড়গুলির চোরাই মালত্বের দোষ কেটে যায়।

পর্ত্তু গাঁয়ে গিয়ে পুলিস ছাখে ধড়পাকড় ইত্যাদির চেয়েও ঢের বেশী গুরুতর ও সঙ্গত অনেকটা কারণ উপস্থিত হয়েছে। লুট-করা কাপড়ের ভাগ বাঁটোয়ারা নিয়ে জোরালো একটা দাঙ্গা হয়ে গেছে গত রাত্রে। খুন হয়েছে দু'জন, আহত হয়েছে অনেকে। রাঘবের মাথা ফেটে চৌচির হয়ে গেছে।

রাঘব বাঁচবে কি মরবে ঠিক নেই।

প্রাক্-শারদীয় কাহিনী

জবর খবর রটে যায় যে নব'র মা গলায় দড়ি দিয়ে মরেছে।

গলায় দড়ি দিয়েই মরেছে কিনা সেটা অবশ্য সঠিক জানে না কেউ—ছেঁড়া শাড়ির আঁচল দিয়ে, গামছা পাকিয়ে নিয়ে, পুরনো কাপড়ের জমানো পাড় দিয়ে কিংবা অন্যভাবে বিষ-টিষ খেয়েও সে আত্মহত্যা করে থাকতে পারে।

তাই নিয়ে কেউ বিশেষ মাথা ঘামায় না। অনাথের এখানে গলায় দড়ি না দিয়ে বোনের বিয়েতে বাপের বাড়ি গিয়ে নব'র মা আত্মহত্যা করেছে শুনে সকলে একটু দিশেহারা হয়ে যায়, একটু আতঙ্কের ভাব জাগে। এমন দুরবস্থা হয়েছিল অনাথের এখানে, রোগে-শোকে অভাবে-অনটনে মাথা বিগড়ে গিয়ে চিরকালের গোবেচারী ভালমানুষ অনাথ মাঝে মাঝে কারণে-অকারণে মারধোর পর্যন্ত শুরু করেছিল—এখানে গলায় দড়ি না দিয়ে বাপের বাড়িতে বোনের বিয়ে: ঃ সবে কয়েকটা দিন জিরোতে গিয়ে নব'র মা গলায় দড়ি দিয়ে বসল!

অনাথের হয়েছিল জ্বর, শালীর বিয়েতে নিজের যাওয়ার সাধ্য ছিল না। নব'র মাকেও সে যেতে দিতে চায়নি। জ্বরের ঘোরে অশ্রাব্য ভাষায় গালাগালি করেছিল—শুধু নব'র মাকে নয়, তার যে ভাই তাকে নিতে এসেছিল তাকেও। এই অবস্থায় দীনহীনার মত ভায়ের সাথে বোনের বিয়ের উৎসবে গিয়ে লজ্জা দুঃখ অভিমান সইতে পারেনি বলে কি?

অনাথ এখনও জ্বরে শয্যাগত। থুড়-থুড়ে বুড়ী পিসী ছাড়া তার সেবা করারও কেউ নেই। জ্বরেই হয়ত অনাথও সাবাড় হয়ে যাবে কয়েক দিনের মধ্যে। সকলে তাই পরামর্শ করে খবরটা চেপে যায়। শয্যাগত মরণাপন্ন মানুষটাকে খবরটা জানিয়ে আর লাভ কি হবে!

কিন্তু কি বিষম রকম ব্যাপার! মরা এমন সহজ আর বাঁচা এমন প্রাণান্তকর হলে ত জগৎ-সংসারে বাঁচার মানে একেবারে উল্টে দিতে হয়—বাঁচার চেয়ে মরাই ভাল এই নীতি মানতে হয়!

তাই, দু'দিন বাদেই প্রথম ভাদ্রের শ্বাসরোধকারী গুমোটের দুপুরে তিন

মাসের মেয়েটাকে বুকে নিয়ে এবং নব'র হাত ধরে নব'র মাকে একা গাঁয়ে ফিরতে দেখে সারা গাঁয়ে যেন শিহরণ বয়ে যায়।

: মাগো মা নব'র মা, গলায় দড়ি তবে দিস্‌নি তুই!

: কি বলছ পাগলীর মত, গলায় দড়ি দিতে যাবো কেন গা?

: একলাটি ফিরে এলি?

: এসবো নি? জ্বরে মানুষটাকে কাতর দেখে গেছি, ভাইরা কেউ দিতে এসবে নি, দু'চারদিন না গেলে কারু সময় হবে নি কো। নিজেই এলাম। মানুষটা বেঁচেবর্তে' আছে ত সত্যি?

পয়সা-কড়ি কিছু বোধ হয় বাগিয়ে-টাগিয়ে এসেছে নব'র মা বাপের বাড়ি বোনের বিয়েতে নিয়মরক্ষা করতে গিয়ে—দুপুরে গাঁয়ে ফিরে বিকেলেই সে শঙ্কর ডাক্তারকে ঘরে ডেকে পাঠায়।

নগদ আগাম একটাকা দক্ষিণা দিয়ে!

দেড়টাকা দিয়ে স্বচ্ছ শিশিতে ছ'দাগ লালিম কুইনিন মিকশ্চারও আনায়।

শঙ্কর ছিল গাঁয়ের সেরা লম্পট আর বিবাগী বদ ছেলে। তার পিছনে অবশ্য ছিল বয়স্ক একজন বজ্জাত। তার একটা বজ্জাতিতে জড়িয়ে পড়ে শঙ্কর দু'মাস জেলে গিয়েছিল। জেলে কয়েকটা অসুখে ভুগে মোট-মাট কয়েক মাস হাসপাতালে থেকে রোগ ব্যারাম চিকিৎসা সম্পর্কে তার জ্ঞান জন্মেছিল অথবা বাড়িতে দু'একটা ডাক্তারি বই আর পঞ্জিকার বিজ্ঞাপন পড়ে বিদ্যালাভ করে সে বোকা গরিব নিরুপায় মানুষদের চিকিৎসা করার পেশা নিয়েছিল কে জানে!

ক'দাগ ওষুধ অনাথের পেটে গিয়েছিল কেউ বলতে পারবে না।

নদেরচাঁদের বৌ হয়ত বললেও বলতে পারত—নব'র মা নগদ পয়সা দিয়ে ডাক্তার আনিয়েছে, ওষুধ আনিয়েছে, খবর শুনে সে একটু বেশী রাত্রে ধার চেয়ে, ভিক্ষা চেয়ে, কয়েক আনা পয়সা আদায়ের চেষ্টা করতে গিয়েছিল। কথার ছলে দরদ দেখাতে সে কি আর জিজ্ঞাসা করেনি যে ডাক্তার কি বলেছে, অনাথ ক'দাগ ওষুধ খেয়েছে এবং ইতিমধ্যেই ওষুধে কাজ হবার কি লক্ষণ দেখা গেছে?

কিন্তু ঘরে আর ফিরতে পারল কই নদেরচাঁদের বৌ!

পাগলা নদীর কাঁচা বাঁধ-ভাঙা মানুষ-সমান উঁচু ঢল প্রচণ্ড গর্জনে ছুটে এসে খড়কুটোর মতই তাকে কোথায় ভাসিয়ে নিয়ে গেল কেউ জানে না!

নদেরচাঁদের বৌ নাকি ছুটতে ছুটতে হঠাৎ থমকে দাঁড়িয়েছিল, মুখোমুখি দাঁড়িয়ে কয়েক মুহূর্তের মধ্যে কয়েকবার কপালে হাত ঠেকিয়ে ঢলকে প্রণাম করেছিল—পাকা বাড়ির ছাতে দাঁড়িয়ে শম্ভু নিজে দেখেছিল,—গাঁয়ের পাগলাটে স্বভাব-কবি ষাট পেরোনো শম্ভু।

কী তার বর্ণনা সেই দৃশ্যের !—বন্যার আদত ঝঞ্চাট মিটে যাওয়ার পর জেরটা চলতে থাকার সময় শঙ্করবাবুর পুজা-মণ্ডপে পুজার উৎসবে আনন্দ করতে সমাগত মানুষগুলির গায়ে কয়েকবার কাঁটা দিয়েছিল শুনতে শুনতে।

হয়ত নদেরচাঁদের বৌ কয়েক মুহূর্তের অবসরে যুক্ত কর কপালে ঠেকিয়ে ঠেকিয়ে যতবার ঢলকে প্রণাম জানাতে পেরেছিল, ঠিক ততবারই গায়ে কাঁটা দিয়েছিল সকলের।

মেঘলা আকাশ—ছাড়া ছাড়া, ভাঙা ভাঙা মেঘ। কয়েক মুহূর্ত আগে চতুর্দশীর চাঁদ একখণ্ড মেঘের আড়াল থেকে মুক্তি পেয়ে ফাঁকা আকাশের খণ্ডটায় এসেছিল। গর্জন করে এগিয়ে আসছে বাঁধ-ভাঙা জলের তোড়, সেই ফেনিল ভয়ংকর গতিশীল-তায় পড়েছে প্রাক্-পূর্ণিমার চাঁদের আলো—সুন্দরতম যেন উন্মাদ হয়ে ছুটে চলেছে। শম্ভুরও নাকি সাধ হয়েছিল প্রণাম করার।

এ কাঁখে নাতি ও কাঁখে নাতনীকে নিয়ে ভাঙা সিঁড়ি বেয়ে সে ছাতে পালিয়েছিল, দু'হাত আটক ছিল ওই দুটো বাচ্চার ভয় কমাতে দু'জনকে বুকে চেপে ধরে লেপ্টে রাখার জন্য।

কিন্তু জ্যোৎস্নায় উদ্ভাসিত মহাসুন্দরের রূপ-ধরা সেই ফেনাময় সর্বনাশকে জগৎ-জীবন ফাটিয়ে দেওয়া আওয়াজ তুলে এগিয়ে আসতে দেখে তারও সত্যি নাকি কামনা জেগেছিল, বাচ্চা দু'টোকে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে দুটি হাত মুক্ত করে নিয়ে অন্ততঃ একবার প্রণাম জানাবে।

অনাথের মাটির ঘর। প্রথম তোড়েই হেলে পড়েছে। তিন পুরুষের আম-কাঠের চৌকিতে শায়িত জ্বরে অজ্ঞান অনাথকে বুকে তুলে নিয়ে চৌকিটাতেই উঠে দাঁড়িয়ে সামলাতে হয়েছে বাঁধ-ভাঙা ঢল-বন্যার প্রথম তোড়।

নব আর বাচ্চা মেয়েটাকে বুকে নিয়ে পিসীও দাঁড়িয়েছে চৌকিতে। ভাগ্যে খড়ো-ঘরের মাটির ভিটেটা অনেক উঁচু করে গাঁথা হয়েছিল—ক'পুরুষ আগে কে জানে !

নইলে আজ রক্ষা থাকত ?

খুঁটি জীর্ণ হয়ে গেছে। হেলে-পড়া চালাটা ঢলে পড়বেই। উঁচু করে গাঁথা মাটির ভিত, তার উপরে তিন পুরুষ আগেকার শক্ত উঁচু চৌকি। সেই চৌকির ওপরে জ্বরে অজ্ঞান স্বামীকে বুকে জাপ্‌টে ধরে ঘন অন্ধকারে এক হাঁটু জলস্রোতে দাঁড়িয়ে নব'র মা জিজ্ঞাসা করে, কি করা যায় বলত পিসী ?

পিসী বলে, কি আর করা যাবে ? এখনকার মত বাঁচার চেষ্টা করি আয়—তারপর দেখা যাবে। জল চাদ্দিকে ছড়িয়ে গেলে ভোর তক্‌ ভিটের কাছে নেমে যাবে সন্দ' করি। সেবারও এমনি হয়েছিল।

নব'র মা বলে, ভোর তক্‌ তুই আমি এমনিভাবে দেঁড়িয়ে রইব ? এর মধ্যে মানুষটার ভারে হাত-কাঁধ যে টনটন করছে পিসী !

পিসী অভয় দিয়ে বলে, না না, ভোর তক্‌ রইতে হবে কেন ? মোর হাত-কাঁধ টনটন করছে না ? বাঁধ ভেঙে জল এয়েছে, ছড়িয়ে যাচ্ছে। হাঁটুর ওপরে ছিল, হাঁটুর নিচে নেমেছে দেখছিস না ? আস্তে আস্তে চৌকির তলে নেমে যাবে।

নব কেঁদে উঠলে পিসী ধমক দিয়ে বলে, কাঁদলে জলে ফেলে দেব—চুপ্‌ কর।

তারপর নব'র মাকে বলে, জল নেমে গেলেও চৌকির উপরটা কাদায় ভর্তি হয়ে থাকবে। চৌকিটা না ধুইয়ে কিছু একটা না পেতে মানুষটাকে ত শোয়াতে পারবি নে।

চালাটা কাত হয়ে উল্টে পড়ে যায়।

চতুর্দশীর চাঁদের আলো খানিকক্ষণ আলোকিত করে রাখে তাদের প্লাবিত ঘর। তারপর বর্ষণ-মুখর মেঘ এসে চাঁদ ঢেকে তাদের ভিজিয়ে দিতে থাকে।

বুকে জাপ্‌টানো জ্বরে অজ্ঞান অনাথের দেহটা জলে ভিজে দুমড়িয়ে মুচড়িয়ে উঠতে চায়।

প্রাণপণে তাকে সামলাতে সামলাতে নব'র মা পাগলিনীর মত চিৎকার করে বলে, আয় পিসী, সবাই মিলে বন্যায় ঝাঁপিয়ে পড়ি। মরে গেলেই ত ফুরিয়ে গেল।

পিসী আরও গলা চড়িয়ে বলে, বড্ড তুই নরম মানুষ, নইলে এ দশা হয় ? চালাটা পড়ে গেছে, উপায় কি ! পায়ের নিচের মাটি ত সরে যায়নি।

গল্পের উপসংহারে লেখকের ব্যক্তিগত মন্তব্য (গল্প লেখার চিরন্তন আইন

এবং নিয়মকানুন ভঙ্গ করে) ঃ নব'র মা এবং পিসী ওই বন্যাতেই অক্কা পেয়েছে। জ্বরে অজ্ঞান অনাথ, ছেলেমানুষ নব এবং বাচ্চা মেয়েটাও যে মরে গেছে তা বলাই বাহুল্য। সুতরাং এটা যে বানানো গল্প নয় প্রমাণ করার জন্য জ্যান্ত সাক্ষী খাড়া করতে পারব কিনা ভাবছি।

রক্ত নোনতা

সন্ধ্যা তখন সাতটা।

মোড়ের দিকে টিয়ার গ্যাসের বোমা ফাটতে শুরু করা মাত্র আওয়াজ শুনে ডাক্তার দাশ তাড়াতাড়ি ভিতর থেকে ডিসপেন্সারীর দরজা বন্ধ করে।

কম্পাউণ্ডার নবীনের সঙ্গে নিজেও হাত লাগায় দরজা বন্ধ করতে।

আপসোসের কাঁপা স্বরে বলে, এবেলা না খুললেই হত। তুমি বললে ভয় নেই, কিছু হবে না—নইলে আমি কিছুতে খুলতাম না।

নবীন প্রতিবাদ জানিয়ে বলে, কিছু হবে না একথা ত আমি বলিনি। আমি শুধু বলেছিলাম—ভয় নেই। খোলা রাখলেই হত—মোড়ে হাঙ্গামা হচ্ছে, এখানে ভয় কি? জোয়ান নবীনের মুখের দিকে চেয়ে ঢোঁক গিলে ডাক্তার দাশ বলে, যাক্ গে, রোগীপত্র ত আজ আর আসবে না, কি হবে খোলা রেখে?

ঃ তা বলছি না। বন্ধ করেছেন বেশ করেছেন।

নবীনকে বেশ খুশী মনে হয়। টিয়ার গ্যাস বন্দুকের টোটা ফাটার এমন একটা মহামারী কাণ্ড ঘটায় তার যে ছুটি মিলেছে তাতেই সে খুশী। ডাক্তার দাশ ভাবে, কে জানে বাবা এরা কোন্ ধাতে তৈরী, কি আছে এদের রক্তে!

নবীন বলে, আমি তবে যাই ডাক্তারবাবু?

এত কাছে চলেছে কে জানে কেমন ভীষণ কাণ্ড, ছুটি পেয়েই বন্ধ ডিসপেন্সারীর নিরাপদ আশ্রয় ছেড়ে বেরিয়ে পড়ার জন্য ছোঁড়া ব্যাকুল! ভারী মজার ব্যাপার ঘটবে, দেরি হলে ফস্‌কে যাবে।

ডাক্তারি পরীক্ষাতে কি ধরা পড়বে এমন অদ্ভুত কি মিশেছে ওদের রক্তে?

ঃ বাড়িতে একটা খবর দিয়ে যাবে নবীন? আমার ফিরতে দেরি হলে কিংবা না ফিরলে যেন চিন্তা করে না। বলবে, এখানেই আছি, হিসাবপত্র দেখছি।

ফিরতে দেরি হলে কিংবা একেবারে না ফিরলে! নবীনের তাজ্জব লেগে যায়। ডাক্তার মানুষ, কত লোকের গায়ে ছুরি কাঁচি করাত চালিয়েছে, কত রক্তপাত দেখেছে, কত মানুষকে মরতে দেখেছে, ভুল চিকিৎসায় দু'চারজনকে

হয়ত মেরেও ফেলেছে—তার এমন আতঙ্ক! হাঙ্গামা না থামলে এখান থেকে বেরোবে না, দরকার হলে সারারাত এখানে কাটাবে!

পাড়াতে কাছেই ডাঃ দাশের বাড়ি, গলির ভিতরে। নবীন চলে যাওয়ার পর বন্ধ ঘর ডিসপেন্সারীর মধ্যে বসে হিসাবের মোটা খাতাটা খুলে বসে ভাবে, কতক্ষণ আর হাঙ্গামা চলবে? হাঙ্গামা থেমেছে টের পাওয়ার পরেই বাড়ি যাবে।

এত কাছে বাড়ি, বেরিয়ে টুক্ করে অবশ্য চলে যাওয়া যায় বাড়িতে। কি দরকার রিস্ক নিয়ে?

আধঘণ্টাও কাটে কিনা সন্দেহ। ডিসপেন্সারীর লাভ লোকসানের হিসাবে মশগুল ডাক্তার দাশ বন্ধ দরজায় হাত থাবড়ানির শব্দে চমকে ওঠে।

খানিকটা আশ্বস্ত হয় নবীনের গলার আওয়াজে: ডাক্তারবাবু, দরজাটা খুলুন ত।

তবু হাত পা একটু কাঁপে ডাক্তার দাশের। হাঙ্গামা এদিকে এগিয়ে এসেছে? অবস্থা সুবিধা নয় দেখে নবীন ডিসপেন্সারীতে আশ্রয়ে ফিরে এসেছে? নবীন ভয় পেয়ে পালিয়ে এসে থাকলে অবস্থা সাংঘাতিক দাঁড়িয়েছে বলতে হবে!

ছ'জনে ধরাধরি করে বয়ে এনেছে রক্তাক্ত দেহটা।

বালক জোয়ান ছ'জন—সবাই তারা পাড়ার, সবাই তারা চেনা।

তারাও অল্পবিস্তর আহত। তিন চার জনের দেহের এখান-ওখান থেকে অল্প অল্প রক্ত চুঁইয়ে পড়ছে।

নবীনের গায়ের শার্টটা যাবার সময় ছিল ধবধবে সাদা, বাঁ দিকের ঘাড় আর হাতার কাছে রাঙা হয়ে চুপ চুপ করছে। নিজের রক্তে, অথবা যাকে বয়ে এনেছে তার রক্তে কে জানে!

চৌদ্দ বছরের যাকে বয়ে এনেছে পাড়ার ক'জন চেনা বালক আর জোয়ান, তাকে ডাক্তার দাশ সবচেয়ে ভাল করে চেনে।

সঙ্গে এসেছে বুড়ো শিবশঙ্কর, সে বলে, তুমি নিজেই ডাক্তার, তাই ভাবলাম তোমার ছেলেটাকে অন্যদের সঙ্গে হাসপাতালে পাঠিয়ে কাজ নেই। বড় বেশী ঘা খেয়েছে, হাসপাতালে যেতে যেতে, বাবুদের নজর পড়লে কি জানি কি হয়!

বেঞ্চে শুইয়ে দিয়েছিল। ছেলেব মুখের দিকে এক নজর তাকিয়ে কব্জিটা কয়েক মুহূর্তের জন্য হাতের মুঠোয় নিয়ে ডাক্তার দাশ বলে, বেশ বুদ্ধি আপনার! ছেলেটাকে উছলে দিয়ে ঘায়েল কবে, মরাব দায়টা ঘাড়ে চাপাচ্ছেন আমার!

শিবশঙ্কর বল্‌লে, ছি, দিশেহাবা হ'য়ো না বাবা। ছেলে কি তোমার কারো পরামর্শে ঘায়েল হতে গিয়েছিল? ডাক্তার মানুষ বিচলিত হ'য়ো না। বাঁচাবার চেষ্টা তো কব ছেলেটাকে, তাবপর না বাঁচলে আর করা কি!

ডাক্তার দাশ বলে, এসো দিকি তোমাদের কার কি হয়েছে একে একে দেখি! নিজে নিজে শার্টটা খুলতে পারবে না নবীন?

নবীন মাথা নাড়ে।

: নাঃ, হাতটা নাড়তে পারছি না।

শিবশঙ্কর ব্যাকুলভাবে বলে, নিজের ছেলেটার দিকে আগে তাকাও বাবা। এই কি রাগ করাব সময়? সবাই মেতেছে—তোমার ছেলের দোষটা কি বল! দোতলার বারান্দায় দাঁড়িয়ে দেখলাম ত সব—বাপেব বয়সে এমন কাণ্ড দেখিনি।

ডাক্তার দাশ শিবশঙ্কবের কথা কানেও তোলে না, মুখ ফিরিয়ে একবার তাকিয়েও ত্যাখে না।

তুলো ব্যাণ্ডেজ ওষুধপত্র ইত্যাদি চটপট গুছিয়ে নিয়ে সব চেয়ে ছোট গণেশকে প্রথমে ধরে প্রাথমিক চিকিৎসা শুরু করে দেয়।

শিবশঙ্কর প্রায় আর্তনাদ করে ওঠে, ছেলেটার দিকে তাকাবে না! দেরি হলে ও যে মরে যাবে!

: মরে যাবে? ও ত আগেই মরে গেছে। সকলে হতভম্ব হয়ে যায়।

শিবশঙ্কর বিহ্বলের মত বলে, আগেই মরে গেছে? জ্যান্ত ছেলেটাকে নিয়ে ছুটে এলাম, আগেই মরে গেছে কি রকম!

: আনতে আনতে মাবা গেছে। পরীক্ষা করলাম দেখলেন না?

শিবশঙ্কর খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে বলে, রক্ত চুঁইয়ে পড়ছে কেন তবে? ডাক্তার দাশ একমনে দ্রুতগতিতে গণেশের ক্ষতটা বাঁধতে বাঁধতে বলে, মরার পরেও কিছুক্ষণ রক্ত চুঁইয়ে পড়ে।

হারাণের নাতজামাই

মাঝরাতে পুলিস গাঁয়ে হানা দিল। সঙ্গে জোতদার চণ্ডী ঘোষের লোক কানাই ও শ্রীপতি। কয়েকজন লেঠেল।

কনকনে শীতের রাত। বিরাম-বিশ্রাম ছেঁটে ফেলে উর্ধ্বশ্বাসে তিনটি দিনরাত্রি একটানা ধান কাটার পরিশ্রমে পুরুষেরা অচেতন হয়ে ঘুমোচ্ছিল। পালা করে জেগে ঘরে ঘরে ঘাঁটি আগলে পাহারা দিচ্ছিল মেয়েরা। শাঁখ আর উলুধ্বনিতে আকস্মিক আবির্ভাব জানাজানি হয়ে গিয়েছিল গ্রামের কাছাকাছি পুলিসের আবির্ভাবের। প্রায় সঙ্গে সঙ্গে পুলিস সমস্ত গাঁ ঘিরে ফেলবার আয়োজন করলেও হারাণের ঘর থেকে ভুবন মণ্ডল সরে পড়তে পারত, উধাও হয়ে যেত। গাঁসুদ্ধ লোক যাকে আড়াল করে রাখতে চায়, হঠাৎ হানা দিয়েও পুলিস সহজে তার পাত্তা পায় না। দেড়মাস চেষ্টা করে পারেনি, ভুবন এ-গাঁ ও-গাঁ করে বেড়াচ্ছে যখন খুশী।

কিন্তু গ্রাম ঘেরবার, আটঘাট বেঁধে বসবার কোন চেষ্টাই পুলিস আজ করল না। সটান গিয়ে ঘিরে ফেলল ছোট হাঁসতলা পাড়াটুকুর ক'খানা ঘর, যার মধ্যে একটি ঘর হারাণের। বোঝা গেল আটঘাট আগে থেকে বাঁধাই ছিল।

ভেতরের খবর পেয়ে এসেছে।

খবর পেয়ে এসেছে মানেই খবর দিয়েছে কেউ। আজ বিকালে ভুবন পা দিয়েছে গ্রামে, হঠাৎ সন্ধ্যার পরে তাকে অতিথি করে ঘরে নিয়ে গেছে হারাণের মেয়ে ময়নার মা, তার আগে পর্যন্ত ঠিক ছিল না কোন্ পাড়ায় কার ঘরে সে থাকবে। খবর তবে গেছে ভুবম হারাণের ঘরে যাবার পরে! এমনও কি কেউ আছে তাদের এ গাঁয়ে? শীতের তে-ভাগা চাঁদের আবছা আলোয় চোখ জ্বলে ওঠে চাষীদের, জানা যাবে সাঁঝের পর কে গাঁ ছেড়ে বাইরে গিয়েছিল। জানা যাবেই, এ বজ্জাতি গোপন থাকবে না।

দাঁতে দাঁত ঘষে গফুরালী বলে, দেইখ্যা লমু কোন্ হালা পিঁপড়ার পাখা উঠছে। দেইখ্যা লমু।

ভুবন মণ্ডলকে তারা নিয়ে যেতে দেবে না সালিগঞ্জ গাঁ থেকে। গাঁয়ে গাঁয়ে

ঘুরছে ভুবন এতদিন গ্রেপ্তারী ওয়ারেণ্টকে কলা দেখিয়ে, কোনও গাঁয়ে সে ধরা পড়েনি। সালিগঞ্জ থেকে তাকে পুলিস নিয়ে যাবে? তাদের গাঁয়ের এ কলঙ্ক তারা সইবে না। ধান দেবে না বলে কবুল করেছে জান, সে জানটা দেবে এই আপনজনটার জন্যে।

শীতে আর ঘুমে অবশপ্রায় দেহগুলি চাঙ্গা হয়ে ওঠে। লাঠি সড়কি দা' কুড়ুল বাগিয়ে চাষীরা দল বাঁধতে থাকে। সালিগঞ্জে মাঝরাতে আজ দেখা দেয় সাংঘাতিক সম্ভাবনা!

গোটাআষ্টেক মশাল পুলিস সঙ্গে এনেছিল, তিন চারটে টর্চ। হাঁসখালি পাড়া ঘিরতে ঘিরতে দপদপ করে মশালগুলি তারা জ্বেলে নেয়। দেখা যায় সব সশস্ত্র পুলিস, কানাই ও শ্রীপতির হাতেও দেশী বন্দুক।

পাড়াটা চিনলেও কানাই বা শ্রীপতি হারাণের বাড়িটা ঠিক চিনত না। সামনে রাখালের ঘর পেয়ে ঝাঁপ ভেঙে তাকে বাইরে আনিয়ে রেইডিং পার্টির নায়ক মন্মথকে তাই জিজ্ঞেস করতে হয়, হারাণ দাসের কোন্ বাড়ি?

তার পাশের বাড়ির হাবাণ ছাড়াও যেন কয়েক গণ্ডা হারাণ আছে গাঁয়ে। বোকার মত রাখাল পাণ্টা প্রশ্ন করে, আজ্ঞা কোন্ হারাণ দাসের কথা কন?

গালে একটা চাপড় খেয়েই এমন হাউমাউ করে কেঁদে ওঠে রাখাল, দম আটকে আটকে এমন সে ঘন ঘন উকি তুলতে থাকে যে, তাকে আর কিছু জিজ্ঞাসা করাই অনর্থক হয়ে যায় তখনকার মত। বোবা হাবা চাষাগুলো শুধু বেপরোয়া নয় একেবারে তুখড় হয়ে উঠেছে চালাকিবাজীতে।

এদিকে হারাণ বলে, হায় ভগবান!

ময়নার মা বলে, তুমি উঠলা কেন কও দিকি?

বলে, কিন্তু জানে যে তার কথা কানে যায়নি বুড়োর। চোখে যেমন কম দেখে, কানেও তেমনি কম শোনে হারাণ। কি হয়েছে ভাল বুঝতেও বোধ হয় পারেনি, শুধু বাইরে একটা গণ্ডগোল টের পেয়ে ভড়কে গিয়েছে। ছেলে আর মেয়েটাকে বুঝিয়ে দেওয়া গেছে চটপট, এই বুড়োকে বোঝাতে গেলে এত জোরে চেঁচাতে হবে যে প্রত্যেকটি কথা কানে পৌছবে বাইরে যারা বেড় দিয়েছে। দু'এক দণ্ড চেঁচালেই যে বুঝবে হারাণ তাও নয়, তার ভোঁতা ঢিমে মাথায় অত সহজে কোন কথা ঢোকে না। এই বুড়োর জন্য না ফাঁস হয়ে যায় সব!

ভুবনকে বলে ময়নার মা, বুড়ো বাপটার তরে ভাবনা।

ভুবন বলে, মোর কিন্তু হাসি পায় ময়নার মা।

ময়নার মা গম্ভীর মুখে বলে হাসির কথা না। গুলিও করতে পারে। দেখন নাত্তর। কইবো হাঙ্গামা করছিলেন।

তাড়াতাড়ি একটা কুপি জ্বালে ময়নার মা। হারাণকে তুলে নিয়ে ঘরে বিছানায় শুইয়ে দিয়ে হাতের আঙুলের ইশারায় তাকে মুখ বুজে চুপচাপ শুয়ে থাকতে বলে। তারপর কুপির আলোয় মেয়ের দিকে তাকিয়ে নিদারুণ আপসোসে ফুঁসে ওঠে, আঃ! ভাল শাড়িখান পরতে পারলি না?

বলছ নাকি? ময়না বলে।

ময়নার মা নিজেঃ টিনের তোরঙ্গের ডালাটা প্রায় মুচড়ে ভেঙে তাঁতের রঙীন শাড়িখানা বার করে। ময়নার পরনের ছেঁড়া কাপড়খানা তার গা থেকে একরকম ছিনিয়ে নিয়ে তাড়াতাড়ি এলোমেলো ভাবে জড়িয়ে দেয় রঙীন শাড়িটি।

বলে, ঘোমটা দিবি। লাজ দেখাবি। জামায়ের কাছে যেমন দেখাস। ভুবনকে বলে, ভাল কথা শোনেন, আপনার নাম হইল জগমোহন, বাপের নাম সাতকড়ি। বাড়ি হাতীনাড়া, থানা গৌরপুর—

নতুন এক কোলাহল কানে আসে ময়নার মার। কান খাড়া করে সে শোনে। কুপির আলোতেও টের পাওয়া যায় প্রৌঢ় বয়সের শুরুতেই তার মুখখানাতে দুঃখ-দুর্দশার ছাপ ও রেখা কি রুক্ষতা ও কাঠিন্য এনে দিয়েছে। ধুতি পরা বিধবার বেশ আর কদমছাঁটা চুল চেহারায় এনে দিয়েছে পুরুষালি ভাব।

গাঁ ভাইঙ্গা রুইখা আইতেছে। তাই না ভাবতেছিলাম ব্যাপার কি, গাঁ'র মাইনষের সাড়া নাই!

ভুবন বলে, তবেই সারছে। দশ-বিশটা খুন-জখম হইব নির্ঘাত। আমি যাই, সামলাই গিয়া।

থামেন আপনে, বসেন, ময়নার মা বলে, ছাখেন কি হয়।

শ'দেড়েক চাষী-চাষাড়ে অস্ত্র হাতে এসে দাঁড়িয়েছে দল বেঁধে। ওদের আওয়াজ পেয়ে মন্মথও জড়ো করেছে তার ফৌজ হারাণের ঘরের সামনে—দু'চার-জন শুধু পাহারায় আছে বাড়ির পাশে ও পিছনে, বেড়া ডিঙিয়ে ওদিক দিয়ে ভুবন না পালায়। দশটি বন্দুকের জোর মন্মথের, তার নিজের রিভলভার আছে। তবু চাষীদের মরিয়া ভাব দেখে সে অস্বস্তি বোধ করছে স্পষ্টই বোঝা যায়। তার স্বরটা

রীতিমত নরম শোনায়—স্রেফ হুকুমজারির বদলে সে যেন একটু বুঝিয়ে দিতে চায় সকলকে উচিত আর অনুচিত কাজের পার্থক্যটা, পরিণামটাও।

বক্তৃতার ভঙ্গীতে সে জানায় যে হাকিমের দস্তখতী পরোয়ানা নিয়ে সে এসেছে হারাণের ঘর তল্লাশ করতে। তল্লাশ করে আসামী না পায় ফিরে চলে যাবে। এতে বাধা দেওয়া হাঙ্গামা করা উচিত নয়, তার ফল খারাপ হবে। বে-আইনী কাজ হবে সেটা।

গফুর চেঁচিয়ে বলে, মোরা তল্লাশ করতি দিমুনা।

প্রায় দুশো গলা সায় দেয়, দিমুনা!

এমনি যখন অবস্থা, সংঘর্ষ প্রায় শুরু হয়ে যাবে মন্মথ হুকুম দিতে যাচ্ছে গুলি চালাবার, ময়নার মার খ্যানখেনে তীক্ষ্ণ গলা শীতার্ত থমথমে রাত্রিকে ছিঁড়ে কেটে বেজে উঠল, রও দিকি তোমরা, হাঙ্গামা কইরো না। মোর ঘরে কোন আসামী নাই। চোর ডাকাইত নাকি যে ঘরে আসামী রাখুম? বিকালে জামাই আইছে শোয়াইছি মাইয়া জামাইরে। দারোগাবাবু তল্লাশ করতে চান, তল্লাশ করেন।

মন্মথ বলে, ভুবন মণ্ডল আছে তোমার ঘরে।

ময়নার মা বলে, গ্যাখেন আইসা, তল্লাশ করেন। ভুবন মণ্ডল কেডা? নাম ত শুনি নাই বাপের কালে। মাইয়ার বিয়া দিলাম বৈশাখে, দুই ভরি রূপা কম দিছি ক্যান, জামাই ফির্যা তাকায় না। দুই ভরির দাম পাঠাইয়া দিছি তবে আইজ জামাই পায়ের ধুলা দিছে। আপ্‌নারে কমু কি দারোগাবাবু, মাইয়াটা কাইন্দা মরে। মাইয়া যত কান্দে, আমি তত কান্দি—

আচ্ছা, আচ্ছা।—মন্মথ বলে, ভুবনকে না পাই, জামাই নিয়ে তুমি রাত কাটিও।

গৌর সাউ হেঁকে বলে, অত চুপে চুপে আসে কেন জামাই ময়নার মা?

গা জলে যায় ময়নার মার। বলে, সদর দিয়া আইছে! তোমার একটা মাইয়ার সাতটা জামাই চুপে চুপে আসে, মোর জামাই সদর দিয়া আইছে!

গৌর আবার কি বলতে যাচ্ছিল, কে যেন আঘাত করে তার মুখে। একটা আর্ত শব্দ শুধু শোনা যায়, সাপে-ধরা ব্যাঙের একটিমাত্র আওয়াজের মত।

ময়নার রঙীন শাড়ি ও আলুথালু বেশ চোখে যেন ধাঁধা লাগিয়ে দেয় মন্মথের, পিচুটির মত চোখে এঁটে যেতে চায় ঘোমটা পরা ভীরু লাজুক কচি চাষী মেয়েটার আধপুষ্ট দেহটি। এ যেন কবিতা। বি. এ. পাশ মন্মথের কাছে, যেন চোরাই স্বচ্

হুইস্কির পেগ; যেন মাটির পৃথিবীর জীর্ণক্লিষ্ট অফিসিয়াল জীবনে একফোঁটা টসটসে দরদ। তার রীতিমত আপসোস হয় যে, যোয়ান-মদ্দ মাঝ-বয়সী চাষাড়ে লোকটা এর স্বামী, ওর আদরেই মেয়েটার এই আলুথালু বেশ!

তবু মন্মথ জেরা করে, সংশয় মেটাতে গাঁয়ের দু'জন বুড়োকে এনে সনাক্ত করায়। তার পরেও যেন তার বিশ্বাস হতে চায় না! ভুবন চুপচাপ দাঁড়িয়ে আছে গায়ে চাদর জড়িয়ে যতটা সম্ভব নিরীহ গোবেচারী সেজে। কিন্তু খোঁচা খোঁচা গোঁফ দাড়ি ভরা মুখ, রুক্ষ এলোমেলো একমাথা চুল, মোটেই তাকে দেখায় না নতুন জামায়ের মত। মন্মথ গর্জন করে হারাণকে প্রশ্ন করে, এ তোমার নাতনীর বর?

হারাণ বলে, হায় ভগবান!

ময়নার মা বলে, জিগান মিছা, কানে শোনে না বদ্ধ কালা।

অ! মন্মথ বলে।

ভুবন ভাবে এবার তার কিছু বলা বা করা উচিত।

এমন হাঙ্গামা জানলে আইতাম না কর্তা। মিছা কইয়া আনছে আমারে। সড়াইলের হাটে আইছি, ঠাইরেণ পোলারে দিয়া খপর দিলেন, মাইয়া নাকি মর মর—এখন যায় তখন যায়।

তুমি অমনি ছুটে এলে?

আস্‌ম না? রতিভরি সোনারূপা যা দিব কইছিল, তাও ঠেকায় নাই বিয়াতে। মইরা গেলে গাও থেইকা খুইলা নিলে আর পামু?

ওঃ! তাই ছুটে এসেছ? তুমি হিসেবী লোক বটে। মন্মথ বলে ব্যঙ্গ করে, আর কিছু করার নেই, বাড়িগুলি তল্লাশ ও তছনছ করে নিয়ম রক্ষা করা ছাড়া। জামাইটাকে বেঁধে নিয়ে যাওয়া চলে সন্দেহের যুক্তিতে গ্রেপ্তার করে, কিন্তু হাঙ্গামা হবে। দু'পা পিছু হটে এখনো চাষীর দল দাঁড়িয়ে আছে, ছত্রভঙ্গ হয়ে চলে যায়নি। গাঁয়ে গাঁয়ে চাষাগুলোর কেমন যেন উগ্র মরিয়া ভাব, ভয় ডর নেই। ঘরে ঘরে তল্লাশ চলতে থাকে। একটা বিড়াল লুকানোর মত আড়ালও যে ঘরে নেই সে ঘরেও কাঁথা কালি হাঁড়িপাতিল জিনিসপত্র ছত্রখান করে খোঁজা হয় মানুষকে।

মন্মথ থাকে হারাণের বাড়িতেই। অল্প নেশায় রঙীন চোখ। এ সব কাজে বেরোতে হলে মন্মথ অল্প নেশা করে, মাল সঙ্গে থাকে কর্তব্য সমাপ্তির পর টানবার জন্য,—চোখ তার রঙীন শাড়ি-জড়ানো মেয়েটাকে ছাড়তে চায় না। কুরিয়ে

কুরিয়ে তাকায় ময়নার কুড়ি বাইশ বছরের যোয়ান ভাইটা, উসখুস করে ক্রমাগত। ভুবনের চোখ জ্বলে ওঠে থেকে থেকে। ময়নার মা টের পায়, একটু যদি বাড়াবাড়ি করে মন্মথ, আর রক্ষা থাকবে না!

মেয়েটাকে বলে ময়নার মা, শীতে কাঁপুনি ধরেছে, শো' না গিয়া বাছা? তুমিও শুইয়া পড় বাবা। আপনে অনুমতি ছান দারোগাবাবু, জামাই শুইয়া পড়ুক। কত মানত কইরা, মাথা কপাল কুইটা আনছি জামাইরে,—ময়নার মা'র গলা ধরে যায়, আপনারে কি কমু দারোগাবাবু—

ময়না ঘরে গিয়ে শুয়ে পড়ে। ভুবন যায় না।

আরও দু'বার ময়নার মা সস্নেহে সাদর অনুরোধ জানায় তাকে, তবু ভুবনকে ইতস্তত: করতে দেখে বিরক্ত হয়ে জোর দিয়ে বলে, গুরুজনের কথা শোন, শোও গিয়া। খাড়াইয়া কি করবা? ঝাঁপ বন্ধ কইরা শোও।

তখন তাই করে ভুবন। যতই তাকে জামাই মনে না হোক, এরপর না মেনে কি আর চলে যে সে জামাই? মন্মথ আস্তে আস্তে বাইরে পা বাড়ায়। পকেট থেকে চ্যাপ্টা শিশি বার করে ঢেলে দেয় গলায়।

পরদিন মুখে মুখে এ গল্প ছড়িয়ে যায় দিগ্‌দিগন্তে, দুপুরের আগে হাতীপাড়ার জগমোহন আর জোতদার চণ্ডী ঘোষ আর বড় থানার বড় দারোগার কাছে পর্যন্ত গিয়ে পৌছায়। গাঁয়ে গাঁয়ে লোকে বলাবলি করে ব্যাপারটা আর হাসিতে ফেটে পড়ে, বাহবা দেয় ময়নার মাকে! এমন তামাশা কেউ কখনো করেনি পুলিসের সঙ্গে, এমন জব্দ করেনি পুলিসকে। ক'দিন আগে দুপুরবেলা পুরুষ-শূন্য গাঁয়ে পুলিস এলে ঝাঁটা বঁটি হাতে মেয়ের দল নিয়ে ময়নার মা তাদের তাড়া করে পার করে দিয়েছিল গাঁয়ের সীমানা! সে যে এমন রসিকতাও জানে কে তা ভাবতে পেরেছিল?

গাঁয়ের মেয়েরা আসে দলে দলে, অনিশ্চিত আশঙ্কা ও সম্ভাবনায় ভরা এমন যে ভয়ঙ্কর সময় চলেছে এখন, তার মধ্যেও তারা আজ ভাবনা চিন্তা ভুলে হাসিখুশীতে উচ্ছল।

মোক্ষদার মা বলে একগাল হেসে গালে হাত দিয়ে, মাগো মা ময়নার মা, তোর মত্তি এত?

ক্ষেন্তি বলে ময়নাকে, কি লো ময়না, জামাই কি কইলো? দিছে কি?

লাজে ময়না হাসে।

বেলা পড়ে এলে, কাল যে সময় ভুবন মণ্ডল গাঁয়ে পা দিয়েছিল প্রায় সেই সময়, আবির্ভাব ঘটে জগমোহনের। বয়স তার ছাব্বিশ সাতাশ, বেঁটে-খাটো যোয়ান চেহারা, দাড়ি কামানো, চুল আঁচড়ানো। গায়ে ঘরকাচা শার্ট, কাঁধে মোটা সুতির সাদা চাদর। গাঁয়ে ঢুকে গটগট করে সে চলতে থাকে হারাণের বাড়ির দিকে, এপাশ-ওপাশ না তাকিয়ে, গম্ভীর মুখে।

রসিক ডাকে দাওয়া থেকে, জগমোহন নাকি? কখন আইলা?

নন্দ বলে, আরে শোন, শোন, তামুক খাইয়া যাও।

জগমোহন ফিরেও তাকায় না।

রসিক ভড়কে গিয়ে নন্দকে শুধোয়, কি কাণ্ড বুঝলা নি?

কেমনে কমু?

অবাক হয়ে মুখ চাওয়াচাওয়ি করে দু'জনে।

পথে মথুরের ঘর। তার সঙ্গে একটু ঘনিষ্ঠতা আছে জগমোহনের। নাম ধরে হাঁক দিতে ভেতর থেকে সাড়া আসে না, বাইরের লোক জবাব দেয়। ঘরের কাছেই পথের ওপাশে একটা তালের গুঁড়িতে দু'জন মানুষ বসেছিল নির্লিপ্তভাবে একজনের হাতে খোঁটাসুদ্ধ গরু-বাঁধা দড়ি।

তাদের একজন বলে, বাড়িতে নাই। তুমি কেডা, হারামজাদাটারে খোঁজ ক্যান?

জগমোহন পরিচয় দিতেই দু'জনে তারা অন্তরঙ্গ হয়ে যায় সঙ্গে সঙ্গে।

অ! তুমিও আইছ ব্যাটারে দুই ঘা দিতে?

তা ভয় নেই জগমোহনের, তারা আশ্বাস দেয়, হাতের সুখ তার ফসকাবে না। কাল সন্ধ্যায় গেছে গাঁ থেকে, এখনো ফেরেনি মথুর, কখন ফিরে আসে ঠিকও নাই, তার অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে থাকতে হবে না জগমোহনকে! মথুর ফিরলে তাকে যখন বেঁধে নিয়ে যাওয়া হবে বিচারের জন্য, সে খবর পাবে। সবাই মিলে ছিঁড়ে কুটি-কুটি করে ফেলার আগে তাকেই নয় সুযোগ দেওয়া হবে মথুরের নাক কানটা কেটে নেবার, সে [illegible]র মার জামাই, তার দাবি সবার আগে!

শাউড়ী পাইছিলা দাদা একখান!

নিজের হইলে বুঝতা। জগমোহন জবাব দেয়; ঝাঁজের সঙ্গে চলতে আরম্ভ করে। শুনে দু'জনে তারা মুখ চাওয়াচাওয়ি করে অবাক হয়ে!

অচমকা জামাই এল, মুখে তার ঘন মেঘ। দেখেই ময়নার মা বিপদ গনে।

ব্যস্ত সমস্ত না হয়ে হাসিমুখে ধীর শান্তভাবে অভ্যর্থনা জানায়। তার যেন আশা ছিল, জানা ছিল, এ সময় এমনিভাবে জামাই আসবে, এটা অঘটন নয়। বলে, আস বাবা, আস। ও ময়না, পিঁড়া দে। ভাল নি আছে বেবাকে? বিয়াই বিয়ান পোলামাইয়া?

আছে।

আরেকটু ভড়কে যায় ময়নার মা। কত গোসা না জমা আছে জামাই-এর কাটা ছাঁটা এই এক কথার জবাবে। ময়নার দিকে তার না-তাকাবার ভঙ্গীটাও ভাল ঠেকে না। পড়ন্ত রোদে লাউমাচার সাদা ফুলের শোভা ছাড়া আর কিছুই যেন চোখ চেয়ে দেখবে না শ্বশুরবাড়ির পণ করেছে জগমোহন! লক্ষণ খারাপ।

ঘর থেকে কাঁপা কাঁপা গলায় হারাণ হাঁকে, আসে নাই? হারামজাদা আসে নাই? হায় ভগবান!

নাতিরে খোঁজে, ময়নাব মা জগমোহনকে জানায়, বিয়ান থেইকা ছাখে না, উতলা হইছে।

ময়নার মা প্রত্যাশা করে যে নাতিকে হাবাণ সকাল থেকে কেন ছাখে না, কি হয়েছে হারাণের নাতিব, ময়নার ভায়ের, জানতে চাইবে জগমোহন, কিন্তু কোন খবর জানতেই এতটুকু কৌতূহল দেখা যায় না তার।

খাড়াইয়া রইলা ক্যান? বস বাবা, বস।

জগমোহন বসে। ময়নার পাতা পিঁড়ি সে ছোঁয় না, দাওয়ার খুঁটিতে ঠেস দিয়ে উবু হয়ে বসে।

মুখ হাত ধুইয়া নিলে পারতা।

না যামু গিয়া অখনি।

অখনি যাইবা?

হ। একটা কথা শুইনা আইলাম। মিছা না খাঁটি জিগাইয়া যামু গিয়া। মাইয়া নাকি কার লগে শুইছিল কাইল রাইতে?

শুইছিল? ময়নার মার চমক লাগে, মোর লগে শোয় মাইয়া, মোর লগে শুইছিল, আর কার লগে শুইব?

ব্রহ্মাণ্ডের মাইনষে জানছে কার লগে শুইছিল। চোখে দেইখা গেছে দুয়ারে ঝাঁপ দিয়া কার লগে শুইছিল।

তারপর বেধে যায় শাশুড়ী জামায়ে। প্রথমে ময়নার মা ঠাণ্ডা মাথায় নরম

কথায় ব্যাপারটা বুঝিয়ে দিতে চেষ্টা করে, কিন্তু জগমোহনের ওই এক গোঁ। ময়নার মাও শেষে গরম হয়ে ওঠে। বলে, তুমি নিজে মন্দ, অন্যেরে তাই মন্দ ভাব। উঠানে মাইনষের গাদা, আমি খাড়া সামনে, এক দণ্ড ঝাঁপটা দিছে কিনা দিছে, তুমি দোষ ধরলা! অন্যে ত কয় না?

অন্যের কি? অন্যের বৌ হইলে কইতো।

বড় ছোট মন তোমার। আইজ মণ্ডলের নামে এমন কথা কইলা, কাইল কইবা যুয়ান ভায়ের লগে ক্যান কথা কয়।

কওন উচিত। ও মাইয়া সব পারে। তখন আর শুধু গরম কথা নয়, ময়নার মা গলা ছেড়ে উদ্ধার করতে আরম্ভ করে জগমোহনের চোদ্দপুরুষ। হারাণ কাঁপা গলায় চেঁচায়, আইছে নাকি? আইছে হারামজাদা? হায় ভগবান, আইছে? ময়না কাঁদে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে। ছুটে আসে পাড়াবেড়ানি নিন্দাছড়ানি নিতাই পালের বৌ আর প্রতিবেশী কয়েকজন স্ত্রীলোক।

কি হইছে গো ময়নার মা? নিতাই পালের বৌ শুধায়, মাইয়া কাঁদে ক্যান?

তাদের দেখে সম্বিৎ ফিরে পায় ময়নার মা, ফোঁস করে ওঠে, কাঁদে ক্যান? ভাইটারে ধইরা নিছে, কাঁদব না?

জামাই বুঝি আইছে খবর পাইয়া?

শুনবা বাছা, শুনবা। বইতে দাও, জিরাইতে দাও।

ময়নার মার বিরক্তি দেখে ধীরে ধীরে অনিচ্ছুক পদে মেয়েরা ফিরে যায়। তাকে ঘাঁটাবার সাহস কারো নেই। ময়নার মা মেয়েকে ধমক দেয়, কাঁদিস না। বাপেরে নিয়া ঘরে গেছিলি, বেশ করছিলি, কাঁদনের কি?

বাপ নাকি? জগমোহন বলে ব্যঙ্গ করে।

বাপ না? মণ্ডল দশটা গাঁয়ের বাপ। খালি জন্মো দিলেই বাপ হয় না, অন্ন দিলেও হয়। মণ্ডল আমাগো অন্ন দিছে। আমাগো বুঝাইছে, সাহস দিছে, একসাথ করছে, ধান কাটাইছে। না ত চণ্ডী ঘোষ নিত বেবাক ধান। তোমারে কই জগু, হাতে ধইরা কই, বুইঝা ছাখো, মিছা গোসা কইরো না।

বুইঝা কাম নাই। অখন যাই।

রাইতটা থাইকা যাও। জামাই আইলা, গেলা গিয়া, মাইনষে কি কইব?

জামায়ের অভাব কি। মাইয়া আছে, কত জামাই জুটবো।

বেলা শেষ হতে না হতে ঘনিয়ে এসেছে শীতের সন্ধ্যা। অল্প অল্প কুয়াশা

নেমেছে। ঘুঁটের ধোঁয়া ও গন্ধে নিশ্চল বাতাস ভারী। যাই বলেই যে গা তোলে জগমোহন তা নয়। ময়নার মারও তা জানা আছে যে, শুধু শাশুড়ীর সঙ্গে ঝগড়া করে যাই বলেই জামাই গটগট করে বেরিয়ে যাবে না। ময়নার সাথে বোঝাপড়া, ময়নাকে কাঁদানো, এখনো বাকী আছে। যদি যায় জামাই, মেয়েটাকে নাকের জলে চোখের জলে এক করিয়ে তারপর যাবে। আর কথা বলে না ময়নার মা, আস্তে আস্তে উঠে বেরিয়ে যায় বাড়ি থেকে। ঘরে কিছু নেই, মোয়ামুড়ি কিছু যোগাড় করতে হবে। খাক বা না খাক সামনে ধরে দিতেই হবে জামায়ের।

চোখ মুছে নাক ঝেড়ে ময়না বলে ভয়ে ভয়ে, ঘরে আস।

খাসা আছি। শুইছিলা ত?

না, মা কালীর কিরা, শুই নাই। মায় কওনে খালি ঝাঁপটা দিছিলাম, বাঁশটাও লাগাই নাই।

ঝাঁপ দিছিলা, শোও নাই। বেউলা সতী!

ময়না তখন কাঁদে।

তোমার লগে আইজ থেইকা শেষ।

ময়না আরও কাঁদে।

ঘর থেকে হারাণ কাঁপা গলায় হাঁকে, আসে নাই? ছোঁড়া আসে নাই? হায় ভগবান!

থেমে থেমে এক একটা কথা বলে যায় জগমোহন, না থেমে অবিরাম কেঁদে চলে ময়না, যতক্ষণ না কান্নাটা একঘেয়ে লাগে জগমোহনের। তখন কিছুক্ষণ সে চুপ করে থাকে। মুড়ি মোয়া যোগাড় করে পাড়া ঘুরে ময়নার মা যখন ফিরে আসে, ময়না তখন চাপা স্বরে ডুকরে ডুকরে কাঁদছে। বেড়ার বাইরে সুপারি গাছটা ধরে দাঁড়িয়ে থাকে ময়নার মা। সারাদিন পরে এখন তার দু'চোখ জলে ভরে যায়। জোতদারের সঙ্গে, দারোগা পুলিসের সঙ্গে লড়াই করা চলে, অবুঝ পাষণ্ড জামাইয়ের সঙ্গে লড়াই নেই!

আপন মনে আবার হাঁকে হারাণ, আসে নাই? মোর মরণটা আসে নাই? হায় ভগবান!

জগমোহন চুপ করেছিল, এতক্ষণ পরে হঠাৎ সে জিজ্ঞাসা করে শালার খবর।

—উয়ারে ধরছে ক্যান?

ময়নার কান্না থিতিয়ে এসেছিল, সে বলে, মণ্ডলখুড়ার লগে গোঁদলপাড়া গেছিল, ফিরতি পথে একা পাইয়া ধরছে।

ক্যান ধরছে?

কাইল জব্দ হইছে, সেই রাগে বুঝি।

বসে বসে কি ভাবে জগমোহন, আর কাঁদায় না ময়নাকে। ময়নার মা ভেতরে আসে, কাঁসিতে মুড়ি আর মোয়া খেতে দেয় জামাইকে, বলে, মাথা খাও, মুখে দাও।

আবার বলে, রাইত কইরা ক্যান যাইবা বাবা? থাইকা যাও।

থাকনের জো নাই। মা দিব্যি দিছে।

তবে খাইয়া যাও? আখা ধরাই? পোলাটারে ধইরা নিছে, পরানডা পোড়ায়। তোমারে রাইখা জুড়ামু ভাবছিলাম।

না, রাইত বাড়ে।

আবার কবে আইবা?

দেখি।

উঠি উঠি করেও দেরি হয়। তারপর আজ সন্ধ্যারাতেই পুলিস হানার সেই-রকম সোর ওঠে কাল মাঝরাত্রির মত। সদলবলে মন্মথ আবার আচমকা হানা দিয়েছে। আজ তার সঙ্গের শক্তি কালকের চেয়ে অনেক বেশী। তার চোখ সাদা।

সোজাসুজি প্রথমেই হারাণের বাড়ি।

কি গো মণ্ডলের শাশুড়ী, মন্মথ বলে ময়নার মাকে, জামাই কোথা?

ময়নার মা চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকে।

এটা আবার কে?

জামাই। ময়নার মা বলে।

বাঃ, তোর ত মাগী ভাগ্যি ভাল, রোজ নতুন নতুন জামাই জোটে! আর তুই ছুঁড়ী এই বয়সে—

হাতটা বাড়িয়েছিল মন্মথ রসিকতার সঙ্গে ময়নার থুতনি ধরে আদর করে একটু নেড়ে দিতে। তাকে পর্যন্ত চমকে দিয়ে জগমোহন লাফিয়ে এসে ময়নাকে আড়াল করে গর্জে ওঠে, মুখ সামলাইয়া কথা কইবেন।

বাড়ির সকলকে, বুড়ো হারাণকে পর্যন্ত, গ্রেপ্তার করে আসামী নিয়ে রওনা

দেবার সময় মন্মথ দেখতে পায় কালকের মত না হলেও লোক মন্দ জমেনি। দলে দলে লোক ছুটে আসছে চারিদিক থেকে, জমায়েত মিনিটে মিনিটে বড় হচ্ছে। মথুরার ঘর পার হয়ে পানা পুকুরটা পর্যন্ত গিয়ে আর এগোনো যায় না। কালকের চেয়ে সাত আটগুণ বেশী লোক পথ আটকায়। রাত বেশী হয়নি, শুধু এগাঁয়ের নয়, আশেপাশের গাঁয়ের লোক ছুটে এসেছে। এটা ভাবতে পারেনি মন্মথ। মণ্ডলের জন্য হলে মানে বুঝা যেত, হারাণের বাড়ির লোকের জন্য চারিদিকের গাঁ ভেঙে মানুষ এসেছে! মানুষের সমুদ্রের, ঝড়ের উত্তাল সমুদ্রের, সঙ্গে লড়া যায় না।

ময়না তাড়াতাড়ি আঁচল দিয়েই রক্ত মুছিয়ে দিতে আরম্ভ করে জগমোহনের। নব্বই বছরের বুড়ো হারাণ সেইখানে মাটিতে মেয়ের কোলে এলিয়ে নাতির জন্য উতলা হয়ে কাঁপা গলায় বলে, ছোঁড়া গেল কই? কই গেল? হায় ভগবান!

ভিক্ষুক

রাত্রি প্রায় আটটার সময় জনহীন ক্ষুদ্র স্টেশনটিতে যাদবকে নামাইয়া দিয়া বিনা সমারোহে ট্রেনটা চলিয়া গেল। যাত্রী নামিয়াছিল মোটে তিনজন, তাদের এক-জন যাদব নিজে। টিকিট আদায় করিয়া স্টেশন মাস্টার গিয়া ঢুকিল তার ঘরে আর টিমটিমে তেলের আলো ছুটি নিবাইয়া দিয়া কুলিটাও তার কোটরে অদৃশ্য হইয়া গেল। তখন যাদব প্রথম টের পাইল, বছরখানেক শহরে বাস করিয়াই মফঃস্বলের অন্ধকার রাত্রির সঙ্গে তার পরিচয় অনেকটা শিথিল হইয়া আসিয়াছে। কোমরে বাঁধা টাকাগুলির জন্য অন্ধকার রাত্রে ছ'সাত মাইল পথ হাঁটিয়া যাইতে ভয় করিবে, এতক্ষণ কে তা ভাবিতে পারিয়াছিল? শেষ রাত্রে চাঁদ উঠিবে, এখন চারিদিকে অমাবস্যার অন্ধকার। তারার আবছা আলোয় পথের আরম্ভটা মোটামুটি স্থির করা যায় মাত্র। তবে অনেকগুলি বছর বৌ-এর বাপের বাড়িতে বেকার বসিয়া শ্বশুরের অন্নধ্বংস করিতে হওয়ায় স্টেশন হইতে সেই গ্রাম পর্যন্ত পথটি যাদবের এত বেশী পরিচিত যে কল্পনায় দু'পাশের বিস্তীর্ণ মাঠ আর ক্ষেত, আমবাগান আর জঙ্গল এবং মাঝে মাঝে কাছের ও দূরের দু'একটি ছোট ছোট ঘুমন্ত গ্রাম সে পরিষ্কার দেখিতে পায়। স্টেশনের বাহিরে দিগন্তব্যাপী রহস্যময় পাতলা অন্ধকারের দিকে চাহিয়া তার মনে হয়, রাত্রিটা এখানে কাটাইয়া দিলে কেমন হয়? কিন্তু তারপর আবার মনে হয়, তাতেই বা লাভ কি! সঙ্গে কিছু টাকা আছে বলিয়াই যদি একা এতটা পথ যাইতে তার ভয় করে এখানে থাকিলেই বা এমন কি নিরাপদ আশ্রয় তার জুটিবে, যেখানে টাকার ভাবনা না ভাবিয়া নিশ্চিন্ত মনে রাত্রিটা ঘুমাইয়া কাটাইয়া দেওয়া চলিবে? স্টেশন-মাস্টারের ঘরের সামনে ওই তিন হাত চওড়া শেডটার নিচে সরু বেঞ্চটাতে শুইয়াই সম্ভবতঃ রাতটা তার কাটাইয়া দিতে হইবে, এই জনশূন্য ফাঁকা স্টেশনে!

টাকা যে তার সঙ্গে আছে, এ খবরটা ত কারও জানিবার কথা নয়। শহরে এগার মাস চাকরি করিয়াই সে-যে শ'খানেক টাকা জমাইয়া ফেলিয়াছে আর সব-গুলি টাকা সঙ্গে নিয়াই ছেলেমেয়ে ও বৌকে শহরে নিয়া যাইতে আসিয়াছে, এরকম একটা ধারণা চোর ডাকাতের মনে আসিবে কেন? তা ছাড়া, ছুটি মোটে

তার দু'দিনের, একটা দিনতো কাটিয়াই গেল। কাল সকলকে সঙ্গে করিয়া আসিয়া বেলা তিনটার গাড়ি ধরা চাই, পরশু কাজে না গেলে চলিবে না— তার কত দুঃখে সংগ্রহ করা কত কষ্টের কাজ!

আজ রাত্রেই গিয়া শ্বশুরবাড়ি হাজির হওয়া ভাল। সকালে উঠিয়াই রওনা হওয়ার আয়োজন আরম্ভ করিয়া দেওয়া যাইবে।

মনের মধ্যে এতগুলি যুক্তি খাড়া করিয়া হাঁটিতে আরম্ভ করিলেও কেমন যেন ফাঁপর ফাঁপর লাগিতে লাগিল যাদবের। স্টেশনের কিছু তফাতেই কয়েকখানা খড়ো ঘর নিয়ে ছোট একটি বস্তি, ইতিমধ্যেই নিঝুম হইয়া গিয়াছে। বস্তিটি পার হইয়া যাওয়ার পরেই চারিদিকে ফাঁকা মাঠ, অন্ধকারে বেশীদূর দৃষ্টি চলে না, তবু যেন দেখা যায়, কারণ দিগন্তের সীমায় আকাশ নিজেকে দৃশ্য করিয়া রাখিয়াছে। দেহ-মনের একটা খাপছাড়া অস্বস্তিবোধ ক্রমেই জোরালো হইয়া উঠিতে থাকে এবং যাদবের আর বুঝিতে বাকী থাকে না যে, ভয়ের উৎসটা শুধু তার কোমরে বাঁধা টাকাগুলি নয়।

অজানা অচেনা মানুষকে সঙ্গী কবিয়া পথে• চলিবার আশঙ্কাটাই এতক্ষণ যাদবের মনে প্রবল হইয়াছিল, এখন তার মনে হইতে থাকে, যেমন হোক একজন রক্তমাংসের সঙ্গী থাকিলেই ভাল হইত। এবকম কত অন্ধকার বাত্রির সঙ্গে তার পরিচয় ঘটিয়াছে, কিন্তু অন্ধকারের মধ্যে যে এতকিছু দ্রষ্টব্য থাকে, স্তব্ধতার মধ্যে এত শব্দ শোনা যায়, আর নির্জনতাব মধ্যে এমন সব উপস্থিতি অনুভব করা যায়, কোন দিন তার জানা ছিল না। যাদব থমকিয়া দাঁড়ায়। একবার ভাবে, ফিরিয়া গিয়া বস্তি হইতে পয়সা কবুল করিয়া একজন লোক সংগ্রহ করিয়া আনিবে কিনা। আবার ভাবে, ভূতের ভয়ে কাবু হইয়া আবার এতটা পথ ফিরিয়া যাইবে? রাম নাম জপ করিতে করিতে চোখ কান বুজিয়া কোন রকমে গন্তব্যস্থানে গিয়া পৌঁছানো যাইবে না? ভাবিতে ভাবিতে প্রকৃতিগত ভীরুতার ঠেলায় কখন যে স্টেশনের দিকে জোরে জোরে হাঁটিতে আরম্ভ করিয়া দেয় নিজেই ভাল করিয়া টের পায় না।

এমন সময় জোটে তার সঙ্গী। রক্তমাংসের লম্বা-চওড়া বিরাটদেহ সঙ্গী।

দূর হইতে মানুষটাকে আগাইয়া আসিতে দেখিয়াই যাদবের বুকের মধ্যে প্রথমটা ধড়াস করিয়া ওঠে। কয়েক মুহূর্তের জন্য সর্বাঙ্গ আড়ষ্ট হইয়া যায়। তারপর তাকে দেখিতে পাইয়া আগন্তুক যখন ডাক দিয়া জিজ্ঞাসা করে সে কে,

দেহে যেমন জীবন ফিরিয়া আসে এবং কাছে আগাইয়া আসিলে গায়ে পাঞ্জাবি, কাঁধে চাদর আর পায়ে জুতা দেখিয়া ফিরিয়া আসে চিন্তা করার ক্ষমতা।

'মশায় যাবেন কোথা ?'

'সোদপুর।'

যাদবের শ্বশুরবাড়ির গ্রামের কাছেই সোদপুর গ্রাম। শরীর মন যেন যাদবের হাল্কা হইয়া যায়। নিশ্চিন্ত মনে সে সঙ্গে সঙ্গে হাঁটিতে আরম্ভ করে। যাদব যে তার দিকেই আগাইয়া চলিতেছিল হঠাৎ দিক পরিবর্তন করিয়াছে এটা আগন্তুকের কাছে ধরা পড়ে নাই, গতিবেগ খানিকটা কমাইয়া সে বলে, 'একটু আস্তে হাঁটি, নয়ত আপনার কষ্ট হবে।'

যাদব সবিনয়ে বলে, 'আজ্ঞে না, কষ্ট কিসের ?'

'পিছন থেকে এসে ধরে ফেললাম, একটু আস্তে হাঁটেন বইকি আপনি।'

কথা আর গলার স্বর শুনিয়া মনে হয়, অপরিচয়ের ব্যবধানটা পুরাপুরিই আছে বটে তবু যেন তারা পরস্পরের আপন জন, পরমাত্মীয়। তাই স্বাভাবিক, মানুষ যখন মানুষকে শুধু মানুষ হিসাবে গ্রহণ করিতে পারে তখন আর তারা অনাত্মীয় থাকিবে কেন ? প্রান্তরবাহী এই পথের বুকে যে বিচ্ছিন্ন ও অসাধারণ জগতে তাদের সাক্ষাৎ হইয়াছে, সেখানে একজনের কাছে অন্যজন শুধু মানুষ। কিন্তু জীবনের সাধারণ অসাধারণ বাস্তব অবাস্তব সমস্ত আবেষ্টনীর মধ্যেই ভয় আর সন্দেহ যার জীবনকে শুধু খাপছাড়া যাতনাভোগে নেশায় ভরিয়া রাখিয়াছে, তার মন কেন বেশীক্ষণ সঙ্গীলাভের স্বাভাবিক নিশ্চিন্ত ভাব আর মানুষকে মানুষ মনে করার সহজ বুদ্ধি বজায় রাখিতে পারিবে ? কোথা হইতে আসিতেছে আর কোথায় যাইবে এই চিরন্তন ধরা-বাঁধা প্রশ্নের পর সঙ্গী যখন জিজ্ঞাসা করিয়া বসে, শহরে সে করে কি, যাদবের মনে একটা খটকা লাগে। সত্য কথাটা বলা কি উচিত হইবে, শহরে সে চাকরি করে, গত এগার মাস ধরিয়া মাসে মাসে নিয়মিত বেতন পাইয়াছে ?

গায়ে পাঞ্জাবি থাক, কাঁধে চাদর থাক, পায়ে জুতা থাক, মানুষটা আসলে কেমন, তাত আর সে জানে না। বাহিরের পোশাকে ভিতরের পরিচয় আর কবে জানা গিয়াছে মানুষের ?

সে শহরের চাকুরে-বাবু, এ খবরটা শুনিয়া যদি লোভ জাগে মানুষটার, অতি সহজে কিছু রোজগার করার এমন একটা সুযোগ পাইয়া যদি আত্মসংবরণ করিতে

না পারে, গলাটা টিপিয়া ধরিয়া যদি বলিয়া বসে, 'যা কিছু সঙ্গে আছে দাও'—কি হইবে তখন? তার চেয়ে মিথ্যা বলাই নিরাপদ।

'কি করি? আজ্ঞে, করি না কিছুই।'

শুনিয়া যাদবের সঙ্গী খানিকক্ষণ আর সাড়া শব্দ দেয় না। প্রকাণ্ড একটা বটগাছের তলা দিয়া যাওয়ার সময় দু'জনে গাঢ় অন্ধকারে যেন একেবারে হারাইয়া যায়। অন্ধকার রাত্রে নির্জন পথে আকস্মিক সাক্ষাতের ফলে বিনা ভূমিকায় মানুষের সঙ্গে মানুষের যে সম্পর্কটা স্থাপিত হইয়া গিয়াছিল, বটগাছের তলের গাঢ়তর অন্ধকারটাই যেন তাকে পরিণত করিয়া দেয় নিষ্কর্মা বেকার মানুষের সঙ্গে মানুষের সম্পর্কে। পরিণতিটা এত স্পষ্ট হয় যে, সঙ্গীর গলার আওয়াজ শুনিয়া যাদব পর্যন্ত টের পাইয়া যায়।

'আপনার চলে কি করে?'

'চলে? আজ্ঞে, চলে আর কই!'

'ছেলেমেয়েকে আনতে যাচ্ছেন বললেন না?'

আজ্ঞে না, আনতে নয়। দেখতে যাচ্ছি।' বলিতে বলিতে যাদবের খেয়াল হয়, যার দিন চলে না, বিশেষ কোন কারণ ছাড়া পয়সা খরচ করিয়া ছেলেমেয়েকে দেখিতে যাওয়ার শখটা তার পক্ষে একটু খাপছাড়াই হয়। জোরে একটা নিঃশ্বাস ফেলিয়া আবার তাই সে বলিতে থাকে, 'যাচ্ছি, কিন্তু দেখতে পাব কিনা ভগবান জানেন। চারদিন আগে খবর পেলাম, বড় ছেলেটা মর মর। তা গাড়ি ভাড়ার দেড়টা টাকাই বা কে দেবে যে দেখতে আসব? শেষকালে আর সইল না মশায়, ভাবলাম, যাই যাব জেলে, উপায় কি! বিনা টিকিটে গাড়িতে চেপে বসলাম। গিয়ে যদি দেখি শেষ হয়ে গেছে—'

বড় ছেলে ভোলার বছর দশেক বয়স হইয়াছে, বড় রোগা আর বড় শান্ত ছেলেটা। যাদবের মনটা খুঁতখুঁত করিতে থাকে, ছেলেটার বদলে অন্য কাউকে মর মর করিলেই ভাল হইত। কিন্তু মরণাপন্ন সন্তানের মত করুণ রস সৃষ্টি করিবার ক্ষমতা আর কার আছে? সঙ্গীর কাছে নিজেকে দরিদ্র প্রতিপন্ন করার ইচ্ছাটাই যাদবের ছিল, নিজের জীবনে এত সব চরম দুঃখ আমদানি করিয়া ফেলিতেছে কেন সে ঠিক বুঝিয়া উঠিতে পারে না। বানাইয়া বানাইয়া লোকটিকে এসব কথা বলার কি প্রয়োজন তার ছিল? কিন্তু থামিতে সে পারে না, সহানুভূতির সঙ্গে সঙ্গী তাকে দুটি একটি প্রশ্ন করে আর সে অনর্গল জীবনের চরম

দুঃখ-দারিদ্র্যের শোচনীয় কাহিনী বলিয়া যায়। কপাল, সবই মানুষের কপাল। নয়ত একজন মানুষের জীবনে কখনও এত দুর্ভাগ্য ভিড় করিয়া আসিয়া হাজির হয়! এদিকে শহরে সে দুটি পয়সা উপার্জনের চেষ্টায় প্রাণপাত করে, আঁজলা ভরিয়া রাস্তার কলের জল খাইয়া ক্ষুধাতৃষ্ণা মেটায়, আর এদিকে আত্মীয়ের আশ্রয়ে বৌ ছেলেমেয়ে তার পেট ভরিয়া খাইতে পায় না, বিনা চিকিৎসায় মরিয়া যায়। অথচ একদিন তার কি না ছিল! বাড়ি ছিল, জমিজমা ছিল, কত আত্মীয় পরিজনকে সে আশ্রয় দিয়াছে। বলিতে বলিতে গভীর বিষাদে যাদবের হৃদয় ভারাক্রান্ত হইয়া উঠে, গলা ভারী হইয়া আসে। মাঝে মাঝে সে ভুলিয়াই যায়, সে যা বলিতেছে কিছুই তার সত্য নয়, নিজের কাল্পনিক কাহিনীতে নিজেই অভিভূত হইয়া তার মনে হইতে থাকে, উঃ, কি কষ্টই সে পাইয়াছে জীবনে?

পথের শেষের দিকে সঙ্গী লোকটি একটু বেশী রকম চুপচাপ হইয়া যায়, কি যেন ভাবিতে থাকে। যাদবের শ্বশুরবাড়ির গ্রামের গা ঘেঁষিয়া পথটি সোদপুরের দিকে চলিয়া গিয়াছে, সেইখানে ছাড়াছাড়ি। বিদায় নিয়া যাদব গ্রামের দিকে পা বাড়াইয়াছে, লোকটি ডাকিয়া বলে, 'একটু দাঁড়ান ত!'

কাছে আসিয়া যাদবের হাতে একটা কাগজ গুঁজিয়া দিয়া সে বলে, 'আপনার ছেলের চিকিৎসা করাবেন।'—বলিয়াই হনহন করিয়া আগাইয়া যায়।

তারার আলোতেও যাদব বুঝিতে পারে, কাগজটা একটা দশ টাকার নোট।

প্রথমে যেমন বিস্ময় জাগিয়াছিল, তেমনি হইয়াছিল আনন্দ। সকলকে শহরে নেওয়ার খরচটা ভগবান জুটাইয়া দিলেন। ঘরের পয়সা আর খরচ করিতে হইবে না। কথাটা যাদবের মনে নানাভাবে পাক খাইয়া বেড়াইতে থাকে। সে ত কোন সাহায্য চায় নাই, তবু ভদ্রলোক যাচিয়া তাকে একেবারে দশ দশটা টাকা দান করিয়া ফেলিলেন কেন? বিশেষ বড়লোক বলিয়াও ত মনে হয় নাই মানুষটাকে? তার বানানো দুঃখের কাহিনী শুনিয়া এমনভাবে মন গলিয়া গেল যে একেবারে দশটা টাকা তাকে না দিয়া সে থাকিতে পারিল না।

সকলকে নিয়া যাদব শহরে ফিরিয়া যায়। আগেই যে খোলার ঘরটি ভাড়া করিয়া রাখিয়াছিল সেখানে গিয়া ওঠে, নিয়মিত কাজ করিতে যায়। কাজ করিতে করিতে তার মনে হয়, টাকা রোজগার করা কি কষ্টকর ব্যাপার! কাজের উপর বিতৃষ্ণা তার ছিল চিরদিনই, এখন মনে হয়, খাটুনি যেন বড় বেশী বাড়িয়া গিয়াছে। মানুষ এত খাটিতে পারে? এতকাল মাস গেলে বেতনের টাকাটা

হাতে পাইয়া সে বড় খুশী হইত, আজকাল ক্ষুণ্ণ হইয়া ভাবে, ত্রিশ একত্রিশ দিন প্রাণান্তকর পরিশ্রমের বিনিময়ে মোটে এই ক'টা টাকা! সহজে টাকা রোজগার করার কি কোন উপায় নাই, সেদিন রাত্রে কিছুক্ষণ শুধু বকবক করিয়া যেমন দশ দশটা টাকা রোজগার করিয়া ফেলিয়াছিল?

ভাবিতে ভাবিতে তার মনে হয়, দয়ালু লোক কি জগতে সেই একজনই ছিল, আর নাই শহরের এই লাখ লাখ লোকের মধ্যে? মর্মস্পর্শী করিয়া দুঃখ-দুর্দশার কাহিনী সে কি একেবারেই বলিতে পারিয়াছিল, আর পারিবে না? জনহীন প্রান্তরের সেই বিশেষ পারিপার্শ্বিক অবস্থাটি হয়ত জুটিবে না, পথ চলিতে চলিতে একজনকে অতক্ষণ ধরিয়া দুঃখের কাহিনী শোনানো যাইবে না, একেবারে দশটাকা দান করিয়া বসার মত উদারতাও হয়ত কারও জাগিবে না, তবু যেমন অবস্থায় যতটুকু শোনানো যায় আর যতটুকু উদারতা জাগানোর ফলে যা পাওয়া যায়।

কাজের শেষে একদিন বাড়ি ফেরার সময় সিল্কের পাঞ্জাবি-পরা এক ভদ্রলোককে যাদব বলিয়া বসে, 'দেখুন, আমি বড বিপদে পড়েছি—'

এক নজর চাহিয়াই সিল্কের পাঞ্জাবি-পরা ভদ্রলোক সিগারেট টানিতে টানিতে জোরে হাঁটিয়া আগাইয়া যায়। রাগে দুঃখে অপমানে যাদবের গা'টা যেন জ্বালা করিতে থাকে। গভীর হতাশাতেও তার মনটা ভরিয়া যায়। একটু দাঁড়াইয়া শুনিল না পর্যন্ত সে কি বিপদে পড়িয়াছে, মুখ বাঁকাইয়া গটগট করিয়া চলিয়া গেল! এই কি মানুষ, এই কি ভদ্রলোক? আবার সিল্কের পাঞ্জাবি গায়ে দেওয়া হইয়াছে!

ক'দিন আর সহজ উপায়ে রোজগারের চেষ্টা করিয়া দেখিবার উৎসাহ যাদবের জাগে না, মুখ ভার করিয়া কাজ করে এবং খোলার বাড়িতে ফিরিয়া গিয়া বৌকে গালাগালি দেয় আর ছেলেমেয়েগুলিকে ধরিয়া ধরিযা পিটায়। এদের আনিয়া খরচ বাড়িয়া গিয়াছে, মারাত্মক রকমের খরচ বাড়িয়া গিয়াছে। বেতনের টাকায় আর কুলায় না, জমা টাকা হইতে কিছু কিছু খরচ করিতে হয়। কি উপায় হইবে ভাবিতে গিয়া যাদবের মাথা গরম হইয়া উঠে। মাথা ঠাণ্ডা করার জন্য বন্ধুর সঙ্গে একটা খোলার ঘরে একটু ফুর্তি করিতে গিয়া সারারাত আর বাড়িই ফেরে না।

সকালে আর সময় থাকে না বাড়ি যাওয়ার, রাস্তার কলে মুখ-হাত ধুইয়া কোন

দোকানে কিছু খাইয়া কাজে চলিয়া যাইবে ঠিক করিয়া যাদব খেলার ঘর হইতে বাহির হইয়া আসে। বস্তির সীমানা পার হইয়া বড় রাস্তায় কিছুদূর আগাইয়া একটা জলের কলের সামনে দাঁড়াইয়াছে, নজরে পড়িল কাছেই-দাঁড়-করানো মোটরে যে লোকটি বসিয়াছিল তার শান্ত কোমল দয়া-মাখানো মুখখানা। পকেটে যাদবের পয়সা ছিল মোটে পাঁচটা। এতক্ষণ খেয়াল হয় নাই, এবার তার হঠাৎ মনে পড়িয়া যায়, এক পয়সার বিড়ি কিনিলে বাকী থাকিবে মোটে চারিটি পয়সা, চার পয়সায় কি সে খাইবে আর কি খাইয়া সারাদিন খাটিবে?

মোটরের কাছে গিয়া সে বলে, 'আপনাকে একটা কথা বলতে চাই।'

আরোহী বড়ই বিব্রত হইয়া পড়ে!—'কি কথা?'

'আমি বড় বিপদে পড়েছি, আমার বড় ছেলের কাল থেকে কলেরা। ওষুধ কিনবার পয়সা নেই—আপনি আমাকে কিছু সাহায্য করুন।'

'আঁ? সাহায্য?' বিব্রত ও বিরক্ত ভদ্রলোক পকেটে হাত দিয়া মনিব্যাগটা বাহির করেন। প্রথমে একটা সিকি বাহির করিয়া যাদবের দিকে একবার তাকান। সমস্ত রাত ফুর্তি করার ফলে মুখখানা যাদবের এমনি শুকনো দেখাইতেছিল যে সিকিটা বদলাইয়া গোটা একটা আধুলি তাকে দান করিয়া বসেন।

কোথায় দশ টাকা, কোথায় আট আনা! একজন না চাহিতেই দিয়াছিল, তারপর দু'জনের কাছে সে চাহিয়াছে। একজন কিছুই দেয় নাই, একজন একটি আধুলি দিয়াছে।

কিন্তু যাদব ভাবে, একেবারে কিছু না পাওয়ার চেয়ে তাই বা মন্দ কি? চাহিতে ত আর পরিশ্রম নাই! দু'জনের মধ্যে যদি একজন দেয়, দশজনের মধ্যে দিবে পাঁচজন—পাঁচ আধুলিতে আড়াই টাকা। কুড়ি জনের কাছে চাহিলে পাঁচ টাকা, চল্লিশ জনের কাছে চাহিলে—

যাদব বুঝিতে পারিয়াছে, তার উস্কোখুস্কো চুল আর রুক্ষ চেহারা দেখিয়া মোটরের আরোহীটির দয়া হইয়াছিল। তাই মুখ-হাত সে আর ধোয় না, ফুটপাত ধরিয়া চলিতে চলিতে পথচারীদের মুখের দিকে চাহিয়া থাকে। পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন জামা কাপড় পরা একজন বয়স্ক ভদ্রলোককে দেখিয়া মনে হয়, মোটরের লোকটির চেয়েও মুখে যেন তার দয়ার ভাবটা বেশী ফুটিয়া আছে। ভদ্রলোককে দাঁড় করাইয়া যাদব সবে তার ছেলের কলেরার ভণিতা আরম্ভ করিয়াছে, তিনি এমন চটিয়া গেলেন, বলিবার নয়।

'হ্যাঁ, হ্যাঁ, জানি, তোমার ছেলের কলেরা, মেয়ের বসন্ত, বৌয়ের টাইফয়েড—ভদ্রলোকের ছেলে তুমি, লজ্জা করে না তোমার ?'

একটা পয়সা বাহির করিয়া যাদবের গায়ের উপর ছুঁড়িয়া দিয়া তিনি চলিয়া যান, যাদব থ' বনিয়া দাঁড়াইয়া থাকে। মনে তার সত্যই বড় আঘাত লাগিয়াছে। অনেকদিন হইতেই কেমন একটা বিশ্বাস তার মনে জমা করা আছে যে মানুষের দয়া আর সহানুভূতির উপর তার জন্মগত অধিকার। এই অধিকারের দাবিতে সাহায্য আর সহানুভূতি সে চাহিয়াছে অনেকবার এবং অনেকের কাছে। আত্মীয়ের কাছে সাহায্য আর সহানুভূতি না পাইয়া তার যেমন অপমান বোধ হইত, এখন এই লোকটির ব্যবহারে নিজেকে তার চেয়েও বেশী অপমানিত মনে হইতে থাকে। তার কথায় বিশ্বাস না হোক, তাকে কিছু দিতে ইচ্ছা না হোক, এভাবে খোঁচা দিয়া একটা পয়সা গায়ের উপর ছুঁড়িয়া মারিয়া অপমান করার কি দরকার ছিল ? একটা টাকা, বড় জোর একটা আধুলি ছুঁড়িয়া মারিলেও বরং কথা ছিল। কি অভদ্র মানুষটা, কি নিষ্ঠুর !

'আপনার ছেলের কলেরা হয়েছে ?'

যাদব চাহিয়া ছাখে, মাঝবয়সী একটি লোক, মুখে সাতদিনের খোঁচা খোঁচা দাড়ি, পরনেও সাবান-কাচা মোটা কাপড়ের শার্ট, আধময়লা পায়ে ছেঁড়া তালি মারা পাম্পসু। ভদ্রলোকের চোখ দুটি ছলছল করিতেছে দেখিয়াও যাদবের বিশেষ ভরসা হয় না, এরকম লোকের কাছে কি আশা করা যায়, এরকম লোককে দুঃখের কাহিনী শুনাইয়া লাভ কি ! মাথা হেলাইয়া সায় দিয়া সে আগাইয়া যায়।

লোকটি কিন্তু নাছোড়বান্দা, সঙ্গে সঙ্গে চলিতে আরম্ভ করিয়া বলে, 'আমার মেজো মেয়েটা আর-রোব্‌বার কলেরায় কাবার হয়ে গেছে। এ শহরে মানুষ থাকে মশায়, শুধু রোগ, শুধু রোগ !' একটু থামিয়া সে নিজের শোক সামলাইয়া নেয়, তারপর বলে, 'সঙ্গে ত আমার কিছু নেই বিশেষ, সঙ্গে যদি একটু আসেন আমার বাড়ি পর্যন্ত, আপনার ছেলের চিকিৎসার জন্য—'

বাড়ি বেশী দূরে নয়, কাছেই একটা গলির মধ্যে। মেজো মেয়ের কলেরায় মরণের বিবরণ দিতে দিতে বাড়ির কাছে পৌছিয়াই ভদ্রলোক একেবারে কাঁদিয়া ফেলে। চোখ মুছিতে মুছিতে বাড়ির মধ্যে চলিয়া যায়। কেমন একটা অস্বস্তি বোধ হইতে থাকে যাদবের, সহজ উপায়ে রোজগারের চেষ্টা করিতে গিয়া প্রত্যেকবার যে সঙ্কোচ আর লজ্জার অনুভূতিটা মনের মধ্যে শুঁয়ো পোকার মত

হাঁটিয়া বেড়াইয়াছে, এবার হঠাৎ যেন সেটা প্রকাণ্ড একটা সাপ হইয়া ফোঁস ফোঁস করিতে আরম্ভ করিয়া দিয়াছে। একবার যাদব ভাবে, ভদ্রলোক বাড়ির ভিতর হইতে ফিরিয়া আসার আগে চম্পট দিবে; আরও কতলোকের কাছে সাহায্য পাওয়া যাইবে, নাই বা সে গ্রহণ করিল এই একজনের টাকা, যাচিয়া টাকা দেওয়ার জন্য যে তাকে সঙ্গে করিয়া বাড়ি নিয়া আসিয়াছে, ক'দিন আগে যার মেয়েটা মারা গিয়াছে কলেরায়?

ভদ্রলোক ফিরিয়া আসিয়া পাঁচটি টাকা যাদবের হাতে দেয়।

'আর নেই ভাই, সত্যি নেই। থাকলে দিতাম, সত্যি দিতাম!'

যাদবের ছেলের কলেরার চিকিৎসায় আরও কিছু সাহায্য করিতে না পারিয়া ভদ্রলোকের লজ্জা ও দুঃখের যেন সীমা থাকে না।

এমনিভাবে যাদব রোজগারের সহজ উপায়টি সম্বন্ধে ধীরে ধীরে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করিতে থাকে। চুলে সে তেল দেয় না, আঁচড়ায়ও না। কাজ হইতে বাড়ি ফিরিয়াই ছেঁড়া কাপড় জামা পরিয়া, ছেঁড়া একটি জুতা পায়ে দিয়া আবার বাহির হইয়া যায়। আজ শহরের এ অঞ্চলে, কাল শহরের ও অঞ্চলে বাছা বাছা মানুষকে নিজের দুঃখ-দুর্দশার কাহিনী শুনাইবার চেষ্টা করে। কেউ শোনে, কেউ শোনে না, কেউ সহানুভূতি জানায়, কেউ ধমক দেয়, কেউ কিছুই দেয় না। একদিন একজন একটা পয়সা গায়ের উপর ছুঁড়িয়া দিয়াছিল বলিয়া যাদবের অপমান বোধ হইয়াছিল, এখন অনেকেই সেভাবে একটা পয়সা তার গায়ের উপর ছুঁড়িয়া দেয়—কেউ কেউ একটা আধলাও দেয়! যাদবের কিন্তু আর দুঃখও হয় না, অপমানও সে বোধ করে না। মাঝে মাঝে আনি, দুয়ানী, সিকি পাওয়া যায়, কদাচিৎ টাকা আধুলিও আসে। তাতেই সে খুশী। তা ছাড়া, কয়েকদিনের রোজগারের হিসাব করিয়া সে দেখিতে পায়, একটি একটি করিয়া যে পয়সা পাওয়া যায়, একত্র করিলে সেগুলি আনী দুয়ানী সিকি আধুলি টাকার চেয়ে অনেক বেশীই দাঁড়ায়!

কাজটা সে এখনো ছাড়ে নাই, আর কিছু রোজগার বাড়িলেই ছাড়িয়া দিবে, ভাবিয়া রাখিয়াছে। কাজের জন্য যে সময়টা নষ্ট হয় সেটা দুঃখের কাহিনী শোনানোর কাজে লাগাইলে হয়ত রোজগার বেশীই হয়, তবু উপার্জনের নতুন উপায়টি আরও একটু ভালভাবে আয়ত্ত না করিয়া কাজটা ছাড়িয়া দেওয়ার সাহস তার হয় না।

আগে যাদব হাঁটিয়াই যাতায়াত করিত। আজকাল সময় বাঁচানোর জন্য ট্রামে চাপে। একদিন কাজ সারিয়া বাড়ি ফেরার জন্য ট্রামের অপেক্ষা করার সময় অদূরে ধোপদুরস্ত জামাকাপড় পরা, চাদর কাঁধে, ছড়ি হাতে বিশিষ্ট চেহারার এক ভদ্রলোককে দেখিয়া সে ভাবিতেছে, লোকটিকে দুঃখের কাহিনী শুনাইয়া দিবে কি না, সে নিজেই ধীরে ধীরে কাছে আগাইয়া আসিল।

'আপনাকে একটা কথা বলতে চাই।'

চেহারায়, পোশাকে, চলনে, কথায় সবদিক দিয়াই লোকটিকে এত বেশী সম্ভ্রান্ত মনে হইতেছিল যে, ভূমিকা শুনিয়াও যাদব কিছু বুঝিতে পারে না, সবিনয়ে বলে, 'আজ্ঞে বলুন না।'

লোকটি মৃদু একটু হাসে, 'বলতে এমন লজ্জা বোধ হচ্ছে মশাই। আমি থাকি শেওড়াফুলিতে, একটু দরকারে আজ কলকাতা এসেছিলাম। দোকানে কয়েকটা জিনিস কিনতে যাচ্ছি, কোন্ ফাঁকে কখন যে কে পকেট কেটে মনিব্যাগটা সরিয়ে ফেলেছে, টেরও পাইনি।'—পাঞ্জাবির ডানদিকের পকেটটা তুলিয়া দেখায়, সত্যই পকেটটা কাঁচি দিয়া কাটা।

'রিটার্ণ টিকিটটা পর্যন্ত সে ব্যাগের মধ্যে ছিল। মহা মুশকিলে পড়েছি, কাউকে চিনি না শহরে, কি করে যে এখন টিকিটের দামটা—'

স্তম্ভিত বিস্ময়ে যাদব তার মুখের দিকে চাহিয়া থাকে, যে ভাবে জুনিয়র উকিল হাঁ করিয়া শোনে বিখ্যাত আইনজীবীর বক্তৃতা।

ধান

অন্ধকার উৎকর্ণ হয়ে আছে ধানের গোলাটা ঘিরে, মাঝরাত্রির চাঁদ-ডোবা অন্ধকার। সন্তর্পণে পা ফেলে এগিয়ে গাঢ়তর ছায়ায় মিশে যাবার চেষ্টা করছে অর্ধ-উলঙ্গ মূর্তিটা, শ্বাসরোধ করে দু'চোখে অন্ধকার ভেদ করে আবিষ্কারের চেষ্টা করছে প্রহরীর গোপন উপস্থিতি। অত্যন্ত ভয়ে উত্তেজনায় টান টান হয়ে গেছে অর্ধ-উলঙ্গ দেহটা।

পাহারা নেই? এ দিনে ধানের গোলা, প্রাণের গুদাম, পাহারা-শূন্য? এটা ধাঁধার মত লাগে পাঁচুর কাছে। নিশ্চয় ঘুমিয়ে আছে পাহারাদার অন্তরালে আরামের ব্যবস্থা করে, নয় কর্তব্যে ফাঁকি দিয়েছে স্ফূর্তির জন্য কোথাও গিয়ে। মানুষ যখন ধানের জন্য উন্মাদ, গা-ঘেঁষা মরণ ঠেকাতে দিশেহারা, মরিয়া, গোলা-ভরা ধান তখন অরক্ষিত রেখে দিতে পারে শরৎ হালদার?

কাঁধের ঝোলা নামিয়ে রাখে পাঁচু, ঝোলা থেকে বার করে চকচকে দা, তারার আলোয় ঝিকমিক করে ওঠে তার ধার। গোলার যেটা পিছন দিক, দু'তিন হাত তফাতেই এক ইটের দেওয়াল, সেইখানে সেঁতসেঁতে শেওলায় জমানো আবর্জনায় দাঁড়িয়ে সিমেণ্টের ভিত্তির আধ হাত উঁচুতে গোলার মাটি-লেপা চাঁচের বেড়া কাটতে শুরু করে। অসীম ধৈর্যের সঙ্গে, আওয়াজ বাঁচিয়ে, ধীরে ধীরে সিঁধ দেয় সঞ্চিত জীবনের ভাণ্ডারে। ছোটখাটো গর্ত হলেই যথেষ্ট, সেই ফুটো দিয়েই শস্যকণা ঝুরঝুর করে বেরিয়ে আসবে। তার থলি ভরে যাবে। উপোস জ্বরের শান্তি ঘটিয়ে কাল অন্নপথ্য করবে সে আর বুঁচি।

দেয়াল ভেদ হয়। ধান গড়িয়ে আসে না। ডান হাতটা পাঁচু সবখানি ঠেলে ঢুকিয়ে দেয় ভেতরে, ছড়ে যায় কেটে যায় হাতের চামড়া। গোলার মধ্যে হাতড়ে হাতড়ে ধান খোঁজে। দু'চারটে ধান পড়ে আছে মেঝেতে, গোলা ধানশূন্য!

হাত বার করে এনে হতভম্ব পাঁচু ভাবে, এ কেমন ধাঁধা, কিসের পরিহাস! কালও ধান ছিল গোলায়, কি করে কোথায় উধাও হয়ে গেল ধান? পাপী সে, চোরছেঁচড়, তার স্পর্শেই কি শূন্য হয়ে গেল ধানের গোলা?

মণ্ডল সাঁতরা ভৌমিকরা ভোর ভোর গাঁ-সুদ্ধ লোক জুটিয়ে এনে শরৎ

হালদারের ধানের গোলায় চড়াও হবে, টেনে বার করবে তার মজুত, সবার সামনে ওজন করে ন্যায্য দামে বেচে দেবে গাঁয়ের উপোসী মানুষদের—এ পরামর্শ চুপে চুপে শুনেছিল পাঁচু। খিদেয় খ্যাপা মানুষগুলি হানা দেবার আগে নিজের ঝুলিটা ভরে নেবার ফিকিরে এসেছিল! সব মিথ্যে হয়ে গেল!

নিজের কপালে জোরে চাপড় মারে পাঁচু। দু'চোখ তার ফেটে যায় জল আসার তাগিদে। তার ঝুলি নয় ভরলো না তার দুরদৃষ্ট, শ' দেড়শ' মানুষ যে হাঁ করে আছে কাল কিছু ধান পাবার আশায়, কাকে তারা অভিশাপ দেবে!

সোনা মণ্ডল আপসোস করে বলে, রাতারাতি পাঁচশ' মণ ধান সরিয়ে ফেলল, কেউ টের পেলে না? শুধু পরামর্শই হল, কেউ নজর রাখলে না? আমি নয় গেছিলাম কুটুমবাড়ি—

ঋষি পাঞ্জা বলে, কেন গেলে? নিশ্চিন্দি হয়ে তুমি কুটুমবাড়ি যেতে পার, মোরা ঘুমোতে পারি না নিশ্চিন্দি হয়ে?

ঋষি তোকে আমি—আগুন বর্ষণ করে সোনা মণ্ডলের চোখ।

পরাণ ভৌমিক বলে, কেন? কেন ধমকাবে ওকে? দায়িক মোরা সবাই নই? রাতারাতি পাঁচশ' মণ ধান সরাবে কুথা দিয়ে কেমন করে তুমি ভাবলে? মোরা ভাবতে পারি না রাতারাতি কুথা দিয়ে কেমন করে পাঁচশ' মণ ধান সরাবে?

তা বটে, হক্ কথা।—চোখের নিমিষে শান্ত অনুতপ্ত হয়ে যায় সোনা মণ্ডল, মোদের সবার খেয়াল করা উচিত ছিল হালদার মশায় মস্ত ঘুঘু। কিন্তুক্ কি ব্যাপারটা বল দিকি, এ্যাঁ! কুথা সরালো, কেমন করে সরালো ধান?

এই কথাই ভাবে সবাই। ছেলে-বুড়ো মুখ চাওয়াচাওয়ি করে, মূক হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। ধাঁধা যাই হোক, ভুল যাই হয়ে থাক, শরৎ হালদারকে টেনে এনে ছিঁড়ে ফেলা যায়। ছিঁড়ে কুটি কুটি করে ফেলা যায় বুড়ী কচি মেয়ে-পুরুষ যে আছে তার বাড়িতে—আগুন দিয়ে ছাই করে দেওয়া যায় তার বাড়ি। পাকা দালান ত তার একটা ভিটের তিনখানা ঘর, বাকী বাঁশ কাঠ খড়ের মহাল আগুন দিলেই দাউদাউ করে জ্বলবে। সেই আগুনের আঁচে পুড়ে না যাক গলে যাবে পাকা দালানের লোহার সিন্দুকের সোনা।

কিন্তু তাতে ত আর ধান মিলবে না। সে হবে শুধু প্রতিহিংসা।

ফিরে চলে যাচ্ছিল সবাই আপসোস বুকে নিয়ে মিছামিছি হাঙ্গামা করার

স্বভাব তাদের নয়, বাংলা দেশের মানুষ কখনও প্রমাণ ছাড়া শাস্তি দেয় না। শরৎ হালদারের কি দুর্মতি হল, কি খেয়াল চেপে গেল একটু বাহাদুরি করার, গোমস্তা নারায়ণকে সে পাঠিয়ে দিল তার প্রতিনিধি হিসাবে বজ্জাত লোকগুলিকে দু'চারটে ধমক-ধামক দিতে!

ধান পেলে সোনা মণ্ডল? উল্লাসে উত্তেজনায় বিকৃত ব্যঙ্গের সুরে চেঁচিয়ে বলল নারায়ণ তার ফতুয়ায় বোতাম আঁটতে আঁটতে, বলি ধান পেলে গোলায়?

ফিরে যাচ্ছিল, ফিরে যেত সবাই, এই উৎকট ধিক্কারে গুম খেয়ে গেল গাঁয়ের শ'দেড়েক পুরুষ। অসহ্য বিস্ময়ে তাকালো দু'চোখে জ্বলন্ত প্রশ্ন নিয়ে।

গোমস্তা নারায়ণের কি অত খেয়াল আছে, চিরকাল মানুষ ঠেঙিয়ে সে তিরস্কার দূরে থাক, পেয়েছে পুরস্কার।

আবার সে চেঁচায়, বলি গোলার ধান ন্যায্য দরে বাঁটোয়ারা করলে না সোনা মণ্ডল?

ধান কোথা গেল নারাণ? সোনা মণ্ডল প্রশ্ন করল জোরালো গলায়। এগিয়ে গিয়ে বাঁ হাতে সে চুল মুঠো ক'রে ধরল নারায়ণের, ডান হাতে মুঠো ক'রে ধরল তার বুকের ফতুয়া, টেনে আনল সবার মধ্যে।

ধান কোথা গেল?

আমি—আমি—হাউহাউ করে কেঁদে ফেলল নারায়ণ। দম আটকে শ্বাস টেনে বিহ্বল হয়ে ভয়ার্ত কান্না।

এক ধাক্কায় তাকে উঠানে ফেলে দিল সোনা মণ্ডল। মুখ বাড়িয়ে থুতু ফেলল তার মুখে। ধারালো দা' বাগিয়ে কোপ দিতে ছুটে যাচ্ছিল জোয়ান মজিদ, বাঁ হাতে সাপটে ধরে তাকে ও আটকাল।

বলল, দুৎ! ছুঁচো মেরে হাত গন্ধ করব না।

সুবল মশাল জ্বেলেছে। এগিয়ে গেছে হালদারদের গোয়াল ঘরের চালায় আগুনের ছোঁয়াচ দিতে। সোনা মণ্ডল ছুটে গিয়ে মশাল কেড়ে নিল।

কি পোড়াবি? ঘর-বাড়ি? ঘর-বাড়ি কি শত্তুতা করেছে মোদের সাথে? ঘর পুড়বে মিছিমিছি, শত্তুর পালাবে, কাল মিলিটারী এনে গুলির চোটে ভুলিয়ে দেবে রাইকিশোরীর নামটা!

সোনা মণ্ডলের গালে একটা চড় বসিয়ে দেয় নগেন কুণ্ডু, তার আশা-ভরসা, টাকা খরচ ব্যর্থ হয়েছে। মুকুলের দিকে তাকিয়েই তার জ্ঞান ফিরে আসে,

উর্ধ্বশ্বাসে দৌড় দেয় দিগ্‌বিদিক জ্ঞান হারিয়ে, এঁদো ডোবার পাশ দিয়ে পড়ি-মরি ভাবে ছুটে অদৃশ্য হয়ে যায় আম-বাগানে। মুকুল আর বটুক তার পিছু তিনবার হাঁক দেয় সোনা মণ্ডল গলা চড়িয়ে চড়িয়ে, মুকুল আর বটুক অনিচ্ছায় থেমে ফিরে আসে।

সোনালী তাজা রোদ উঠে গেছে ততক্ষণে। খানিক দূরে সরকারী সড়ক দিয়ে আওয়াজ তুলে ধুলো উড়িয়ে নন্দীপুরের বোঝাই বাস্‌টা চলে গেল। আজ দেরি করেছে, সদর থেকে ভোর চারটায় ছেড়ে আরও আগে গাঁ-ঘেঁষে বাস্‌টা বেরিয়ে যায়, ওঠা-নামার যাত্রী না থাকলে থামেও না।

বাস্‌টা যেন থেমেছিল এদিকে রাস্তাটা যেখানে বড়পাড়ার ঘর-বাড়ির আড়ালে। টিনের ছোট বাক্সটি হাতে ঝুলিয়ে উল্লাসকে আসতে দেখা যায়। মামলাবাজি ব্যবসা উল্লাসের, অনেক উকিল মোক্তারের চেয়ে তার অনেক বেশী উপার্জন! সম্প্রতি এগারজন চাষীর নামে একদিনে হালদার সতরটা মামলা শুরু করেছে, তাই নিয়ে বড়ই ব্যস্ত হয়ে আছে, গাঁ আর সদর করে বেড়াচ্ছে হরদম।

জমায়ত দেখে সে তফাতেই থমকে দাঁড়ায়। হালদারের বাড়ির সামনে ভিড় জমাটা শুভ চিহ্ন নয়। দিনকাল সুবিধে নয়।

কুক্ষণে অসময়ে বাস্ থেকে নেমেছিল উল্লাস, ক্ষুব্ধ ব্যাহত মানুষগুলির সামনে এসে পড়েছিল, তার বিরুদ্ধে যাদের বুকে বহুদিনের জমা করা পুঞ্জ পুঞ্জ ঘৃণার আগুন! সোনা মণ্ডলের গালে চড় মেরেও কুণ্ডু ছুটে পালিয়েই বেঁচে গিয়েছে, কারণ মানুষটা সে যেমন হোক সে তাদেরই মানুষ, সঙ্গে এসেছিল একই উদ্দেশ্যে, তার বিরুদ্ধে বিদ্বেষ সঞ্চিত ছিল না যে হঠাৎ কাণ্ডজ্ঞান হারিয়ে একটা দোষ করলেই বারুদের মত ফেটে পড়বে। সবাই জানে, ওবেলাই হয়ত দেখা যাবে সোনা মণ্ডলের দাওয়ায় বসে সে কলকে ফুঁকছে, মাপ চেয়ে মিটিয়ে নিয়েছে ব্যাপারটা।

কিন্তু উল্লাসের ওপর বড় রাগ তাদের, বহুদিন ধরে মনগুলি জর্জরিত অভিশাপ হয়ে আছে। হঠাৎ গর্জন করে ওঠে আড়াইশ' লোক, তাতে তলিয়ে যায় সোনা মণ্ডল আর অন্য কয়েকজন ঠাণ্ডা মাথা মানুষের প্রতিবাদ। চিরদিনের জন্য শেষ হয়ে যায় ফন্দি-ফিকিরের জাল বোনা, মানুষের পর মানুষকে পথে নামানোর অধ্যবসায়, শিশির-ভেজা ঘাসে চিত হয়ে উল্লাসের দৃষ্টিহীন-পলকহীন চোখ মেলা থাকে আকাশের দিকে। বাতাসে উড়ে যায় ছিঁড়ে কুটিকুটি করা দলিলপত্র, নোটের তাড়াটা পর্যন্ত কেউ ছোঁয় না, আগুন দিয়ে পুড়িয়ে ফেলে।

জানালার ফাঁকে চোখ রেখে দাঁড়িয়ে ঘামে সর্বাঙ্গ ভিজে যায় শরৎ হালদারের, বন্দুক-ধরা হাতটা পর্যন্ত থরথর কাঁপতে থাকে।

ফুঁপিয়ে কাঁদে মেয়ে বিনু, ছেলের বৌ রাধা গা থেকে গয়না খোলার ব্যস্ততায় আলগা অনন্তটা টানাটানি করে যেন খুলতে পারে না, হালদার গিন্নী মাটিতে কপাল ঠেকিয়ে উপুড় হয়ে পড়ে থাকে সিঁদুর-মাখা লক্ষ্মীর পটটার সামনে, দাঁতে দাঁত চেপে মূক হয়ে থাকে হালদারের দুই জোয়ান ছেলে।

খিড়কি দিয়ে বেরিয়ে কখন লোক গেছে থানায় খবর দিতে, এখনো এল না নৃপেন দারোগা দলবল নিয়ে। এমনি বিপদে দয়া করে ছুটে আসার অগ্রিম মূল্য নিয়ে রেখেছে, তবু।

হালদারের জন্য জীবন দেয় উল্লাস, এই তার শেষ কাজ। কিন্তু জীবন দিয়েও যেন অপকার করে যায় শেষবারের মত। শূন্য গোলা দেখে ক্রোধে, ক্ষোভে ফুঁসতে ফুঁসতে ফিরেই যেত ধৈর্যহারা মরিয়া মানুষগুলি, হালদারের বাড়ি চড়াও হত না। ধান তারা লুটতে আসেনি, কিনতে এসেছিল গায়ের জোরে—তার বেশী আর কিছু করার কথা মাথায় ছিল না। উল্লাসের অনেক দিনের পুরনো পাওনা ঝোঁকের মাথায় মিটিয়ে দিয়ে মনের গতি যেন ঘুরে গেছে তাদের। গোলার ধান কোথায় গেল এ প্রশ্নের জবাব হালদারদের কাছেই আদায় করার সাধ জেগেছে।

জবাব চাই, ধান কি হল। জবাব দিতে হবে হালদারকে।

উঠানের দালানের সামনে তারা ভিড় করে দাঁড়ায়। ডাকে, হালদার মশায়, হালদার মশায়!

দরজা জানালা ভেতর থেকে বন্ধ। কিছুক্ষণ কারো সাড়াশব্দ মেলে না। তারপর ধীরে ধীরে জানালার একটা পাট খুলে গিয়ে শিকের ফাঁকে দেখা যায় বড় মেয়ে বিনুর ভয়ার্ত মুখ।

বাবা বাড়ি নেই।

বাড়ি আছে, লুকিয়ে আছে, গর্জন করে ওঠে তারা, আসতে বলো হালদার মশায়কে, নইলে দরজা ভেঙে ফেলব।

বন্দুক তোলে হালদার, বড় ছেলে ঠেকিয়ে রাখে। বলে, একটা বন্দুকে কি হবে? আরও ক্ষেপে যাবে সবাই।

বোনকে সরিয়ে সে জানালায় দাঁড়ায়। বলে, কি চাই সোনা মণ্ডল?

গোলায় ধান কোথা গেল? মোরা কিনতে এয়েছি ধান।

ধান নেই, বেচে দিয়েছি।

কাকে বেচলে? কখন বেচলে?

জগৎ কুণ্ডুকে বেচে দিয়েছি। রাত্রে ধান নিয়ে গেছে।

বেচে দিয়েছ! গাঁয়ের লোক না খেয়ে মরছে, তুমি ধান বেচে দিয়েছ!

জানালার পাট ধীরে ধীরে বন্ধ করে দেয় বড় ছেলে। কিন্তু কিছুক্ষণ পরে জানালা নয়, দরজাই খুলে দিতে হয় পরাণ ভৌমিক আর সোনা মণ্ডলকে ভেতরে ঢুকতে দেওয়ার জন্য। রাতারাতি পাঁচশ' মণ ধান সরিয়ে নিয়ে গেছে সাতকুঁড়ার জগৎ কুণ্ডু, কিন্তু গাঁয়ের লোক কেউ টের পায়নি, এটা সহজে বিশ্বাস করতে চায়নি তারা। দালানের তিনটে কোঠা খুঁজে দেখার দাবি করেছে।

শুধু দু'জন ভেতরে আসবে এই শর্তে দরজা খুলেও দিতে হয়েছে।

ঘরে ফিরে পাঁচু কাপড়ে বাঁধা আধ-সেদ্ধ ভেজা চালগুলি টুকরিতে ঢেলে রাখে। বুঁচি খুশী হয়ে বলে, আ মর! কোথাকার কুড়োনো চাল?

পাঁচু হাসে। উনান থেকে ভাতের হাঁড়ি নামিয়ে রেখে দালানে গিয়ে আশ্রয় নিয়েছিল হালদারের বড় বৌ, হাঁড়ি থেকে আধ-সেদ্ধ চালগুলি পাঁচু ছেঁকে তুলে কোঁচড়ে বেঁধে এনেছে।

গভীর রাত্রে লরী এসেছিল জগৎ কুণ্ডুর, দশজন লোক নিয়ে। সরকারী রাস্তায় থেমেছিল লরী।

ইঞ্জিন না চালিয়ে নিঃশব্দে লরীটা ঠেলে আনা হয়েছিল হালদারের বাড়ির কাছে, হাতে হাতে গোলাব ধান কিছুক্ষণের মধ্যে উঠে এসেছিল লরীতে, আবার ঠেলে লরী নিয়ে যাওয়া হয়েছিল বড রাস্তায়।

দিনের বেলায় প্রকাশ্যে কতবার এসেছে লরীটা, ধান-চাল নিয়ে গেছে গাঁয়ের লোকের চোখের সামনে দিয়ে, তখনো মরিয়া হয়ে ওঠেনি গাঁয়ের লোক পেটের জ্বালায়। লরীর চাকার অনেক দাগের সঙ্গে মিশে গিয়েছে গতরাত্রির আনা-গোনার নতুন দাগ।

জগৎ কুণ্ডুর তিনটে আড়ত, একটা গাঁয়ে, একটা নন্দীপুরে, একটা সদরে। তার কোনটাতেই যায়নি ধান নিয়ে লরীটা, বড় সড়ক ধরে ক্রোশ দুই নন্দীপুরের দিকে

গিয়ে বাঁয়ে মোড় ঘুরেছিল অন্য রাস্তায়, হাজির হয়েছিল তিন ক্রোশ তফাতে নদীর ধারে পলাশডাঙায়।

ধান-চাল চোরা-চালানের এখানে একটা ঘাঁটি আছে কুণ্ডুর।

জানে অনেকেই, একরকম প্রকাশ্যভাবেই চোরা-চালান চলে। গোপনতা শুধু এতটুকু যে সরকারীভাবে ব্যাপারটা স্বীকৃত হয় না।

টিনের চালা, সিমেণ্ট করা মেঝে। অত্যন্ত অবহেলার সঙ্গে ধানগুলি মেঝেতে ছড়িয়ে ঢেলে ফেলা হয়। এক কোণে অল্প কিছু চাল পড়েছিল মেঝেতে, চাল ও তুষের গুঁড়ো। বোঝা যায় গুদামে চাল জমা হয়েছিল, সম্প্রতি সরানো হয়েছে, এখনো মেঝে ঝাঁট দেওয়াও হয়নি। অলস স্তিমিত চোখে তাকায় নারায়ণ, শস্যের গন্ধ তার নাকে লাগে না, নাক ভোঁতা হয়ে গেছে। ছোট ঝাঁটাটি হাতে নিয়ে সাগ্রহ প্রতীক্ষায় দাঁড়িয়ে আছে রাজু, মা ও মেয়ে। ধান গুদাম ঘরে তুলতে যে ক'টি দানা পথে মাটিতে ঝরে পড়বে, ঝেঁটিয়ে ওরা কুড়িয়ে নেবে। খেয়ে বাঁচবে।

ধান যারা আগে গুদামে তুলেছিল তাদের একজন বোঝা থেকে কিছু ধান হাত বাড়িয়ে মাটিতে ছড়িয়ে দেয়, আড় চোখে চেয়ে হাসে। রাজু তার শীর্ণ মুখে খুশীর ভাব ফোটাতে চেষ্টা করে। মাটিতে ঝরে পড়া শস্যকণা কুড়িয়ে নেবার একচেটিয়া অধিকার দিয়েই তাকে কিনতে পেরেছে নারায়ণ। তার ওপর এই দয়া, খেলার ছলে আরও দুটি বেশী শস্য ছিটিয়ে দেওয়া!

ছোট ঘাট, খেয়া পারাপার হয়, কয়েকটি নৌকা আসে যায়, কয়েকটি ঘাটে বাঁধা থাকে, মেয়ে-পুরুষ নাইতে বা জল নিতে আসে। সকালে ধান-চালের গুদামটির গায়ে লাগানো কেরোসিনের দোকানের বারান্দায় চেয়ারে বসে নারায়ণ ঝিমোয়, বান্দা মেপে মেপে কেরোসিন বেচে। তেল দিতে যেন হাত ওঠে না তার, পয়সা নিয়ে দু'ফোঁটা তেলও যেন দেয় অনিচ্ছায়। সবাই পায় না তেল, পাওনা তেলের দশভাগের এক ভাগও পাবে না, তেল ফুরিয়ে যায়! এটা লাইসেন্সপ্রাপ্ত দোকান, দশ টিনে দু'টিন এমনিভাবে বাঁধা দরে বেচে ঠাট বজায় রাখতে হয়। বাকীটা নির্বিবাদে বেচা যায় চোরা দরে।

নৌকার মাঝি এসে দাঁড়ায়। হাই তুলে নারায়ণ বলে, দেশপুরের কলে পৌঁছে দিবি ধান।

মাঝি বলে, দিনে বোঝাই দিতে বাবু বারণ করেছে না?

তুত্তোরি বারণ করেছে, নারায়ণ ঝিমিয়ে ঝিমিয়েই বলে, তোল তুই। কি হবে? কোন্ শালা কি করবে?

তা ঠিক কিছুই হয় না, কেউ কিছু বলে না, সবার চোখের ওপর বুক ফুলিয়ে চোরাই ধান-চাল চালান দেওয়া যায়!

কিন্তু চিরদিন কি যায়? চিরদিন কি মানুষ মুখ বুজে থাকে কিছু বলে না!

ওরা কারা আসছে দল বেঁধে? কেরোসিনের খদ্দের? কেরোসিনের খদ্দের ত এমন দল বেঁধে আসে না। সুধীর, কানাই, জৈনুদ্দীনদের দেখা যাচ্ছে। একটা কিছু হাঙ্গামা করতে আসছে। নারায়ণ সজাগ হয়ে ওঠে।

তোমার গুদোমে চোরাই ধান আছে।

তুমি কে হে বাবু? আমার গুদোমে কি আছে না আছে, তোমার তাতে কি?

সুধীরের মেজাজ বিগড়েই ছিল, সে চিৎকার করে বলে, আবার চোখ রাঙায়! বাঁধো ব্যাটাকে, কোমরে দড়ি বেঁধে টেনে নিয়ে চলো থানায়।

সুধীর বলে, থামো, থামো। দারোগাবাবু আসুক। ধান রয়েছে, আসামী রয়েছে, এতো আর চাপা দেওয়া চলবে না।

থানার দারোগা বিধুভূষণ এসে পৌঁছতে পৌঁছতে খবর ছড়িয়ে প্রকাণ্ড ভিড় জমে যায়। উৎসুক, উত্তেজিত হয়ে জনতা প্রতীক্ষা করে কি ঘটে দেখবার জন্য। এতকাল ধরে এমন খোলাখুলিভাবে এখান দিয়ে ধান-চালের বে-আইনী চালান চলে আসছে যে, লোক প্রায় খেয়াল করতেই ভুলে গিয়েছিল কারবারটা আইনসঙ্গত নয়। নারায়ণের মুখ শুকিয়ে গেছে, চোখ তার পিটপিট করে। এ অঘটন তার কল্পনায় ছিল না। সুধীর কানাইরা যে দল বেঁধে এসেছিল সেটা সে গ্রাহ্যই করেনি, থানায় খবর গেছে শুনে মনে মনে একটু হেসেই ছিল বরং। কিন্তু দেখতে দেখতে যে ভাবে চারিদিক ভেঙে এসে জমা হয়েছে মানুষ, খুশীর উত্তেজনায় চঞ্চল হয়ে প্রতীক্ষা করছে পুলিস এসে তাকে কি ভাবে বেঁধে নিয়ে যাবে দেখবার জন্য, তাতে ভড়কে গিয়েছে নারায়ণ। কিছু তার হবে না শেষ পর্যন্ত সে জানে। তবু একটা অদ্ভুত আতঙ্ক চাপ দিচ্ছে হৃদপিণ্ডে, দম যেন আটকে আসবে। জনতার এই ভয়ংকর বিরোধী মূর্তি সে জীবনে কখনো ছাখেনি।

বিধুভূষণও ভড়কে যায় ব্যাপার দেখে।

বলে, কি ব্যাপার, কি ব্যাপার, হয়েছে কি! ভিড় কিসের!

বলে, ধান? চোরাই ধান ধরা পড়েছে? তাই নাকি! তা এত ভিড় কেন?

বলে, কি হে পরাণ, ব্যাপারটা কি?

আমি কি জানি, নারায়ণ বলে, কর্তা ধান পাঠাল—

আচ্ছা, আচ্ছা, সে হবে। শুনছি সব। প্রায় ধমক দিয়ে বলে বিধুভূষণ, লোকটার মূর্খতায় সে চটে যায়! কর্তাকে আবার টানবার চেষ্টা কেন এর মধ্যে? বিধুভূষণ যেন জানে না কে তার কর্তা, কে ধান পাঠিয়েছে!

সুধীর কানাইদের বলে বিধুভূষণ, ওহে তোমরা ভিড় ভাগাও, তোমরাও যাও। ধরিয়ে দিয়েছো, এবার যা করার আমায় করতে দাও।

সুধীর কানাইরা নড়ে না। ভিড় এক পা পিছু হটে না।

সুধীর বলে, সবার সামনে ধান দেখুন, সাক্ষীদের নাম-টাম লিখুন—

ব্যাটাকে গারদে পুরুন!—একজন চেঁচিয়ে ওঠে।

ধীরে ধীরে একটা সিগারেট ধরায় বিধুভূষণ, সুধীরদের দিকে, পিছনের জনতার দিকে দু'চারবার তাকায়, তারপর নারায়ণকে বলে, গুদামটা খোলো ত হে। কত ধান আছে?

দরজা খুলে একবার উঁকি দিয়ে দেখেই বাইরে থেকে তালা এঁটে সিল করে দেওয়া হয়, লেখালেখি হয় বিবরণাদি সাক্ষীর নাম ধাম, তারপর একজন পুলিসকে গুদামের সামনে মোতায়েন রেখে নারায়ণকে নিয়ে বিধুভূষণ চলে যায়!

ভিড়ের মানুষ তৃপ্ত হয়ে বাড়ি ফেরে।

সেইদিন জগৎ কুণ্ডু যায় সদরে, হাজিরা দেয় জোনসের বাংলোয়। জোনস একা থাকে, তার মেম থাকে কলকাতায়। শহর ছেড়ে সে নড়ে না, টাকা চেয়ে পাগল করে তোলে জোনসকে। না দিয়ে উপায় থাকে না, বড় মুশকিল হয় টাকার ব্যাপারে কড়াকড়ি করলে।

পরদিন দেখা যায় কেরোসিন তেলের দোকানের সামনে চেয়ারে বসে ঝিমোচ্ছে নারায়ণ। পুলিসের তত্ত্বাবধানে গুদামের ধানগুলি থানার কাছে এক চালা-ঘরে চালান হয়ে যায়, সেঁতসেঁতে মাটির মেঝেতে জমা হয়। খড়ের চালার অনেকগুলি ফোকর দিয়ে ঘরের মধ্যে উঁকি মারে মেঘম্লান আকাশের আলো।

সুধীর কানাইরা কয়েকজন দেখা করতে যায় বিধুভূষণের সঙ্গে, জিজ্ঞাসা করে, কি ব্যাপার হল?

বিধুভূষণ বলে, খোঁজখবর রাখবে না কিছু, হাঙ্গামা বাঁধিয়ে বসবে। কাণ্ডাকাণ্ড জ্ঞান আছে তোমাদের ? লাইসেন্স আছে নারায়ণের, জগৎবাবু ওর নামে পারমিট করিয়ে রেখেছিলেন। নারায়ণেরও বুদ্ধি বেশী, আরে বাবা তুই লেজিটিমেট এজেণ্ট সরকারের, জগৎবাবু তোর লাইসেন্স পারমিট সব করে রেখেছেন না রাখেন নি, সে খবরটাও তুই জানিস না ?

ধানটা তাহলে সরান হল কেন ?

তোমাদের জন্য, বিধুভূষণ অনুযোগের সুরে বলে, এ ধানটা নিয়ে হাঙ্গামা করলে তোমরা, ফের যদি হানা দাও নারায়ণের গুদামে, গোলমাল কর। আমার হেপাজতে রাখার হুকুম হয়েছে।

এ যুক্তি ভাল। দারুণ অসন্তোষ বুকে নিয়ে ফিরে যায় সুধীরেরা। মেঘ ঘনিয়ে আসে আকাশ কালো করে। বৃষ্টি নামে অজস্র ধারে। আবার রোদ ওঠে, আবার বৃষ্টি হয়। রাত্রে শেয়াল ঘুরে যায় ধান রাখা চালাটার চারপাশে। ভ্যাপসা একটা দুর্গন্ধ ছড়িয়ে পড়তে থাকে। ক্রমে ক্রমে অসহ্য হয়ে ওঠে সে গন্ধ। তারপর একদিন সদরে চালান দেবার ব্যবস্থা হলে চালাটার দরজা খুলে দেখা যায়, ধানগুলি পচে গেছে।

বিবেক

শেষ রাত্রে একবার মণিমালার নাড়ী ছাড়িয়া যাওয়ার উপক্রম হইল। শিয়রে ঘনশ্যাম অত্যন্ত সজাগ হইয়াই বসিয়াছিল। স্ত্রীর মুখে একটু মকরধ্বজ দিয়া সে বড় ছেলেকে ডাকিয়া তুলিল।

'ডাক্তারবাবুকে ডেকে নিয়ে আয় সন্তু। নিখিলবাবু যদি না আসেন, মোড়ের বাড়িটাতে যে নতুন ডাক্তার এসেছেন, ওঁকে আনিস। উনি ডাকলেই আসবেন।'

ঘরে একটিও টাকা নাই, শুধু কয়েক আনা পয়সা। ভিজিটের টাকাটা ডাক্তারকে নগদ দেওয়া চলিবে না। বাড়িতে ডাক্তার আনিলে একেবারে শেষের দিকে বিদায়ের সময় তাঁকে টাকা দেওয়া সাধারণ নিয়ম, এইটুকু যা ভরসা ঘনশ্যামের। ডাক্তার অবশ্য ঘরে ঢুকিয়াই তার অবস্থা টের পাইবেন, কিন্তু একটি টাকাও যে তার সম্বল নাই এটা নিশ্চয় তাঁর পক্ষে অনুমান করা সম্ভব হইবে না। মণিমালাকে ভালভাবেই পরীক্ষা করিবেন, মরণকে ঠেকানোর চেষ্টার কোন ত্রুটি হইবে না। বাঁচাইয়া রাখার জন্য দরকারী ব্যবস্থার নির্দেশও তাঁর কাছে পাওয়া যাইবে। তারপর, শুধু তারপব, ঘনশ্যাম ডাক্তারেব সামনে দু'টি হাত জোড় করিয়া বলিবে, 'আপনার ফি'টা সকালে পাঠিযে দেব ডাক্তারবাবু—'

মণিমালার সামনে অদ্ভুত ভঙ্গীতে হাতজোড় করিয়া বিড়বিড় করিয়া কথাগুলি বলিতেছে। ঘুম-ভরা কাঁদ কাঁদ চোখে বড় মেয়েটা তাকে দেখিতেছে। আঙুলে করিয়া আরও খানিকটা মকরধ্বজ সে মণিমালার মুখে গুঁজিয়া দিল। ওষুধ গিলিবার ক্ষমতা অথবা চেষ্টা মণিমালার আছে, মনে হয় না। হিসাবে হয়ত তার ভুল হইয়া গিয়াছে। আরও আগে ডাক্তার ডাকিতে পাঠানো উচিত ছিল। ডাক্তারকে সে ঠকাইতে চায় না, ডাক্তারের প্রাপ্য সে দু'চার দিনের মধ্যে পাঠাইয়া দিবে, মণিমালা মরুক অথবা বাঁচুক। তবু, গোড়ায় কিছু না বলিয়া রোগিণীকে দেখাইয়া ডাক্তারের কাছে ব্যবস্থা আদায় করার হিসাবে একটু প্রবঞ্চনা আছে বইকি। এসব হিসাবে গলদ থাকিয়া যায়।

কিন্তু উপায় কি! একজন ডাক্তার না দেখাইয়া মণিমালাকে ত মরিতে দেওয়া যায় না।

'আগুন করে হাতে পায়ে সেঁক দে লতা। কাঁদিস নে হারামজাদী, ওরা উঠে যদি কান্না শুরু করে, তোকে মেরে ফেলব।'

মণিমালার একটি হাত তুলিয়া সে নাড়ী পরীক্ষার চেষ্টা করিল। দু'হাতে দু'টি রুলি এখনো তার আছে। সজ্ঞানে এ রুলি সে কিছুতেই খুলিতে দেয় নাই। কাল সন্ধ্যায় জ্ঞান প্রায় ছিল না, তখন একবার খুলিবার চেষ্টা করিয়াছিল। চোখ কপালে তুলিয়া যন্ত্রণায় মুখ বিকৃত করিয়া মণিমালাকে খাবি খাওয়ার উপক্রম করিতে দেখিয়া সাহস হয় নাই। এখন অনায়াসে খুলিয়া নেওয়া যায়। সে টেরও পাইবে না। সকালেই ডাক্তারকে টাকা দেওয়া চলিবে, ওষুধপত্র আনা যাইবে। কিন্তু লাভ কি কিছু হইবে শেষ পর্যন্ত? সেইটাই ভাবনার বিষয়। রুলি-বেচা পয়সায় কেনা ওষুধ খাইয়া জ্ঞান হইলে হাত খালি দেখিয়া মণিমালা যদি হার্ট-ফেল করে!

সন্তু যখন ফিরিয়া আসিল, চারিদিক ফরসা হইয়া আসিয়াছে। মণিমালা ততক্ষণে খানিকটা সামলাইয়া উঠিয়াছিল। খুঁজিয়া নাড়ী পাওয়া যাইতেছে, নিঃশ্বাস সহজ হইয়া আসিয়াছে। ডাক্তার আসেন নাই শুনিয়া ঘনশ্যাম আরাম বোধ করিল।

নিখিল ডাক্তার বলিয়া দিয়াছেন, বেলা দশটা নাগাদ আসিবেন। মোড়ের বাড়ির নতুন ডাক্তারটি ডাকা মাত্র উৎসাহের সঙ্গে জামা গায়ে দিয়া ব্যাগ হাতে রওনা হইতেছিলেন, হঠাৎ কি ভাবিয়া সন্তুকে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'তুমি কাঁদছ কেন খোকা?'

'মা মরে যাবে ডাক্তারবাবু।'

'শেষ অবস্থা নাকি?' বলে ডাক্তার নিরুৎসাহ হইয়া পড়িলেন। তারপর ভাবিয়া চিন্তিয়া চারটে টাকার জন্য সন্তুকে বাড়ি পাঠাইয়া দিয়াছেন। কাছেই ত বাড়ি। তিনি প্রস্তুত হইয়া রহিলেন, টাকা নিয়া গেলেই আসিবেন। সন্তুকে তিনি আরও বলিয়া দিয়াছেন, নগদ চারটে টাকা যদি বাড়িতে নাও থাকে তিনটে কি অন্ততঃ দু'টো টাকা নিয়াও সে যেন যায়। বাকী টাকাটা পরে দিলেই চলিবে।

'তুই কাঁদতে গেলি কেন লক্ষ্মীছাড়া?'

এ ডাক্তারটি আসিলে মন্দ হইত না। ডাক্তারকে ডাক্তার, ছ্যাঁচড়াকে ছ্যাঁচড়া। টাকাটা যতদিন খুশী ফেলিয়া রাখা চলিত। একেবারে না দিলেও

কিছু আসিয়া যাইত না। এসব অর্থের কাঙাল নিচু স্তরের মানুষ সম্বন্ধে ঘনশ্যামের মনে গভীর অবজ্ঞা আছে। এদের একজন তাকে মিথ্যাবাদী প্রবঞ্চক বলিয়া জানিয়া রাখিয়াছে, ভাবিলে সে গভীর অস্বস্তি বোধ করে না, মনের শান্তি নষ্ট হইয়া যায় না।

ঘরের অপর প্রান্তে, মণিমালার বিছানার হাততিনেক তফাতে, নিজের বিছানায় গিয়া ঘনশ্যাম শুইয়া পড়িল। ভিজা ভিজা লাগিতেছে বিছানাটা। ছোট মেয়েটা সারারাত চরকির মত বিছানায় পাক খায়, কখন আসিয়া এদিকে তার বিছানা ভিজাইয়া ওপাশে খোকার ঘাড়ে পা তুলিয়া দিয়া অকাতরে ঘুমাইতেছে। মারিবে? এখন মারিলে অন্যায় হয় না। সজোরে একটা চড় বসাইয়া দিবে ওর পিঠের ওই পাঁজরায় অথবা লোল ও তুলার আঁশ মাখানো গালে? আধঘণ্টা ধরিয়া চিৎকার করিবে মেয়েটা। মণিমালা ছাড়া কারো সাধ্য হইবে না সহজে ওর সেই কান্না থামায়।

আধঘণ্টা মরার মত পড়িয়া থাকিয়া ঘনশ্যাম উঠিয়া পড়িল। অশ্বিনীর কাছেই আবার সে কয়েকটা টাকা ধার চাহিবে, যা থাকে কপালে। এবার হয়ত রাগ করিবে অশ্বিনী, মুখ ফিরাইয়া বলিবে তার টাকা নাই। হয়ত দেখাই করিবে না। তবু অশ্বিনীর কাছেই তাকে হাত পাতিতে হইবে। আর কোন উপায়ই নাই।

বহুকালের পুরনো পোকায় কাটা সিল্কের জামাটি দিনতিনেক আগে বাহির করা হইয়াছিল, গায়ে দিতে গিয়া ঘনশ্যাম থামিয়া গেল। আর জামা নাই বলিয়া সে যে এই জামাটি ব্যবহার করিতেছে, এই জামা গায়ে দিয়া বাজার পর্যন্ত করিতে যায়, অশ্বিনী তা টের পাইবে না। ভাবিবে, বড়লোক বন্ধুর সঙ্গে দেখা করিতে যাইবে বলিয়া বাক্স প্যাঁটরা ঘাঁটিয়া মান্ধাতার আমলের পোকায় কাটা দাগ ধরা সিল্কের পাঞ্জাবিটি সে বাহির করিয়াছে। মনে মনে হয়ত হাসিবে অশ্বিনী।

তার চেয়ে ছেঁড়া ময়লা শার্টটা পরিয়া যাওয়াই ভাল। শার্টের ছেঁড়াটুকু সেলাই করা হয় নাই দেখিয়া ঘনশ্যামের অপূর্ব সুখকর অনুভূতি জাগিল। কাল লতাকে সেলাই করিতে বলিয়াছিল। একবার নয়, দু'বার। সে ভুলিয়া গিয়াছে। ন্যায়সঙ্গত কারণে মেয়েটাকে মারা চলে। ও বড় হইয়াছে, কাঁদাকাটা করিবে না। কাঁদিলেও নিঃশব্দে কাঁদিবে, মুখ বুজিয়া।

'লতা ইদিকে আয়। ইদিকে আয় হারামজাদী মেয়ে!'

চড় খাইয়া ঘনশ্যামের অনুমান মত নিঃশব্দে কাঁদিতে কাঁদিতে লতা শার্ট সেলাই করে, আর বিড়ি ধরাইয়া টানিতে টানিতে গভীর তৃপ্তির সঙ্গে ঘনশ্যাম আড়চোখে তার দিকে তাকায়। মায়া হয়, কিন্তু আপসোস হয় না। অন্যায় করিয়া মারিলে আপসোস ও অনুতাপের কারণ থাকিত।

অশ্বিনীর মস্ত বাড়ির বাহারে গেট পার হওয়ার সময় সবিনয় নম্রতায় ঘনশ্যামের মন যেন গলিয়া যায়। দাসানুদাস, কীটানুকীটের চেয়ে নিজেকে তুচ্ছ মনে হয়। সমস্তক্ষণ মর্মে মর্মে উপলব্ধি করে যে, ধনহীনতার মত পাপ আর নাই। রাস্তায় নামিয়া যাওয়ার পর বহুক্ষণ পর্যন্ত এই ভয়াবহ অপরাধের ভারে সে যেন দু'এক ডিগ্রী সামনে বাঁকিয়া কুঁজো হইয়া থাকে।

সবে তখন আটটা বাজিয়াছে। সদর বৈঠকখানার পর অশ্বিনীর নিজের বসিবার ঘর, মাঝখানের দরজার পুরু দুর্ভেদ্য পর্দা ফেলা থাকে। এত সকালেও বৈঠকখানায় তিনজন অচেনা ভদ্রলোক ধরনা দিয়া বসিয়া আছেন। ঘনশ্যাম দমিয়া গেল। একটু ইতস্ততঃ করিয়া সাহসে বুক বাঁধিয়া পর্দা ঠেলিয়া ঢুকিয়া পড়িল অশ্বিনীর বসিবার ঘরে। অন্দর হইতে অশ্বিনী প্রথমে এ ঘরে আসিবে।

ঘরে ঢুকিয়াই ঘনশ্যাম সাধারণভাবে বুঝিতে পারিয়াছিল ঘরে কেউ নাই। সোনার ঘড়িটার দিকে চোখ পড়ার পর আরেকবার বিশেষভাবে সে বুঝিতে পারিল ঘর খালি। উনানে বসানো কেটলিতে যেমন হঠাৎ শোঁ শোঁ আওয়াজ শুরু হয় এবং খানিক পরে আওয়াজ কমিয়া জল ফুটিতে থাকে, ঘনশ্যামের মাথাটা তেমন খানিকক্ষণ শব্দিত হইয়া থাকিযা থাকিয়া ভাঙা ভাঙা ছাড়া ছাড়া চিন্তায় টগবগ করিয়া উঠিল। হৃৎপিণ্ড পাঁজরে আছাড় খাইতে শুরু করিয়াছে। গলা শুকাইয়া গিয়াছে। হাত পা কাঁপিতেছে ঘনশ্যামের। নির্জন ঘরে টেবিল হইতে তুলিয়া একটা ঘড়ি পকেটে রাখা এত কঠিন! কিন্তু দেরি করা বিপজ্জনক। ঘড়িটা যদি তাকে নিতেই হয়, অবিলম্বে নেওয়াই বুদ্ধিমানের কাজ। দেরি করিতে করিতে হয়ত শেষ পর্যন্ত সে যখন ঘড়িটা তুলিয়া পকেটে ভরিতে যাইবে ঠিক সেই সময় কেহ ঘরে ঢুকিয়া সব দেখিয়া ফেলিবে। কেউ না দেখিলে তার কোন ভয় নাই। সদ্‌বংশজাত শিক্ষিত ভদ্রসন্তান সে, সকলে তাকে নিরীহ ভালোমানুষ বলিয়া জানে, যেমন হোক অশ্বিনীর সে বন্ধু। তাকে সন্দেহ করার কথা কে ভাবিবে! ঘড়ি সহজেই হারাইয়া যায়। চাকর ঠাকুর চুরি করে, সন্ন্যাসী ভিখারী চুরি করে। শেষবার ঘড়ি কোথায় খুলিয়া রাখিয়াছিল মনে পড়িয়াও যেন মনে

পড়িতে চায় না মানুষের। অশ্বিনীর সোনার ঘড়ি কোথায় ছিল, কে নিয়াছে, কে বলিতে পারিবে!

তারপর ঘড়িটা অবশ্য এক সময় ঘনশ্যামের পকেটে চলিয়া গেল। বুকের ধড়ফড়ানি ও হাতপায়ের কাঁপুনি থামিয়া তখন নিজেকে তার অসুস্থ, দুর্বল মনে হইতেছে। হাঁটু দু'টি যেন অবশ হইয়া গিয়াছে। পেটের ভিতর কিসে জোরে টানিয়া ধরিয়াছে আর সেই টানে মুখের চামড়া পর্যন্ত সিরসির করিতেছে।

বৈঠকখানায় পা দিয়াই ঘনশ্যাম থমকিয়া দাঁড়াইয়া পড়িল। অশ্বিনীর পুরনো চাকর পশুপতি উপস্থিত ভদ্রলোকদের চা পরিবেশন করিতেছে। ঘড়িটা পকেটে রাখিতে সে যে এতক্ষণ ইতস্ততঃ করিয়াছে, ঘনশ্যামের ধারণা ছিল না। হিসাবে একটা ভুল হইয়া গেল। পশুপতি মনে রাখিবে। এ ঘর হইতে তার বাহির হওয়া, তার ঠমক, চমক, শুকনো মুখ, কিছুই সে ভুলিবে না।

'কেমন আছেন ঘোনোস্শ্যামবাবু? চা দিই?'

'দাও একটু।'

ধোপদুরস্ত ফরসা ধুতি ও শার্ট, পায়ে স্যাণ্ডেল। তার চেয়ে পশুপতিকে ঢের বেশী ভদ্রলোকের মত দেখাইতেছে। ঘনশ্যামের শুধু এইটুকু সান্ত্বনা যে আসলে পশুপতি চোর। অশ্বিনী নিজেই অনেকবার বলিয়াছে, সে এক নম্বরের চোর। কিন্তু কি প্রশ্রয় বড়লোকের এই পেয়ারের চোর-চাকরের! এক কাপ চা দেওয়ার সঙ্গে বড়লোক বন্ধুর চাকর যে কতখানি অপমান পরিবেশন করিতে পারে খেয়াল করিয়া ঘনশ্যামের গায়ে যেন জ্বালা ধরিয়া গেল। আজ কিন্তু প্রথম নয়। পশুপতি তাকে কোনদিন খাতির করে না, একটা অদ্ভুত মার্জিত অবহেলার সঙ্গে তাকে শুধু সহ্য করিয়া যায়। এ বাড়িতে আসিলে অশ্বিনীর ব্যবহারেই ঘনশ্যামকে এত বেশী মরণ কামনা করিতে হয় যে, পশুপতির ব্যবহার সম্বন্ধে সচেতন হওয়ার অবসর সে পায় না। চায়ে চুমুক দিতে জিব পুড়াইয়া পশুপতির বাঁকা হাসি দেখিতে দেখিতে আজ সব মনে পড়িতে লাগিল। মনের মধ্যে তীব্র জ্বালা-ভরা অনুযোগ পাক দিয়া উঠিতে লাগিল অশ্বিনীর বিরুদ্ধে। অসহ অভিমানে চোখ ফাটিয়া যেন কান্না আসিবে। বন্ধু একটা ঘড়ি চুরি করিয়াছে জানিতে পারিলে পুলিসে না দিক জীবনে অশ্বিনী তার মুখ দেখিবে না সন্দেহ নাই। অথচ প্রথার মত নিয়মিতভাবে যে চুরি করিতেছে, সেই চাকরের কত আদর তার কাছে!

অশ্বিনীর সোনার ঘড়ি চুরি করা অন্যায় নয়। ওরকম মানুষের দামী জিনিস চুরি করাই উচিত।

একঘণ্টা পরে মিনিট পাঁচেকের জন্য অশ্বিনীর সঙ্গে দেখা হইল। প্রতিদিনের মত আজও সে বড় ব্যস্ত হইয়া আছে। মস্ত চেয়ারে মোটা দেহটি ন্যস্ত করিয়া অত্যধিক ব্যস্ততায় মেঘ-গম্ভীর মুখে হাঁসফাঁস করিতেছে। ঘনশ্যামের কথাগুলি সে শুনিল কিনা বুঝা গেল না। চিরদিন এমনিভাবেই সে তার কথা শোনে, খানিক তফাতে বসাইয়া আধঘণ্টা ধরিয়া ঘনশ্যামকে দিয়া সে দুঃখ দুর্দশার কাহিনী আবৃত্তি করায়। নিজে কাগজ পড়ে, লোকজনের সঙ্গে কথা কয়, মাঝে মাঝে আচমকা কিছুক্ষণের জন্য উঠিয়াও যায়। ঘনশ্যাম থামিয়া গেলে তার দিকে তাকায়। হাকিম যেভাবে কাঠগড়ায় ছ্যাচড়া চোর আসামীর দিকে তাকায় তেমনিভাবে। জিজ্ঞাসা করে, 'কি বলছিলে ?' ঘনশ্যামকে আবার বলিতে হয়।

আজ পাঁচ মিনিটও গেল না, নীরবে ড্রয়ার খুলিয়া পাঁচ টাকার একটা নোট বাহির করিয়া ঘনশ্যামের দিকে ছুঁড়িয়া দিল। ডাকিল 'পশু !'

পশুপতি আসিয়া দাঁড়াইলে তাকে জিজ্ঞাসা করিল, 'কাপড় কাচা সাবান আছে ?'

'আছে বাবু।'

'এই বাবুকে একখণ্ড সাবান এনে দাও। জামা কাপড়টা বাড়িতে নিজেই একটু কষ্ট করে কেচে নিও ঘনশ্যাম। গরিব বলে কি নোংরা থাকতে হবে ?' পঁচিশ টাকা ধার চাহিলে. এপর্যন্ত অশ্বিনী তাকে অন্ততঃ পনরোটা টাকা দিয়াছে, তার নিচে কোনদিন নামে নাই। এ অপমানটাই ঘনশ্যামের অসহ্য মনে হইতে লাগিল। মণিমালাকে বাঁচানোর জন্য পাঁচটি টাকা দেয়, কি অমার্জিত অসভ্যতা অশ্বিনীর, কি স্পর্ধা ! পথে নামিয়া ট্রাম রাস্তার দিকে চলিতে চলিতে ঘনশ্যাম প্রথম টের পায়, তার রাগ হইয়াছে। ট্রামে উঠিয়া বাড়ির দিকে অর্ধেক আগাইয়া যাওয়ার পর সে বুঝিতে পারে, অশ্বিনীর বিরুদ্ধে গভীর বিদ্বেষে বুকের ভিতরটা সত্যিই জ্বালা করিতেছে। এ বিদ্বেষ ঘনশ্যাম অনেকক্ষণ জিয়াইয়া রাখিবে। হয়ত আজ সারাটা দিন, হয়ত কাল পর্যন্ত।

ঘনশ্যামেরও একটা বৈঠকখানা আছে। একটু সেঁতসেঁতে এবং ছায়ান্ধকার। তক্তাপোশের ছেঁড়া শতরঞ্চিতে কিছুক্ষণ বসিয়া থাকিলে দেহ মন জুড়াইয়া যায়, চোখ আর জ্বালা করে না, ধীরে ধীরে নিঃশ্বাস নিতে হয়। মিনিট পনরো ঘনশ্যামের প্রতীক্ষায় বসিয়া থাকার পর, তার বন্ধু শ্রীনিবাস চিত হইয়া শুইয়া চোখ বুঁজিয়াছিল।

আরও আধঘণ্টা হয়ত সে এমনিভাবে পড়িয়া থাকিত, কিন্তু যাওয়ার তাগিদটা মনে তার এতই প্রবল হইয়াছিল যে, ঘনশ্যাম ঘরে ঢোকামাত্র ব্যস্তভাবে উঠিয়া বসিয়া বলিল, 'ভালই হল, এসে পড়েছিস আর এক মিনিট দেখে চলে যেতাম ভাই। ডাক্তার আনলে না?'

'ডাক্তার ডাকতে যাইনি। টাকার খোঁজে বেরিয়েছিলাম।'

শ্রীনিবাস ক্লিষ্টভাবে একটু হাসিল,—দু'জনেরি সমান অবস্থা। আমিও টাকার খোঁজেই বেরিয়েছিলাম, ওনার বালা দু'টো বাঁধা রেখে এলাম। শেষ রাতে খোকারও যায় যায় অবস্থা—অক্সিজেন দিতে হল।' একটু চুপ করিয়া কি ভাবিতে ভাবিতে শ্রীনিবাস আস্তে আস্তে সিধা হইয়া গেল, 'আচ্ছা, আমাদের সব একসঙ্গে আরম্ভ হয়েছে কেন বল্ ত? একমাস আগে-পরে চাকরি গেল, একসঙ্গে অসুখ-বিসুখ শুরু হল, কাল রাত্রে এক সময়ে এদিকে সন্তুর মা ওদিকে খোকা—'

দুর্ভাগ্যের এই বিস্ময়কর সামঞ্জস্য দুই বন্ধুকে নির্বাক করিয়া রাখে। বন্ধু তারা অনেক দিনের, সব মানুষের মধ্যে দু'জনে তারা সব চেয়ে কাছাকাছি। আজ হঠাৎ পরস্পরকে ঘনিষ্ঠতর নিকটতর মনে হইতে থাকে। দু'জনেই আশ্চর্য হইয়া যায়।

'টাকা পেলি না?'

ঘনশ্যাম মাথা নাড়িল।

'গোটা দশেক টাকা রাখ। নিখিলবাবুকে একবার আনিস।'

পকেট হইতে পুরনো একটা চামড়ার মনিব্যাগ বাহির করিয়া কতকগুলি ভাঁজ করা নোট হইতে একটি সন্তর্পণে খুলিয়া ঘনশ্যামের হাতে দিল। কিছু আবেগ ও কিছু অনির্দিষ্ট উত্তেজনায় সে নার্ভাস হইয়া পড়িয়াছে। তার স্ত্রীর বালা বিক্রির টাকা, মরণাপন্ন ছেলের চিকিৎসার টাকা! আবেগ ও উত্তেজনায় একটু কাবু হইয়া ঝোঁকের মাথায় না দিলে একেবারে দশটা টাকা বন্ধুকে সে দিতেই বা পারিবে কেন!

'গেলাম ভাই। বসবার সময় নেই। একেবারে ডাক্তারবাবুকে নিয়ে যাব।'

একটু অতিরিক্ত ব্যস্তভাবেই সে চলিয়া গেল। নিজের উদারতায় লজ্জা পাইয়া বোধ হয় অস্বস্তি বোধ করিতেছিল। দু'মিনিটের মধ্যে আরও বেশী ব্যস্তভাবে সে ফিরিয়া আসিল। আতঙ্কে ধরা গলায় বলিল, 'ব্যাগটা ফেলে গেছি।'

'এখানে? পকেটে রাখলি যে?'

'পকেটে রাখবার সময় বোধ হয় পড়ে গেছে।'

তাই যদি হয়, তক্তাপোশে পড়িয়া থাকার কথা। ঘনশ্যামকে টাকা দিয়া পকেটে

ব্যাগ রাখিবার সময় শ্রীনিবাস বসিয়াছিল। ঘর এত বেশী অন্ধকার নয় যে, চামড়ার একটা মনিব্যাগ চোখে পড়িবে না। তবে তক্তাপোশের নিচে বেশ অন্ধকার। আলো জ্বালিয়া তক্তাপোশের নিচে আয়নায় প্রতিফলিত আলো ফেলিয়া খোঁজা হইল। মেঝেতে চোখ বুলাইয়া কতবার যে শ্রীনিবাস সমস্ত ঘরে পাক খাইয়া বেড়াইল! ঘনশ্যামের সঙ্গে তিনবার পথে নামিয়া দু'টি বাড়ির পরে পান বিড়ির দোকানের সামনে পর্যন্ত খুঁজিয়া আসিল! তারপর তক্তাপোশে বসিয়া পড়িয়া মরার মত বলিল, 'কোথায় পড়ল তবে? এইটুকু মোটে গেছি, বিড়ির দোকান পর্যন্ত। এক পয়সার বিড়ি কিনব বলে পকেটে হাত দিয়েই দেখি ব্যাগ নেই।'

ঘনশ্যাম আরও বেশী মরার মত বলিল, 'রাস্তায় পড়েছে মনে হয়। পড়ামাত্র হয়ত কেউ কুড়িয়ে নিয়েছে।'

'তাই হবে। কিন্তু এইটুকু সময়ের মধ্যে রাস্তায় পড়ল, একজন কুড়িয়ে নিল! পকেট থেকে পড়বেই বা কেন তাই ভাবছি।'

'যখন যায়, এমনিভাবেই যায়। শনির দৃষ্টি লাগলে পোড়া শোল মাছ পালাতে পারে।'

'তাই দেখছি। বিনা চিকিৎসায় ছেলেটা মারা যাবে।'

ঘনশ্যামের মুখের চামড়ায় টান পড়িয়া সিরসির করিতে থাকে। অশ্বিনীর সোনার ঘড়িটা পকেটে ভরিবার পর এমনি হইয়াছিল। এখনও ব্যাগটা ফিরাইয়া দেওয়া যায়। অসাবধান বন্ধুর সঙ্গে এটুকু তামাশা করা চলে, তাতে দোষ হয় না। তবে দশটা টাকা দিলেও ডাক্তার নিয়া গিয়া ও ছেলেকে দেখাইতে পারিবে। দশ টাকায় মণিমালার যদি চিকিৎসা হয়, ওর ছেলের হইবে না কেন!

শ্রীনিবাস নীরবে নোটটি ফিরিয়া নিল। পকেটে রাখিল না, মুঠা করিয়া ধরিয়া বসিয়া রহিল। সমান বিপন্ন বন্ধুকে খানিক আগে যাচিয়া যে টাকা দিয়াছিল সেটা ফিরাইয়া নেওয়ার সঙ্গতি অসঙ্গতির বিচার হয়ত করিতেছে। নিরুপায় দুঃখে, ব্যাগ হারানোর দুঃখ নয়, এই দশ টাকা ফেরত নিতে হওয়ার দুঃখে, হয়ত ওর কান্না আসিবার উপক্রম হইয়াছে। ওর পক্ষে কিছুই আশ্চর্য নয়। ঘনশ্যাম মমতা বোধ করে। ভাবে, মিছামিছি ওর মনে কষ্ট দেওয়া উচিত নয়।

'গোটা পঁচিশেক টাকা যোগাড় করতে পারব শ্রীনিবাস।'

'পারবি? বাঁচা গেল। আমি তাই ভাবছিলাম। সত্বর মার চিকিৎসা না করলেও ত চলবে না।'

শ্রীনিবাস চলিয়া যাওয়ার খানিক পরেই হঠাৎ বিনা ভূমিকায় ঘনশ্যামের সর্বাঙ্গে একবার শিহরণ বহিয়া গেল। ঝাঁকুনি লাগার মত জোরে। শ্রীনিবাস যদি কোন কারণে গা-ঘেঁষিয়া আসিত, কোন রকমে যদি পেটের কাছে তার কোন অঙ্গ ঠেকিয়া যাইত! তাড়াতাড়িতে শার্টের নিচে কোঁচার সঙ্গে ব্যাগটা বেশী গুঁজিয়া দিয়াছিল, শ্রীনিবাসের সঙ্গে এদিক ওদিক ঘুরিয়া খোঁজার সময় আলগা হইয়া যদি ব্যাগটা পড়িয়া যাইত! পেট ফুলাইয়া ব্যাগটা শক্ত করিয়া আটকাইতেও তার সাহস হইতেছিল না, বেশী উঁচু হইয়া উঠিলে যদি চোখে পড়ে। অশ্বিনীর সোনার ঘড়ি আলগাভাবে শার্টের পকেটে ফেলিয়া রাখিয়া কতক্ষণ ধরিয়া চা খাইয়াছে, লোকের সঙ্গে আলাপ করিয়াছে, অশ্বিনীর সঙ্গে দেখা করিয়াছে, কিন্তু এমন ভয়ংকর আতঙ্ক ত একবারও হয় নাই। সেখানেই ভয় ছিল বেশী। তার ব্যাগ লুকানোকে শ্রীনিবাস নিছক তামাশা ছাড়া আর কিছু মনে করিত না। এখনো যদি ব্যাগ বাহির করিয়া দেয়, শ্রীনিবাস তাই মনে করিবে। তাকে চুরি করিতে দেখিলেও শ্রীনিবাস বিশ্বাস করিবে না সে চুরি করিতে পারে। কিন্তু কোনরকমে তার পকেটে ঘড়িটার অস্তিত্ব টের পাইলে অশ্বিনী ত ওরকম কিছু মনে করিত না। সোজাসুজি বিনা দ্বিধায় তাকে চোর ভাবিয়া বসিত। ভাবিলে এখন তার আতঙ্ক হয়। সেখানে কি নিশ্চিন্ত হইয়াই ছিল! ঘড়ির ভারে ঝুলিয়া পড়িয়াছিল পাতলা শার্টের পকেটটা। তখন সে খেয়ালও করে নাই। অশ্বিনী যদি জিজ্ঞাসা করিয়া বসিত, তোমার পকেটে কি ঘনশ্যাম?

ঘরের সেঁতসেঁতে শৈত্যে ঘনশ্যামের অন্য সব দুশ্চিন্তা টানকরা চামড়ার ভিজিয়া ওঠার মত শিথিল হইয়া যায়, উত্তেজনা ঝিমাইয়া পড়ে, মনের মধ্যে কষ্টবোধের মত চাপ দিয়া থাকে শুধু এক দুর্বহ উদ্বেগ। অশ্বিনীর মনে খটকা লাগিবে। অশ্বিনী সন্দেহ করিবে। পশুপতি তাকে অশ্বিনীর বসিবার ঘর হইতে বাহির হইয়া আসিতে দেখিয়াছে। পশুপতি যদি ওকথা তাকে বলে, বলিবে নিশ্চয়, অশ্বিনীর কি মনে হইবে না ঘড়িটা ঘনশ্যাম নিলেও নিতে পারে?

এই ভাবনাটাই মনের মধ্যে অবিরত পাক খাইতে থাকে। শরীরটা কেমন অস্থির অস্থির করে ঘনশ্যামের। সন্দেহ যদি অশ্বিনীর হয়, ভাসা ভাসা ভিত্তিহীন কাল্পনিক সন্দেহ, তার তাতে কি আসিয়া যায়, ঘনশ্যাম বুঝিয়া উঠিতে পারে না। এতদিন সে যে অশ্বিনীর ঘড়ি চুরি করে নাই, কোন সন্দেহও তার সম্বন্ধে জাগে নাই অশ্বিনীর, কি এমন খাতিরটা সে তাকে করিয়াছে? শেষ রাত্রে মণিমালার

নাড়ী ছাড়িয়া যাওয়ার উপক্রম হইয়াছিল শুনিয়া পাঁচটি টাকা সে তাকে দিয়াছে, এক তাড়া দশ টাকার নোটের ভিতর হইতে খুঁজিয়া বাহির করিয়া পাঁচ টাকার একটি নোট ছুঁড়িয়া দিয়াছে। আর দিয়াছে একখানা কাপড় কাচা সাবান। চাকরকে দিয়া আনাইয়া দিয়াছে। সন্দেহ ছোট কথা, অশ্বিনী তাকে চোর বলিয়া জানিলেই বা তার ক্ষতি কি ?

বাড়ির সামনে গাড়ি দাঁড়ানোর শব্দে সে চমকিয়া ওঠে। নিশ্চয় অশ্বিনী আসিয়াছে। পুলিস নয়ত ? অশ্বিনীকে বিশ্বাস নাই। ঘড়ি হারাইয়াছে টের পাওয়ামাত্র পশুপতির কাছে খবর শুনিয়া সে হয়ত একেবারে পুলিস লইয়া বাড়ি সার্চ করিতে আসিয়াছে। অশ্বিনী সব পারে।

না, অশ্বিনী নয়। নিখিল ডাক্তার মণিমালাকে দেখিতে আসিয়াছে।

কিন্তু ঘড়িটা এভাবে কাছে রাখা উচিত নয়। বাড়িতে রাখাও উচিত নয়। ডাক্তার বিদায় হইলেই সে ঘড়িটা বেচিয়া দিয়া আসিবে। যেখানে হোক, যত দামে হোক। নিখিল ডাক্তার মণিমালাকে পরীক্ষা করে, অর্ধেক মন দিয়া ঘনশ্যাম তার প্রশ্নের জবাব দেয়। সোনার ঘড়ি কোথায় বিক্রি করা সহজ ও নিরাপদ তাই সে ভাবিতে থাকে সমস্তক্ষণ। বাহিরের ঘরে গিয়া কিছুক্ষণের সঙ্কেতময় নীরবতার পর নিখিল ডাক্তার গম্ভীর চিন্তিত মুখে যা বলে তার মানে সে প্রথমটা বুঝিয়া উঠিতে পারে না।

মণিমালা বাঁচিবে না ? কেন বাঁচিবে না ? এখন ত তার টাকার অভাব নাই, যতবার খুশী ডাক্তার আনিয়া চিকিৎসা করাইতে পারিবে। মণিমালার না বাঁচিবার কি কারণ থাকিতে পারে !

'ভাল করে দেখেছেন ?'

বোকার মত প্রশ্ন করা। মাথার মধ্যে সব যেরকম গোলমাল হইয়া যাইতেছে তাতে বোকা না বনিয়াই বা সে কি করে। গোড়ায় ডাক্তার ডাকিলে, সময়মত দু'চারটা ইনজেকশন পড়িলে মণিমালা বাঁচিত। তিন-চারদিন আগে ব্রেন কম্প্লিকেশন আরম্ভ হওয়ায় প্রথম দিকে চিকিৎসা আরম্ভ হইলেও বাঁচানোর সম্ভাবনা ছিল। তিন-চারদিন ! মণিমালা যে ক্রমাগত মাথাটা এপাশ ওপাশ করিত, চোখ কপালে তুলিয়া রাখিত, সেটা তবে ব্রেন খারাপ হওয়ার লক্ষণ। রুলি খুলিতে গেলে সে সজ্ঞানে বাধা দেয় নাই, হাতে টান লাগায় আপনা হইতে মুখ বিকৃত করিয়া গলায় বিশ্রী ভাঙা ভাঙা আওয়াজ করিয়াছিল।

স্থির নিশ্চল না হইয়াও মানুষের জ্ঞান যে লোপ পাইতে পারে অত কি ঘনশ্যাম জানিত।

'চেষ্টা প্রাণপণে করিতে হইবে। তবে এখন সব ভগবানের হাতে।'

ডাক্তারও ভগবানের দোহাই দেয়। এতদিন সব ডাক্তারের হাতে ছিল, এখন ভগবানের হাতে চলিয়া গিয়াছে। নিখিল ডাক্তার চলিয়া গেলে বাহিরের ঘরে বসিয়াই ঘনশ্যাম চিন্তাগুলি গুছাইবার চেষ্টা করে। কালও মণিমালার মৃত্যু প্রায় নিশ্চিত ছিল, ডাক্তারের এ কথায় তার কিছুতেই বিশ্বাস হইতে চায় না। শেষরাত্রে নাড়ী ছাড়িয়া একরকম মরিয়া গিয়াও মণিমালা তবে বাঁচিয়া উঠিল কেন? তখন ত শেষ হইয়া যাইতে পারিত। মণিমালার মরণ নিশ্চিত হইয়াছে আজ সকালে। ডাক্তার বুঝিতে পারে নাই, এখনকার অবস্থা দেখিয়া আন্দাজে ভুল অনুমান করিয়াছে। ঘনশ্যাম যখন অশ্বিনীর ঘড়িটা চুরি করিয়াছিল, তার জীবনে প্রথম চুরি, তখন মণিমালা চিকিৎসার বাহিরে চলিয়া গিয়াছিল। ওর চিকিৎসার জন্য সে পাপ করিয়াছে কিনা, ওর চিকিৎসা তাই হইয়া গিয়াছে নিরর্থক। সকালে বাড়ি হইতে বাহির হওয়ার আগে নিখিল ডাক্তারকে আনিয়া সে যদি মণিমালাকে দেখাইত, নিখিল ডাক্তার নিশ্চয় অন্য কথা বলিত।

ঘড়িটা ফিরাইয়া দিবে?

খুব সহজেই তা পারা যায়। এখনো হয়ত জানাজানিও হয় নাই। কোন এক ছুতায় অশ্বিনীর বাড়ি গিয়া এক ফাঁকে টেবিলের উপর ঘড়িটা রাখিয়া দিলেই হইল।

আর কিছু না হোক, মনের মধ্যে এই যে তার পীড়ন চলিতেছে আতঙ্ক ও উদ্বেগের, তার হাত হইতে সে ত মুক্তি পাইবে। যাই সে ভাবুক, অশ্বিনী যে তাকে মনে মনে সন্দেহ করিবে সে তা সহ্য করিতে পারিবে না। এই কয়েক ঘণ্টা সে কি সহজ যন্ত্রণা ভোগ করিয়াছে! পশুপতি যখন তাকে অশ্বিনীর ঘর হইতে বাহির হইয়া আসিতে দেখিয়াছিল, তাকে সন্দেহ করার সম্ভাবনা যখন আছে অশ্বিনীর, ঘড়িটা রাখিয়া আসাই ভাল। এমনই অশ্বিনী তাকে যেরকম অবজ্ঞা করে গরিব বলিয়া, অপদার্থ বলিয়া, তার উপর চোর বলিয়া সন্দেহ করিলে না জানি কি ঘৃণাটাই সে তাকে করিবে! কাজ নাই তার তুচ্ছ একটা সোনার ঘড়িতে।

টাকাও তার আছে। পঁচিশ টাকা।

ভিতরে গিয়া মণিমালাকে একবার দেখিয়া আসিয়া ঘনশ্যাম বাহির হইয়া পড়িল। ট্রাম রাস্তা ধরিয়া কিছুদূর আগাইয়া সে শ্রীনিবাসের মনিব্যাগটা বাহির

করিল। নোটগুলি পকেটে রাখিয়া ব্যাগটা হাতে করিয়াই চলিতে চলিতে এক সময় আলগোছে ব্যাগটা রাস্তায় ফেলিয়া দিল। খানিকটা গিয়া মুখ ফিরাইয়া দেখিল, ছাতি হাতে পাঞ্জাবি গায়ে একজন মাঝবয়সী গোঁফওয়ালা লোক খালি ব্যাগটার উপর পা দিয়া দাঁড়াইয়া কতই যেন আনমনে অন্যদিকে চাহিয়া আছে।

ঘনশ্যাম একটু হাসিল। একটু পরেই ব্যাগটা তুলিয়া লইয়া লোকটি সরিয়া পড়িবে। হয়ত কোন পার্কে নির্জন বেঞ্চে বসিয়া পরম আগ্রহে সে ব্যাগটা খুলিবে। যখন দেখিবে ভিতরটা একেবারে খালি, কি মজাই হইবে তখন! খুচরা সাড়ে সাত আনা পয়সা পর্যন্ত সে ব্যাগটা হইতে বাহির করিয়া লইয়াছে।

স্টপেজে ট্রাম থামাইয়া ঘনশ্যাম উঠিয়া পড়িল। খুচরা সাড়ে সাত আনা পয়সা থাকায় সুবিধা হইয়াছে। নয়ত ট্রামের টিকিট কেনা যাইত না। তার কাছে শুধু দশ টাকা আর পাঁচ টাকার নোট।

অশ্বিনীর বৈঠকখানায় লোক ছিল না। তার নিজের বসিবার ঘরটিও খালি! টেবিলে কয়েকটা চিঠির উপর ঘড়িটা চাপা দেওয়া ছিল, চিঠিগুলি এখনো তেমনিভাবে পড়িয়া আছে। ঘড়িটি চিঠিগুলির উপর রাখিয়া ঘনশ্যাম বৈঠকখানায় গিয়া বসিল।

বেল্ টিপিতে আসিল পশুপতি—'বাবু যে আবার এলেন?'

'বাবুর সঙ্গে একবার দেখা করব।'

ভিতরে গিয়া অল্পক্ষণের মধ্যেই পশুপতি ফিরিয়া আসিল।

'বিকেলে আসতে বল্‌লেন ঘনোস্‌শ্যামবাবু, চারটের সময়।'

ঘনশ্যাম কাতর হইয়া বলিল, 'আমার এখুনি দেখা করা দরকার, তুমি আরেকবার বলো গিয়ে পশুপতি। বোলো যে ডাক্তার সেনের কাছে একটা চিঠির জন্য এসেছি।'

তারপর অশ্বিনী ঘনশ্যামকে ভিতরে ডাকিয়া পাঠাইল, অর্ধেক ফি'তে মণিমালাকে একবার দেখিবার জন্য অনুরোধ জানাইয়া তার বন্ধু ডাক্তার সেনের নামে একখানা চিঠিও লিখিয়া দিল। ক্ষমতা ও প্রতিপত্তির এইসব লীলাখেলা অশ্বিনী ভালবাসে, নিজেকে তার গৌরবান্বিত মনে হয়।

চিঠিখানা ঘনশ্যামের হাতে দেওয়ার আগে সে কিন্তু একবার জিজ্ঞাসা করিল, 'ফি'র টাকা বাকী রাখলে চলবে না কিন্তু। আমি অপদস্থ হব। টাকা আছে ত?'

ঘনশ্যাম বলিল, 'আছে। ওনার গয়না বেচে দিলাম, কি করি!'

শিল্পী

সকালে দাওয়ায় বসে মদন সারা গায়ে শীতের রোদের সেঁক খাচ্ছিল, হঠাৎ তার পায়ে খেঁচ ধরল ভীষণভাবে।

একেবারে সাত-সাতটা দিন তাঁত না চালিয়ে হাতে-পায়ে কোমরে-পিঠে কেমন আড়ষ্ট মত বেতো-ব্যথা ধরেছিল, তাতে আবার গাঁটে গাঁটে ঝিলিক-মারা কামড়ানি। সুতো মেলে না, তাঁত চলে না, বিনা রোগে ব্যারাম ধরার মত হদ্দ করে ফেলে। ঘণ্টার পর ঘণ্টা একটানা ধরাবাঁধা নড়নচড়ন তাঁত চালানোর কাজে, তার অভাবে শরীরটা মিইয়ে ঝিমিয়ে ব্যথিয়ে ওঠে দু'দিনে, রাতে ঘুম আসে না, মনটা কেমন টনটন করে এক ধরনের উদাসকরা কষ্টে, সব যেন ফুরিয়ে গেছে! যাত্রা শুনতে গিয়ে নিমাই সন্ন্যাসী হয়ে বেরিয়ে যাবার সময় যেমন লাগে তেমনি ধারা কষ্ট, তবে ঢের বেশী জোরালো আর অফুরন্ত। শরীর মনের ওসব উদ্বেগ স'য়ে চুপচাপ থাকে মদন। যা সয় তা সইবে না কেন।

সকালে উঠেই মা গেছে বৌকে সঙ্গে নিয়ে বাবুদের বাড়ি। বাড়ির মেয়েদের ধরবে, বাবুর ছোট মেয়ের বিয়ে উপলক্ষে দু'একখানা ভাল, মদন তাঁতির নামকরা বিশেষরকম ভাল, কাপড় বুনে দেবার ফরমাশ যদি আদায় করতে পারে। বাবুর বাড়ির বায়না পেলে সুতো অনায়াসে যোগাড় হয়ে যাবে বাবুদেরই কল্যাণে। বাড়িতে ছিল শুধু মদনের মাসী। তার আবার একটা হাত নুলো, শরীরটি প্যাঁকাটির মত রোগা। মদনের হাউমাউ চিৎকার শুনে সে ছুটে আসে মদনের দু'বছরের ছেলেটাকে কোলে নিয়ে, সঙ্গে আসে মাসীর চার বছরের মেয়ে। মাসীর কি ক্ষমতা আছে এক হাতে টেনে খেঁচ-ধরা পা ঠিক করে দেয় মদনের। মাসীও চেঁচায়। মদনের চিৎকারে ভয় পেয়ে ছেলেমেয়ে দুটো আগেই গলা ফাটিয়ে কান্না জুড়েছিল!

তখন রাস্তা থেকে ভুবন ঘোষাল এসে ব্যাপারটা বুঝেই গোড়ালির কাছে মদনের পা ধরে কয়েকটা হ্যাঁচকা টান দেয় আর উরুতে জোরে জোরে থাপড় মারে। যন্ত্রণাটা সামালের মধ্যে আসে মদনের, মুচড়ে মুচড়ে ভেঙে পড়ার বদলে বশে আসে পা'টা।

বাঁচালেন মোকে।

মুখে শুষতে শুষতে মদন পায়ে হাত ঘষে। খড়িওঠা ফাটা পায়ে হাতের কড়া তালুর ঘষায় শব্দ হয় শোষেরই মত।

ভুবন পরামর্শ দেয় : উঠে হাঁটো দু'পা। সেরে যাবে।

মদন কথা কয় না। এতক্ষণে আশেপাশের বাড়ির কয়েকজন মেয়েপুরুষ ছুটে এসে হাজির হয়েছে হুল্লোড় শুনে। শুধু উদি আসেনি প্রায় লাগাও কুঁড়ে থেকে, কয়েকটা কলাগাছের মোটে ফারাক মদন আর উদির কুঁড়ের মধ্যে। ঘর থেকেই সে তাঁতীপাড়ার মেয়েপুরুষের পিত্তি জ্বালানো মিষ্টি গলায় চেঁচাচ্ছে : কি হল গো ? বলি হল কি ?

ভুবন রাস্তা থেকে উঠে এলেও এটা জানা কথাই যে উদির কুঁড়ে থেকেই সে ডোবা ঘুরে রাস্তা হয়ে এসেছে। উদিই হয়ত তাড়া দিয়ে পাঠিয়েছে তাকে। সাতদিন তাঁত বন্ধ মদনের, বৌটা তার ন'মাস পোয়াতী, না খেয়ে তার ঘরে পাছে কেউ মরে যায় উদির এই ভাবনা হয়েছে, জানা গেছে কাল। কিছু চাল আর ডাল সে চুপি চুপি দিয়েছে কাল মদনের বৌকে, চুপি চুপি শুধিয়েছে মদনের মতিগতির কথা, সবার মত মজুরি নিয়ে সাধারণ কাপড় বুনতে মন হয়েছে কিনা মদনের। কেঁদে উদিকে বলেছে মদনের বৌ যে না, একগুঁয়েমি তার কাটেনি।

পাড়ার যারা ছুটে এসেছিল, ভুবনকে এখানে দেখে মুখের ভাব তাদের স্পষ্টই বদলে যায়। ইতিমধ্যে পিসী পিঁড়ি এনে বসতে দিয়েছিল ভুবনকে। বারবার সবাই তাকায় মদন আর ভুবনের দিকে দু'চোখে স্পষ্ট জিজ্ঞাসা নিয়ে। সেও কি শেষে ভুবনের ব্যবস্থা মেনে নিল, রাজী হল প্রায় বেগার খাটা মজুরি নিয়ে সস্তা ধুতি শাড়ি গামছা বুনে দিতে ? মদন অস্বস্তি বোধ করে। মুখের খোঁচা খোঁচা গোঁফ দাড়ি মুছে ফেলে হাতের চেটোতে।

সবার নিঃশব্দ জিজ্ঞাসার জবাবেই যেন বুড়ো ভোলাকে শুনিয়ে সে বলে, পায়ে খেঁচ ধরল হঠাৎ। সে কি যন্তনা, বাপ্, একদম যেন মিত্যু যন্তনা, মরি আর কি ! উনি ছুটে এসে টেনেটুনে ঠিক করে দিলেন পা'টা, বাঁচালেন মোকে !

গগন তাঁতীর বেঁটে মোটা বৌ অদ্ভুত আওয়াজ করে বলে, অ! কাছেই 'ছিলেন তা এলেন ভাল তাই ত বলি মোরা।

তাঁত না চালিয়ে গা'টা ঠিক নেই। তাড়াতাড়ি বলে মদন। গগন তাঁতীর বৌয়ের মুখকে তার বড় ভয়।

বৃন্দাবন দাঁড়িয়ে ছিল পিছনে, অপরাধীর মত। তার কুঁড়েও মদনের ঘরের প্রায় লাগাও—উত্তরে একটা আম গাছের ওপাশে, যার দু'পাশের ডালপালা দু'জনের চালকে প্রায় ছোঁয় ছোঁয়।

বুড়ো ভোলার চেয়ে বৃন্দাবনের বয়স অনেক কম কিন্তু শরীর তার অনেক বেশী জরাজীর্ণ। একটি তার পুরনো জীর্ণ তাঁত, গামছা আর আটহাতি কাপড় শুধু বোনা যায়। তাঁতে সে আর বসে না, ক্ষমতা নেই। তার বড় ছেলে রসিক তাঁত চালায়। সুতোর অভাবে তাঁতীপাড়ায় সমস্ত তাঁত বন্ধ, অভাবে ও আতঙ্কে সমস্ত তাঁতীপাড়া থমথম করছে : শুধু তাঁত চলছে কেশবের আর বৃন্দাবনের।

ভুবন অমায়িক ভাবে বৃন্দাবনকে জিজ্ঞাসা করে, ক'খানা গামছা হয়েছে বৃন্দাবন?

বৃন্দাবন যেন চমকে ওঠে। এক পা পিছিয়ে যায়।

জানি না বাবু, মোর ছেলা বলতে পারে।

কেশবকে বোলো বোনা হলে যেন পয়সা নিয়ে যায়।

বাঁকা মেরুদণ্ডটা একবার সোজা করবার চেষ্টা ক'রে বৃন্দাবন অসহায় করুণ-দৃষ্টিতে সবার দিকে একবার তাকায়।

ছেলেকে শুধোবেন বাবু। ওসব জানি না কিছু আমি।

পিছু ফিরে ধীরে ধীরে চলে যায় বৃন্দাবন!

গগনের বৌ বলে মুখ বাঁকিয়ে ঝাঁজের সঙ্গে, আমি কিছু জানি না গো, মোর ছেলা জানে। কত ঢং জানে বুড়ো!

বুড়ো ভোলা বলে, আহা থাম না বুনোর মা? অত কথায় কাজ কি। যন্তনা গেছে না মদন? মোরা তবে যাই।

কেশব গেলেই পয়সা পাবে, গামছা কাপড় বুনে দিলেই পয়সা মেলে, এসব কথা—এসব ইঙ্গিত দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে শুনতে তারা ভয় পায়। সব ঘরে রোজগার বন্ধ, উপোস।

ভুবন বলে, তোমার গাঁয়ের তাঁতীরা, জানো মদন, বড় বোকা।

মদন নিজেও সাতপুরুষের তাঁতী। রাগের মাথায় সে ব্যঙ্গই করে বসে, সে কথা বলতে! তাঁতী জাতটাই বোকা।

ভুবন নিজের কথা বলে যায়, সুতো কিনতে পাচ্ছিস না, পাবিও না কিছুকাল। তাঁত বসিয়ে রেখে নিজে বসে থেকে লাভ কি? মিহিরবাবু সুতো দিচ্ছেন, বুনে দে, যা পাস তাই লাভ। তা নয় সুতো না কিনতে দিলে কাপড়ই বুনবে না, একি

কথা? তোমার কথা নয় বুঝতে পারি, সস্তা কাপড় বুনবেই না তুমি, কিন্তু ওরা—

পোষায় না ওদের। সুতো কি সবাই কেনে, না কিনতে পারে? আপনি ত জানেন, বেশীরভাগ দাদন কর্জে তাঁত চালায়। পড়তা রাখে দিবারাত্তির তাঁত চালিয়ে, মুখে রক্ত তুলে। আপনি তাও আদ্দেক করতে চান, পারব কেন মোরা?

নইলে ইদিকে সে পড়তা থাকে না বাপু। কি দরে সুতো কেনা জানো? ভুবন আপসোসের শ্বাস ফেলে, যাক গে, কি করা। কত্তাকে কত বলে তোমাদের জন্য সুতো বরাদ্দ করিয়েছিলাম, তোমরা না মানলে উপায় কি। বুঝি ত সব কিন্তু দিনকাল পড়েছে খারাপ, তাঁত রেখে কোনোমতে টিকে থাকা। নয় ত দু'দিন বাদে তাঁত বেচতে হবে তোমাদের। ভাল সময় যখন আসবে, সুতো মিলবে আবার, তখন মনে পড়বে এই ভুবন ঘোষালের কথা বলে রাখছি, দেখো মিলিয়ে। তখন আপসোস করবে আমার কথা শুনলে তাঁতও বজায় থাকত, নিজেরাও টিঁকতে।

তাঁত বাঁধা দিতে বেচতে হলে মিহিরবাবুর হয়ে ভুবনই কিনবে। সেই ভরসাতেই হয়ত গাঁট হয়ে বসে আছে লোকটা। কিন্তু সে পর্যন্ত কি গড়াবে? তার আগে হয়ত ভুবনের কাছে সুতো নিয়ে বুনতে শুরু করবে তাঁতীরা।

মাসী এসে ঘুরঘুর করে আশপাশে। বামুনের ছেলে পায়ে হাত দিয়েছে মদনের, গড় হয়ে পায়ের ধুলো নিয়ে ভুবনকে যতক্ষণ সে প্রণাম না করছে মাসীর মনে স্বস্তি নেই। মদনের বুঝি খেয়াল হয়নি, ভুলে গেছে। মদনের পা দুটো টান হয়ে ভুবনের পিঁড়ির দিকে এগিয়ে গেলে মাসীর আর ধৈর্য থাকে না। মদনের কানের কাছে মুখ নিয়ে গিয়ে প্রণামের কথাটা মনে করিয়ে দেয়।

মদন একেবারে খিঁচড়ে ওঠে, মেয়েটাকে নে না কোলে, কেঁদে মরছে? মরগে না হেথা থেকে যেথা মরবি?

ছেলেমেয়ে দুটোকে নিয়ে মাসী পালায়। মদনের এ মেজাজ চেনে মাসী। মেয়ে কাঁদছে বলে বকুনি মিছে, ওটা ছুতো। ছেলেপিলে কানের কাছে চেঁচালে মানুষের অশান্তি কেন হবে মাসীও জানে না মদনও বোঝে না। ছেলেমেয়ের কান্না মদনের কানে লাগে না। তাঁতের ঠকঠকি, মেয়েদের বকাবকি, ঝিঁঝির ডাকের মত। মেজাজটাই বিগড়েছে মদনের। না করুক প্রণাম সে বামুনের

ছেলেকে। মদনের ওপর মাসীর বিশ্বাস খাঁটি। রামায়ণ সে পড়তে পারে সুর করে, তাঁতের কাজে বাপের নাম সে বজায় রেখেছে, সেরা জিনিস তৈরির বায়না পায় মদন তাঁতী। মদনের মার সঙ্গে কচি বয়সে এ বাড়িতে এসে মাসী শুনেছিল, বাবুদের বাপের আমলে বেনারসী বুনে দেবার বায়না পেয়েছিল মদনের বাপ। বিয়ের সময় জালের মত ছিষ্টিছাড়া শাড়ি বুনে পরতে দিয়ে তার সঙ্গে যে মস্করা করেছিল মদনের বাপ সে কথা কোনোদিন ভুলবে না মাসী। আজ আকাল, বায়না আসে না, সুতো মেলে না, তাঁত চলে না, তবু মদন ওঁচা কাপড় বোনে না। ওর জন্য কষ্ট হয় মাসীর, ওর বাপের কথা ভেবে। মা বৌ যেন কেমন ব্যাভার করে ওর সঙ্গে।

মদনের বাপ যদি আজ বেঁচে থাকত, মাসী ভাবে। বেঁচে থাকলে সাড়ে চার কুড়ির বেশী বয়স হত তার। মাসী তা ভাল বোঝে না। শুধু শ্রীধরের চেয়ে সে বেশী বুড়ো হয়ে পড়ত ভাবতে মনটা তার মুষড়ে যায়। শ্রীধর তাঁতীর বেঁচে থাকার দুর্ভাগ্য দেখে সে নিজেই যে কামনা করে, এবার বুড়োর যাওয়াই ভাল।

না থাকে মদনের বাপ। মদন ত আছে!

মদনের মা বৌ ফিরে আসে গুটিগুটি, পেটের ভারে মদনের বৌ থপথপ পা ফেলে হাঁটে, হাত পা তার ফুলছে ক'দিন থেকে। পরনের জীর্ণ পুরনো শাড়িখানা মদন নিজে বুনে দিয়েছিল তাকে বিয়ের সময়। এখনো পাড়ের বৈচিত্র্য, মিহি বুননের কোমল থাপি, উজ্জ্বলতা, সব মিলে এমন সুন্দর আছে কাপড়খানা যে অতি বিশ্রীভাবে পরলেও রুক্ষ জট বাঁধা চুল, চোকলা ওঠা ফাটা চামড়া, এসব চিহ্ন না থাকলে বাবুদের বাড়ির মেয়ে মনে করা যেত তাকে।

মদনের মা বিড়বিড় করে বকতে বকতে আসছিল লাঠি ধরে কুঁজো হয়ে, ভুবনের সামনে সে কিছু না বল্‌লেই মদন খুশী হত। কিন্তু বুড়ির কি সে কাণ্ডজ্ঞান আছে। সামনে এসেই সে শুরু করে দেয় মদন তাঁতীর এয়োতি বশীকরণ বসন্তশাড়ির বায়নার কথা শুনেই বাবুর বাড়ির মেয়েদের হাসি-টিটকারি দিয়ে তাদের বিদেয় করার কাহিনী। ওসব কাপড়ের চল আছে নাকি আর, ঠাকুমা দিদিমারা ঝিরা আর চাষার ঘরের মেয়েরা পরে ওসব শাড়ি।

মদন তাঁতী! মদন তাঁতীর কাপড়! বনগাঁয় শ্যাল রাজা মদন তাঁতী।

বল্‌ল? বল্‌ল ওসব কথা? পা গুটিয়ে সিধে হয়ে বলে মদন, বেড়েছে—বড় বেড়েছে বাবুরা। অতি বাড় হয়েছে বাবুদের, মরবে এবার।

দাওয়ায় উঠতে টলে পড়বার উপক্রম করে মদনের বৌ। খুঁটি ধরে সামলে নিয়ে ভেতরে চলে যায়, ভেতর থেকে তার উগ্র মন্তব্য আসে: এক পয়সার মুরোদ নেই, গর্বো কত!

ভুবন সান্ত্বনা দিয়ে বলে, মেয়েরা অমন বলে মদন, ওসব কথায় কান দিতে নেই।

তা বলে, বাবুদের বাড়ির মেয়েরাও বলে, তার মা বৌও বলে, উদিও বলে। কিন্তু সব মেয়েরা বলে না। এই তাঁতীপাড়ার অনেক মেয়েই বলে না। মদন তাঁতীকে সামনে খাড়া করিয়ে তারা বরং ঝগড়া করে ঘরের পুরুষদের সঙ্গে। মদনও তাঁত বোনে তারাও তাঁত বোনে, পায়ের ধুলোর যুগ্যি নয় তারা মদনের। এক আঙুল গোঁফ-দাড়ির মধ্যে ভাঙা দাঁতের হাসি জাগিয়ে মদন শোনায় ভুবনকে। একটা এঁড়ে তাঁতীর তেজ আর নিষ্ঠায় একটু খটকাই যেন লাগে ভুবনের। একটু রাগ একটু হিংসার জ্বালাও যেন হয়। সম্প্রতি মিহিরবাবুর তাঁতের কারবারে জড়িয়ে পড়ার পর সে শুনেছিল এ অঞ্চলের তাঁতী-মহলে একটা কথা চলিত আছে: মদন যখন গামছা বুনবে। গোড়ায় কথাটার মানে ভাল বোঝেনি, পরে টের পেয়েছিল, সূর্য যখন পশ্চিমে উঠবে—এর বদলে ওই কথাটা এদিকের তাঁতীরা ব্যবহার করে। সে জানে, মদন যদি তার কাছ থেকে সুতো নিয়ে কাপড় বুনে দিতে রাজী হয় আজ, কাল তাঁতীপাড়ার বেশীর-ভাগ লোক ছুটে আসবে তার কাছে সুতোর জন্য। বড় খামখেয়ালী একগুঁয়ে লোকটা, এই রাগে, এই হাসে, হা হুতাশ করে, এই লম্বাচওড়া কথা কয় যেন রাজামহারাজা!

উঠবার সময় ভুবনের মনে হয় ঘর থেকে যেন একটা গোঙানির আওয়াজ কানে এল।

তার পরেই মাসীর গলা: ও মদন, দ্যাখসে বৌ কেমন করছে।

ভুবন গিয়ে উদিকে পাঠিয়ে দেয় খবর নিতে। বেলা হয়েছে তার বেরিয়ে পড়া দরকার, কাজ অনেক। কিন্তু মদনের ঘরের খবরটা না জেনে যেতে পারে না। তেমন একটা বিপদ ঘাড়ে চাপলে মদন হয়ত ভাঙতে পারে। উদির জন্য অপেক্ষা করতে করতে সে বিরক্ত হয়ে ওঠে। ও ছুঁড়ীর বড় বাড়াবাড়ি আছে সব বিষয়ে, খবর আনতে গিয়ে হয়ত সেবা করতেই লেগে গেছে মদনের বৌয়ের। কি হয়েছে মদনের বৌয়ের? কি হতে পারে? গুরুতর কিছু যদি হয়…

উদি ফেঁরে অনেকক্ষণের পর। অনেকটা পথ হেঁটে মদনের বৌয়ের শরীরটা কেমন কেমন করছিল, একবার মূর্ছা গেছে। মনে হয়েছিল বুঝি ওই পর্যন্তই থাকবে, কিন্তু পরে মনে হচ্ছে প্রসব ব্যথাটাও উঠবে।

পেসব হতে গেলে মরবে মাগী এবার। একবেলা একমুঠো ভাত পায় ত তিনবেলা উপোস। এমনি চলছে দু'মাস। গাল দিয়ে এলাম তাঁতীকে, মরণ হয় না?

আথায় কাঠ গুঁজে নামানো হাঁড়িটা চাপিয়ে দেয়। বেঁটে আঁটো দেহটা পর্যন্ত তার পরিচয় দেয় দুর্জয় রাগের। বসাতে গিয়ে মাটির হাঁড়িটা যে ভাঙে না তাই আশ্চর্য।

এখনো গেলে না যে?

যাবো। আলিস্যে লাগছে।

ভাত খাবে, মোর রাঁধা ভাত? উদি আব্দার জানায়।

ভুবন রেগে বলে, তোর কথা বড় বিচ্ছিরি।

মদন দাওয়ায় এসে বসেছে উঁকি মেরে দেখে ডোবা ঘুরে রাস্তা হয়ে ভুবন আবার যায়। সকালের পিঁড়িটা সেইখানে পড়েছিল, তাতে জাঁকিয়ে বসে।

কেমন আছে বৌ?

ব্যথা উঠেছে কম কম। রক্ত ভাঙছে বেশী, ব্যথা তেমন নয়। দুগ্‌গা বুড়ীকে আনতে গেছে।

মদনের শান্ত নিশ্চিন্ত ভাব দেখে ভুবন রীতিমত ভড়কে যায়। একটা বিড়ি ধরিয়ে ভাবে, ভেবে মদনকেও একটা বিড়ি দেয়।

মদন বলে হঠাৎ: ভাল কিছু বোনান না, একটু দামী কিছু? সুতো নেই বুঝি?

মনটা খুশী হয়ে ওঠে ভুবনের।

সামান্য আছে। কিন্তু বেনারসী ছাড়া তুমি কি কিছু বুনবে?

বেনারসী? বেনারসী না বোনা যেন তারই অপরাধ, তারই অধঃপতন এমনি আপসোসের সঙ্গে বলে মদন, বেনারসী জীবনে বুনিনি।

একঘণ্টার মধ্যে সুতো এসে পড়ে। ভুবন লোক দিয়ে সুতো পৌছে দেয় মদনের ঘরে। সুতো দেখে কান্না আসে মদনের। এই সুতো দিয়ে তাকে ভাল

কাপড়, দামী কাপড় বুনে দিতে হবে! এর চেয়ে কেশবের মত গামছাই নয় সে বুনত, লোকে বলত মদন তাঁতী গামছা বুনেছে দায়ে পড়ে, কিন্তু যা-তা ওঁচা কাপড় বোনেনি। সকালে পায়ে যেমন খিঁচ ধরেছিল তেমনি ভাবে কি যেন টেনে ধরে তার বুকের মধ্যে। ট্যাঁকে গোঁজা দাদনের টাকা দুটো যেন ছ্যাঁকা দিতে থাকে চামড়ায়। কিন্তু এদিকে তাঁত না চালিয়ে চালিয়ে সর্বাঙ্গে আড়ষ্টমত ব্যথা, পেটে খিদেটা মরে মরে জাগছে বারবার, বৌটা গোঙাচ্ছে একটানা।

কি করবে মদন তাঁতী?

সেদিন রাত্রি যখন গভীর হয়ে এসেছে, শীতের চাঁদের ম্লান আলোয় গাঁ ঘুমিয়ে পড়েছে, চারিদিক স্তব্ধ নিঝুম হয়ে আছে মাঝে মাঝে কাছে ও দূরে কুকুর-শিয়ালের ডাক ছাড়া, মদন তাঁতীর তাঁত-ঘরে শব্দ শুরু হল ঠকাঠক্, ঠকাঠক্। খুব জোরে তাঁত চালিয়েছে মদন, শব্দ উঠছে জোরে। উদির ঘরে ত বটেই, বৃন্দাবনের ঘরে পর্যন্ত শব্দ পৌছতে থাকে তার তাঁত চালানোর।

ভুবন বলে আশ্চর্য হয়ে, এর মধ্যে তাঁত চাপাল? একা মানুষ কখন ঠিক করল সব?

উদিও অবাক্ হয়ে গিয়েছিল—ও খাঁটি গুণী লোক্, ও সব পারে—সে বলে ভয়ে ও বিস্ময়ে কান পেতে থেকে।

বুড়ো বৃন্দাবন ছেলেকে ডেকে বলে, মদন তাঁত চালায় নাকি রে?

তা ছাড়া কি আর? কেশব জবাব দেয় ঝাঁজের সঙ্গে, রাতদুপুরে চুপে চুপে তাঁত চালাচ্ছেন, ঘাট শুধু মোদের বেলা।

ভুবনের সুতো না হতে পারে।

কার সুতো তবে? কার আছে সুতো ভুবন ছাড়া শুনি?

মদনের তাঁত কখন থেমেছিল উদি জানে না। ভোরে ঘুম ভেঙেই সে ছুটে যায় মদনের কাছে। মদনকে ডেকে তুলে সাগ্রহে বলে, কতটা বুনলে তাঁতী?

আয় দেখবি।

মদন তাকে নিয়ে যায় তাঁতঘরে। ফাঁকা শূন্য তাঁত দেখে থ বনে থাকে উদি। সুতোর বাণ্ডিল যেমন ছিল তেমনি পড়ে আছে!

সুতো মদন উদির হাতে তুলে দেয়, টাকা দুটোও দেয়। বলে, নিয়ে যা ফিরে দে গা ভুবনবাবুকে। বলিস, মদন তাঁতী যেদিন গামছা বুনবে—

একটু বেলা হতে তাঁতীপাড়ার অর্ধেক মেয়ে-পুরুষ দল বেঁধে মদনের ঘরের দাওয়ার সামনে এসে দাঁড়ায়। মুখ দেখলেই বোঝা যায় তাদের মনের অবস্থা। রোষে ক্ষোভে কারো চোখে জল এসে পড়বার উপক্রম করছে। গগন তাঁতীর বৌটা পর্যন্ত নির্বাক হয়ে গেছে।

বুড়ো ভোলা শুধোয়ঃ ভুবনের ঠেঁয়ে নাকি সুতো নিয়েছ মদন? তাঁত চালিয়েছ দুপুররাতে চুপি চুপি?

দেখে এসো তাঁত।

তাঁত চালাওনি রাতে?

চালিয়েছি। খালি তাঁত। তাঁত না চালিয়ে খেঁচ ধরল পায়ে, রাতে তাই খালি তাঁত চালালাম এট্টু। ভুবনের সুতো নিয়ে তাঁত বুনব? বেইমানি করব তোমাদের সঙ্গে কথা দিয়ে? মদন তাঁতী যেদিন কথার খেলাপ করবে—

মদন হঠাৎ থেমে যায়।